ব্ল্যাক কফি

আগাথা ক্রিস্টি

সূচিপত্র

লন্ডন শহর 2
ডঃ কারোলির সন্ধানী দৃষ্টি 42
ক্যাপ্টেন হেস্টিংস জানতে চাইলেন 85
কী আর বলি 128
পিসিমা ক্যারোলিন 207

লন্ডন শহর

০১.

লন্ডন শহর।

মে মাসের সকাল। এতক্ষণ হালকা কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল চারপাশ। ধীরে ধীরে সূর্যের মুখ দেখা দিয়েছে।

রাস্তাঘাটে যানবাহনের ঢল নেমেছে। ব্রেকফাস্ট সেরে মানুষজন চলেছে যে যার কাজে। মোটরকার, পুলকার, সাইকেল, বাসে চেপে ব্যস্ত হাজার হাজার নারীপুরুষ ছুটছে।

হোয়াইট হল ম্যানসন। ছোট্ট ফ্ল্যাটের ব্যালকনি। বেলজিয়াম পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত তুখোড় বড় কর্তা আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিয়েছেন। অন্যান্য দিনের মতো। সামনে খবরের কাগজ মেলে ধরেছেন। চোখ খবরের শিরোনামে আবদ্ধ।

অনুগত ভৃত্য ভ্যালেট জর্জকে ডেকে এক কাপ হট চকোলেট আনতে বললেন। এটি তার প্রিয় পানীয়। ইতিমধ্যে এক কাপ হয়ে গেছে, এটি দ্বিতীয়।

মাঝে মাঝে পোয়ারোর দৃষ্টি খবরের কাগজ থেকে ছিটকে চলে যাচ্ছে রাস্তার দিকে। হোয়াইট হল ম্যানসনের বাসিন্দাদের অনেকেই এই সময় যে যার কাজের দিকে রওনা

হয়, আজও তার ব্যতিক্রম হল না। কাছাকাছি স্কুল-কলেজে পড়ান এমন কয়েকজন যুবক-যুবতীও তাদের মধ্যে আছে।

পোয়ারো এবার দৃষ্টি ফেরালেন ঘরের দিকে। জর্জকে দেখতে পেলেন। হট চকোলেটের কাপ তার হাতে।

পোয়ারো কাপ হাতে নিলেন। বললেন–জর্জ, বল ত, আলতো চুমুক দিলেন কাপে, বলছি, কাল রাতে কোন ফোন এসেছিল? আমাকে চাইছিল?

–হ্যাঁ, স্যার। জর্জ বিনীত স্বরে বলল, ইস, বলতে একদম ভুলে গিয়েছি। আসলে আপনি কাল রাতে মিসেস অলিভারের সঙ্গে থিয়েটার দেখতে চলে গেলেন। আপনার আসতে দেরি হচ্ছিল বলে আমি খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল।

-বেশ, বেশ, কথা না বাড়িয়ে বল, কে ফোন করেছিল? তার নাম বলেছে?

–হ্যাঁ বলছি, একটু সবুর করুন।

মনিবের ধমক খেয়ে জর্জ কপালে আঙুলের দুটো টোকা দিল। মনে করার চেষ্টা করল। ট্রাউজারের হিপ পকেটে হাত ঢোকাল। পরক্ষণেই বেরিয়ে এল, একটুকরো কাগজ। জ্যাকেটের বুক পকেট থেকে চশমা বের করল। নাকের ওপর রাখল। চিলতে কাগজটা মেলে ধরল।–হ্যাঁ, এই সেই কাগজ, যেখানে নামটা টুকে রেখেছিলাম। স্যার ক্লড অ্যামরি, ফোন নম্বর দেখে মনে হয় বেশি দূরে নয়, ফারের কাছাকাছি জায়গাটা হবে। উনি

আপনাকে ফোনে যোগাযোগ করতে বলেছেন, স্যার। তবে, ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপন, পাঁচকাণ যেন না হয় তাও বলেছেন।

-ধন্যাবাদ, জর্জ। হট চকোলেটের খালি কাপটা জর্জের ট্রে-তে রেখে পোয়ারো বললেন, ওই নাম ও টেলিফোন নম্বর লেখা কাগজটা ডেস্কের ওপর রেখে নিজের কাজে যাও। কাগজটা পড়া বাকি আছে, পরে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করছি।

জর্জ ঘর থেকে চলে গেল। পোয়ারো কাগজের দিকে চোখ মেলে দিলেন। নাহ, কাগজে নতুন কোন খবর নেই। সভ্য মানুষের চরম দুঃখ আর হতাশার একঘেয়ে খবর অ্যাডলফ হিটলারের অত্যাচার–জার্মানির আদালতগুলি আইনকানুনের তোয়াক্কা করে নাৎসী বাহিনীর শাখা দপ্তরে পরিণত হয়েছে বুলগেরিয়ার ফ্যাসিপন্থীরা সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে

এবার একটি দুর্ঘটনার খবর ঘটেছে তাঁর নিজের দেশ বেলজিয়ামে মনস-এর খনির ভেতর শ্রমিকরা কাজ করছিল। হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। মৃত্যু হয় বিয়াল্লিশ জন লোকের।

দৈনিক টাইমস-এর পাতা উল্টে পোয়ারো শোক সংবাদ কলমে চোখ রাখল খুব চেনা আর খুব কাছের কয়েকজনের মৃত্যু সংবাদ পড়ে মনটা বিষণ্ণ হল।

কাগজটা ভাজ করে টেবিলের এক পাশ রেখে দিলেন। টুলের ওপর পা দুটো তুলে দিলেন। চিন্তায় আচ্ছন্ন মন। অ্যামরি, স্যার ক্লড অ্যামরি নামটি ঘুরপাক খাচ্ছে। নামটা বড় চেনা চেনা লাগছে। কিন্তু তোক কে? না, মনে পড়ছে না–জর্জ, ব্যারিস্টার, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি বড় কর্তা, নাকি রাজনৈতিক নেতা?

চিন্তাচ্ছন্ন মনে আরাম কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। পায়ে পায়ে এসে ঢুকলেন স্টাডিরুমে। প্রয়োজনে এখানে বসেই তিনি খাওয়া সারেন ও রাত কাটান। ভ্যালেট জর্জ তার মনিবের এই ধরনের জীবনযাত্রার সঙ্গে অভ্যস্ত।

মস্ত এক ডেস্ক, দু'পাশে লম্বা স্টিলের শেলফ। হরেক রকম রেফারেন্স বই থরে থরে সাজানো, পুরোনো কাগজপত্রও স্থান পেয়েছে।

পোয়ারো লাল রেক্সিনে মোড়া মোটা একটা বই টেনে বের করলেন। হু ইজ হু' বইটা ডেস্কের ওপর রাখলেন, চেয়ার টেনে নিলেন। বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলেন।

একটা পৃষ্ঠায় এসে থমকে গেলেন পেয়েছেন, খুঁজে পেয়েছেন। এতক্ষণ ধরে যার সন্ধান করছিলেন।

মনে মনে নয়, জোর গলায় পড়তে লাগলেন

অ্যামরি, স্যার ক্লড হোর্টিং, জন্ম-২৪ নভেম্বর, ১৮৭৮। শিক্ষা ওয়েসাউথ গ্রামার স্কুল ও কিংস কলেজ, লন্ডন। বিবাহ–১৯০৭। স্ত্রী হেলেন গ্রাহাম (১৯২৯ সালে তার মৃত্যু হয়)। পুত্র সংখ্যা–একটি। ১৯২৭ সালে নাইটহুট উপাধি লাভ। কর্মজীবনে পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষক। ১৯০৬ জিইসি ল্যাবোরে টরিজ, ১৯১৬–রয়েল এয়ারফোর্স ফাস্ট (বেতার বিভাগ), ১৯২১–বিমান মন্ত্রণালয় গবেষণা দপ্তর, মোয়ালেজ। বস্তু আর পদার্থকণার ধরনের নতুন পথের ব্যাখ্যাকার দ্য ট্রাভেলিং ওয়েভ সিনিয়র অ্যাক্সিলাটের মনরো' সম্মানে সম্মানিত, যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষামূলক জার্নালে তার গবেষণার ফল প্রকাশিত

হয়েছে, ঠিকানা–অ্যাবটস ক্লিভ, মার্কেট ক্লিভ-এর পাশে, সারোটি মার্কেট, ক্লিভ-৩১৪। অ্যাথেনিয়াম ক্লাবের সদস্য।

তথ্যগুলি পড়ে পোয়ারোর মনে পড়ে গেল স্যার ক্লডকে–হ্যাঁ, এদেশের, এক নামজাদা পদার্থবিজ্ঞানী গুরুত্বপূর্ণ কিছু সরকারি কাগজ হঠাৎ লোপাট হয়ে যাবার ঘটনাটি মনে পড়ে গেল তাঁর। সরকারি গোয়েন্দারা ওইসব দলিলের খোঁজ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত স্যার ক্লডের সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। স্যার ক্লড সরাসরি কোন খবর দেননি, কেবল আভাস দিয়েছিলেন কোথায় পাওয়া যেতে পারে কাগজপত্রগুলি। তার দেওয়া সূত্রের পথ ধরে গোয়েন্দারা অবশ্য হারা নিধির সন্ধান পেয়েছিল। সরকারি গুরুত্বপূর্ণ ও দামী দলিলগুলো অন্য দেশের কাছে পাচার হয়ে গেলে এ দেশের সমূহ বিপদ। তাই এত তৎপরতা।

কদিন আগের দৈনিক টাইমস-এর কথা ভাবলেন তিনি। এক জায়গায় স্যার ক্লড অ্যামরি সম্বন্ধে কিছু তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল। সংক্ষেপে ঘটনাটি ছিল এইরকম–স্যার ক্লড অ্যামরি বর্তমানে যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন, তা ভবিষ্যতের যুদ্ধ-বিগ্রহের পক্ষে সাংঘাতিক কিছু একটা হবে। তবে স্যার ক্লডকে নিয়েই যত ঝামেলা। উপযুক্ত নিরাপত্তার অভাব। গ্রামের বাড়িতে ব্যক্তিগত গবেষণাগারে একমনে কাজ করে চলেছেন।

কিন্তু লোকটা বড্ড একরোখা বিড়বিড় করে বললেন পোয়ারো যুদ্ধবিগ্রহ-অস্ত্রশস্ত্র আমার বিষয় বহির্ভূত, তাহলে .... বইখানা নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দিলেন, যদি স্যার ক্লড এখন......••••

ভাবনারা অটকে গেল টেবিলের ওপর পড়ে থাকা ছুরিটার দিকে। কাগজ কাটার ছুরি, তবে বেশ লম্বা। ছুরিটা তার জন্মদিনে পাওয়া উপহার। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পুরনো সহকারী ক্যাপ্টেন হেস্টিংস দিয়েছিলেন। নিরাপত্তা সংক্রান্ত বহু সংখ্যক জিজ্ঞাসা থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি পাঠানো মুখবন্ধ খাম নিত্য দিন পোয়ারোর টেবিলে এসে পড়ছে। ওই সরু, লম্বা ছুরি দিয়ে তিনি খামের মুখ কাটেন।

সকাল দশটা–গ্র্যান্ডফাদার ঘড়িটা সেকথাই বলছে। অর্থাৎ পোয়ারোর পেশাদারী কাজকর্ম শুরু হল। অবশ্য কাজের খাতিরে মাঝে মধ্যে নিয়মের হেরফের করতে হয়েছে। যেমন দ্য বিগ-ফোর' নামে আন্তর্জাতিক অপরাধ চক্র সম্পর্কে তদন্তের কারণে ভোর হতে না হতেই বেরিয়ে পড়তে হয়েছে। সঙ্গে ছিলেন বন্ধু ও সহকারী ক্যাপ্টেন হেস্টিংস। অপরাধের তদন্ত ও তার মূলে আঘাত করাই ছিল তাদের যৌথ প্রয়াসের লক্ষ্য।

তারপর ক্যাপ্টেন ফিরে গেছেন আর্জেন্টাইনে। সেখানে তার খামার আছে। চাষবাস, পোষা পশু পাখি আর বউ-ছেলেমেয়ের নিয়ে দিব্যি আছেন। তবে খবরটা পোয়ারোর কাণে এসেছেকদিন আগে বন্ধু লন্ডনে এসেছেন। ফসল বেচতে তাকে এখানে আসতে হয়।

এসময় বেজে উঠল পুরনো মডেলের টেলিফোন। পোয়ারো রিসিভার তুলে নিলেন। কাণের কাছে রাখলেন। ওপাশ থেকে জর্জের গলা ভেসে এল–স্যার, ক্লড অ্যামরি আপনাকে চাইছেন।

-দশটা না বাজতে বাজতেই......নিজেকেই নিজে কথাটা শোনালেন। তারপর একটু চড়া আওয়াজে বললেন–জর্জ, আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলছি, তুমি লাইনটা এঁকে দিয়ে নিজের কাছে যাও। দেখো, ডাকলেই যেন সাড়া পাই।

–হ্যালো, আমি এরকুল পোয়ারো। ধীর কণ্ঠে পোয়ারো বললেন আপনি?

–পোয়ারো। একটি রাশভারি গলা ওপ্রান্ত থেকে বলে উঠল। আমি, আমি ক্লড অ্যামরি বলছি আপনার সঙ্গে আমার একবার দেখা হয়েছিল আগে, ভুলে যাননি নিশ্চয়ই?

না, ভুলিনি। সেই সরকারি দলিল খুঁজে বের করার ব্যাপারটা তো। আপনি ছিলেন সেই সময়।

পোয়ারোর মুখে আত্মবিশ্বাসের হাসি।

-হ্যাঁ। শুনুন পোয়ারো, যেজন্য আপনাকে আমি যোগাযোগ করছি, স্যার ক্লডের কণ্ঠে উদ্বেগের আভাস–কঠিন এক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে আমার জীবনে। টেলিফোনের মাধ্যমে সবিস্তারে বলা সম্ভব নয়। আসলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এমন এক বিষয় নিয়ে আমি কিছুদিন যাবত গবেষণা করছি। পৃথিবীর বিনাশ ঘটাতে প্রচণ্ড শক্তিশালী বোমা ও মারণাস্ত্র তৈরি হচ্ছে, এ যে পরমাণু ব্যবহার করা হয়, তা ধ্বংস করার অস্ত্র আবিষ্কার করাই আমার কাজ। এক ফর্মুলা বের করেছি। শুধু পরমাণু ধ্বংস নয়, এই ফমূলা মানবকল্যাণমূলক কাজেও অত্যন্ত কার্যকরী। তবে বলতে খারাপ লাগছে, আমার পরিবারের কোন একজন ওই ফর্মুলা চুরি করার মতলব করেছে। অন্য দেশকে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ কামাবে আর নিজের দেশের ধ্বংস ডেকে আনবে।

একটু থেমে স্যার ক্লড আমায় বলতে শুরু করলেন–মিঃ পোয়ারো, আপনি যদি আমার বাড়ি আরটস ক্লিভে একবার আসেন, তাহলে ভাল হয়। আপনার হাতে ওই ফর্মুলা আমি তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই। লন্ডনের প্রতিরক্ষা বিভাগের কোন বড়কর্তার হাতে তুলে দেবেন। আপনার ওপর আমি ভরসা করতে পারি। আসুন উইক এন্ডে। আমার নিমন্ত্রণ রইল।

নিজের গুণাবলীর প্রশস্তি কে না শুনতে পছন্দ করে। পোয়ারোও এর ব্যতিক্রমী নন। ঘাড় ফেরালেন। আয়নায় তার মুখের প্রতিচ্ছবি চুলবিহীন মস্ত এক টাকওয়ালা মাথা, চকচকে চওড়া গোঁফ গর্বে তার বুক ফুলে উঠল। স্যার ক্লড অ্যামরি! যশস্বী বিজ্ঞানী, তাঁর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করা কি কম কথা! তার ওপর উপরি পাওনা ওই ফর্মুলা প্রতিরক্ষা দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া–এ কাজে দেশপ্রেমের ছোঁয়া আছে, রোমাঞ্চকর ব্যাপার।

ঠিক আছে, স্যার ক্লড, আয়নার দিক থেকে ঘাড় ঘোরালেন, এই উইক এন্ডেই যাব। শনিবার বিকেল নাগাদ আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাব। রবিবার থেকে পরদিন সোমবার লন্ডনে ফিরে আসব। এই সময় আপনার জিনিসটা দিয়ে দেবেন। যাকে দিতে বলবেন, তাকেই দিয়ে দেব। আর কিছু?

-না, আর কিছু নয়। সাক্ষাতে সব কথা হবে। অনেক ধন্যবাদ, মিঃ পোয়ারো। আজ রাখছি, গুড ডে।

–গুড ডে, স্যার ক্লড। ঘটাং করে ক্রেডেলের ওপর রিসিভার নামিয়ে রাখলেন খুঁদে গোয়েন্দা। ভৃত্যের খোঁজ করলেন।

জর্জ সামনে এসে দাঁড়াল।

-শোনো জর্জ, ড্রাই ক্লিনিং-এ এক্ষুনি যাও। আমার ভারী টুইডের স্যুট, ডিনার জ্যাকেট আর দুটো ট্রাউজার্স কাঁচতে দিয়ে এস। শুক্রবার রাতের মধ্যে ওগুলো আমার চাই, অন্যথা যেন না হয়। ওদের কথাটা বলে আসবে। ওখান থেকে এসে আমার পুরনো সার্ভিস রিভলভার দুটোর নলকে পরিষ্কার করে রেখ। ভুল যেন না হয়।

জর্জ ঘাড় নেড়ে বিদায় নিল।

পোয়ারো টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিলেন। নাম্বার ডায়াল করলেন ওপ্রান্ত থেকে সাড়া এল, চেনা গলা ক্যাপ্টেন হেস্টিংস? আমি বলছি, হারে বাপু হা, এরকুল পোয়ারো। ক্যাপ্টেন, তুমি আমার খোঁজ খবর রাখ না জানি, কিন্তু তুমি যে ফসল বেচতে লন্ডনে এসেছ, সে খবর আমার কাছে আছে। শহর থেকে এসময় লোকে হাওয়া পরিবর্তনের জন্য গ্রামে ঘুরতে বেড়াতে যায়। প্রকৃতি এই সময় নবসাজে ফুলে ফলে সেজে ওঠে, যেন অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ। এই শনিবার শহরে যাচ্ছি। অন্যবারের মতো নিশ্চয়ই তুমি আমার সঙ্গী হবে, তাই তো?

.

০২.

শুক্রবার। একটু আগে সন্ধ্যে নেমেছে। আকাশে একটি দুটি তারার ভিড় শুরু হয়েছে।

অ্যারটস ক্লিভ। স্যার ক্লডের পৈত্রিক বাড়ি। একতলায় পূর্বদিকের ঘরটি তার স্টাডি। তিনি চুপ করে বসে আছেন।

ক্লডের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিয়ে ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল বাটলার ট্রেডওয়েল।–মাফ করবেন, স্যার ক্লড। ডিনারের ঘণ্টা বেজে গেছে। আপনি যাচ্ছেন না দেখে ডাকতে এলাম মনে হয় আওয়াজ শুনতে পাননি।

-ট্রেডওয়েল, তোমার অনুমান ঠিক। মাথা না তুলে স্যার ক্লড বলতে থাকলেন। ফোনে কথা বলতে ব্যস্ত ছিলাম, তাই ঘণ্টাধ্বনি কানে পৌঁছয়নি। বাড়ির অন্যান্যরা নিশ্চয়ই ডিনার টেবিলে পৌঁছে গেছে। তুমি যাও, আমি হাতের কাজটা সেরে যাচ্ছি।

ট্রেডওয়েল নিঃশব্দে বিদায় নিল।

স্যার ক্লডের বুকের খাঁচা থেকে উঠে এল স্বস্তির নিঃশ্বাস। উঠে দাঁড়ালেন। ডেস্ক-এর ড্রয়ার টানলেন। হাতে তুলে নিলেন একটা নোটবুক, টেলিফোন নম্বর লেখা। পাতা ওল্টালেন। হ্যাঁ, এই নম্বর। ফোনের বোতাম টিপলেন–হ্যালো এক্সচেঞ্জ? ৩১৪ নম্বর মার্কেট ক্লিভ থেকে বলছি, লন্ডনের এই নম্বরে কথা বলতে চাই।

ফার-লন্ডন শহর থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে, দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থান। এ অঞ্চলটা আগে অজ পাড়া গাঁ ছিল। ধীরে ধীরে কলকারখানা গড়ে উঠেছে, বেড়েছে মানুষের বসতি। এমন কি কয়েকটি বড় বড় অট্টালিকাও তৈরি হয়েছে। বর্তমানে ভারিক্কী চেহারা লাভ করেছে। ফার-এর মার্কেট ক্লিভেলের গায়ে এখন গরীব তকমা পড়েছে।

স্যার ক্লড অ্যামরির পিতা-পিতামহ ছিল এখানকার জমিদার। সেই কোন কালে তারা এখানে প্রাসাদসম অট্টালিকা গড়েছিলেন। নাম দিয়েছিলেন অ্যাবটস ক্লিভ। তাদের শিল্প সৌন্দর্যের তারিফ করতে হয়। ভিক্টোরিয়ান স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। সর্বত্র। মস্ত ফটক। নুড়ি বিছানো পথ চলে গেছে বাড়িতে ঢোকার দরজা পর্যন্ত। পথের দুপাশে নানা রকম গাছ আর ঝোপঝাড়। বাড়ির পেছনে ঢালু লন দীর্ঘ বারান্দার নীচ দিয়ে চলে গেছে। লনের শেষে বাগান, অযত্ন ও অবহেলায় আজ জঙ্গলে পরিণত হয়েছে।

স্যার ক্লড অ্যামরি খাবার ঘরে এসে ঢুকলেন। ডিনার টেবিলের একপ্রান্তের চেয়ারে বসলেন। তার হোটবোন ক্যারোলিন অ্যামরি। অবিবাহিতা। দাদার-স্ত্রী মারা যাবার পর এসংসারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তাই বিয়ে করে ঘর-সংসার করা তাঁর আর হয়ে ওঠেনি, ক্যারোলিনা মনে মনে তাই ভাবেন। আসলে তিনি বহুবল্লভা, নিত্য নতুন পুরুষসঙ্গীকে প্রেম নিবেদন করেন।

ক্যারোলিন বসেছেন দাদার মুখোমুখি অন্যপ্রান্তের চেয়ারে। রিচার্ড–স্যার ক্লডের একমাত্র ছেলে। সে বাবার ডানদিকের আসনে, তার পাসে ক্লডের ভাইঝি বারবারা। ডঃ কারেলি বর্তমানে অ্যামরি পরিবারের অতিথি, জাতে ইটালিয়ান, একটু তফাতে। এডওয়ার্ড রেনর–স্যার ক্লড-এর সেক্রেটারি, ক্যারোলিনের ডানপাশে বসেছে। লুসিয়া-ক্লডের পুত্রবধূ, রিচার্ডের স্ত্রী, রেনরের পাশের চেয়ারটিতে তাকে দেখা যাচ্ছে।

স্যার ক্লড দুপুর ও রাতের খাবার মুখ বুজে খেয়ে নেন–এটা তার স্বভাব। আজও তার অন্যথা হল না। অথচ অন্য সাতজনের মুখেও নেমেছে ঘোর অমানিশা। কোন কথা না-বলে যে যার খাওয়া সেরে নিলেন।

পুরুষ মানুষের সঙ্গ না পেলে ক্যারোলিনের আবার পেটের খাবার হজম হয় না। পারিবারিক অতিথি ডঃ কারোলির কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে তিনি হাঁপিয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত সেক্রেটারি এডওয়ার্ড রেনরের সঙ্গে ফস্টি-নষ্টি শুরু করলেন।

এডওয়ার্ড নিরীহ গোবেচারা গোছের মানুষ। নোংরা ইয়ার্কি তার পছন্দ হয় না। হঠাৎ বিষম খেল। এক গ্রাস ঢক্ করে খেয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে ক্যারোলিনের কাছে ক্ষমা চাইল।

পিসিমার এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন বদরসিকতা, বিশেষ করে ওই গোবেচারা মানুষটার সঙ্গে, রিচার্ড মোটেও সহ্য করতে পারছিল না। সে বারে বারে স্ত্রীর দিকে তাকাচ্ছিল, অর্থাৎ পিসিমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা কর। কিন্তু বেচারী লুসিয়া, ব্যাপারটা এখন আর তাই হাতের মধ্যে নেই, অতএব চুপ করে থাকতে হল।

ডিনারের শেষে ডেসার্ড পরিবেশনের পালা। ট্রেডওয়েল এগিয়ে এল। ঠিক এই সময় স্যার ক্লড বাটলারকে উদ্দেশ্য করে সবাই যাতে শুনতে পায়, এমন কণ্ঠস্বরে বললেন ট্রেডওয়েল, ম্যাকসনের গ্যারেজে একবার ফোন কর। রাত আটটা পঞ্চাশের ট্রেনে লন্ডন থেকে আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক আসবেন। স্টেশনে গাড়ি পাঠিয়ে তাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা কর।

এখুনি ফোন করছি, স্যার ক্লড। ডেসার্ডের পাত্র টেবিলের মাঝখানে রেখে ট্রেডওয়েল কয়েক পা পিছনে সরে গেল।

ঠিক এই সময় লুসিয়া চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল–কিছু মনে করবেন না, দুঃখিত, আমাকে এবার উঠতে হচ্ছে। কথা শেষ করে কোন দিকে না তাকিয়ে লুসিয়া পা ফেলে এগোল। ঘটে গেল এক সংঘর্ষ–ট্রেডওয়েল ও লুসিয়া।

লুসিয়া নিজেকে সামলে নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে পথ ছেড়ে দিল। ট্রেড-ওয়েল ডিনার হল থেকে বেরিয়ে গেল।

লুসিয়াও সেখান থেকে অদৃশ্য হল। সিঁড়ি টপকে নেমে এল নীচে, বসার ঘরে। স্যার ক্লড-এর স্টাডিরুম এর পাশেই। মাঝের দরজা দিয়ে ঢোকা যায়। এ ঘরে আছে ফায়ার প্লেস, বেশ বড় সড়ো। ম্যান্টেলপিসে রাখা দম দেওয়া ঘড়িটা বনেদিয়ানার পরিচায়ক, রয়েছে ফুল রাখার একটা পাত্র, অবশ্য ফুলের পরিবর্তে রয়েছে মোমবাতি আর কাগজের টুকরো, যা ফায়ার প্লেসের কাঠে আগুন ধরাতে ব্যবহার করা হয়।

বসার ঘরকে লাইব্রেরী বলা চলে। ঢাউস সাবেকি একটা বইয়ের শেলফে অসংখ পুরনো আমলের বই সাজিয়ে রাখা আছে। শেলফের ওপারের তাকে একটা খালি টিনের বাক্স। ডেস্কের ওপর টেলিফোন, সামন টুল, বসে কথাবলার জন্য। খানিক দূরে ছোট টেবিলের ওপর পুরনো একটা গ্রামোফোন ও কিছু রেকর্ড। সাবেকি কফি টেবিলও রয়েছে। একটা বড় মাপের টেবিল রয়েছে, কয়েকটা ছাপানো বই একপাশে সাজানো। দুটো সাদামাটা চেয়ার, আর একটা আরামকেদারা রয়েছে জানলার পাশে, মন চাইলে পা ছেড়ে আরাম

করা যায়। ছোট্ট একটা চারা গাছ বোতল-টবে সাজিয়ে ছোট টেবিলের ওপর রাখা। এই হল অ্যামরি পরিবারের বসার ঘরের আসবাবপত্রের বর্ণনা। এখানে সবকিছুই সাবেকি, কিন্তু প্রাচীন বা অ্যান্টিক বলা যায় না।

রিচার্ড অ্যামরির স্ত্রী লুসিয়া চব্বিশ-পঁচিশ বছরের এক সুন্দরী তরুণী। ঘন কালো ডগা ছাঁটা চুলগুলো কাঁধের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। অত্যন্ত চাপা তার চোখের চাউনি, যা আবেগে অবর্ণনীয় ভাবে জ্বলছে।

ত্রস্ত চরণে সে বসার ঘরের ঠিক মাঝখানে চলে এল। ফ্রেমে বাঁধানো জানলার পর্দা সরাল। দৃষ্টি নিক্ষেপ করল রাতের কালো আকাশের দিকে, অসংখ্য তারা মিটিমিটি জ্বলছে।

ইতিমধ্যে ডিনার হল থেকে পিসিমা ক্যারোলিন বেরিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে সোজা বসার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ফায়ার প্লেসের আগুনে ঘরে আবছা আলোর সৃষ্টি হয়েছে।

ক্যারোলিন দ্রুত পায়ে লুসিয়ার পেছনে এসে দাঁড়ালেন। তাকে একপ্রকার জোর করে জানলা থেকে সরিয়ে আনলেন। একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। বললেন এখানে শান্ত হয়ে বসো, ক্যারোলিন বুঝি লুসিয়ার মা, এমনই শাসনের সুরে বললেন–দুমিনিট সময় দাও, দেখবে সুস্থ লাগবে।

-সত্যিই তাই, পিসিমা, লুসিয়ার কণ্ঠে কৃতজ্ঞতার সুর, কিন্তু মুখে বিষণ্ণতার ছোঁয়া ওটা আর হবে না। ইংরাজি তার মাতৃভাষা নয়, তার আনাড়ি কথা শুনলেই বোঝা যায়।

তোমার ফিটের অসুখ আছে জানি। তুমি বেরিয়ে আসতেই আমার সন্দেহ হল। তাই তো পেছন পেছন সোজা এখানে চলে এলাম, ক্যারোলিন বলতে থাকলেন, এসে দেখলাম সত্যিই তাই। ভাগ্যিস আমি এসে পড়েছিলাম, যেভাবে আকাশের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে ছিলে...... টেনে হিঁচড়ে ওখান থেকে সরিয়ে আনতে বাধ্য হলাম। লুসিয়া, সোনা আমার বিশ্বাস কর, কোন কুমতলবে আমি এখানে আসিনি।

–পিসিমা, ওভাবে বলবেন না, লজ্জিত হল লুসিয়া। ভাগ্যিস আপনি টের পেয়েছিলেন, তাই ছুটে এলেন, নয়তো জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকতে হত আমায়। তবে একটা কথা আমি বুঝে পাই না, কেন যখন-তখন আমি ভিরমি যাই বলুন তো?

কথা বলতে বলতে লুসিয়া তার হাতব্যাগ থেকে রুমাল বের করল, ওতে ওষুধ মাখানো আছে। নিজের চোখে মুখে ভাল করে রুমালটা দিয়ে মুছে নিল, আবার সেটা সম্মুখে রেখে বলল–পিসিমা, আপনি এখন নিশ্চিন্তে ওপরে যান। আমিও আসছি।

তুমি আমায় এড়িয়ে যেতে চাইছ, ক্যারোলিনের গলায় কতৃত্বের সুর, বিকেলবেলাতেই আমি লক্ষ্য করেছি, তোমার ঠাণ্ডা লেগেছে, বেশ ভালোরকম, বুঝেছি ইটালি! হাতব্যাগটা পাশে সরিয়ে রেখে লুসিয়া বলল–ইটালি–তা?

–এ আর নতুন কথা কি হল, বাছা, ক্যারোলিনের স্নেহের হাতের পরশ তখন লুসিয়ার গায়ে মাথায় খেলে বেড়াচ্ছে, নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশ-বিভুঁইয়ে ঘর-সংসার করছে, মন তো খারাপ হবেই। আমি কি তা জানি না?

–পিসিমা, আপনার ধারণা ভুল। আপনি কিছু জানেন না লুসিয়া বেশ জোরালো কণ্ঠস্বরে বলে উঠল, ইটালির জন্য মন আমার খারাপ হয় না। আমি সে দেশের কথা ভুলে গিয়েছি, কখনো মনে পড়ে না।

লুসিয়ার কথাগুলো কেমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে। সে তখনও চেঁচিয়ে বলে চলেছে ইটালির প্রতি আমার কোনো ভালোবাসা নেই। ইংল্যান্ড আমার কাছে স্বর্গসমান। এখানে কোন কিছুর অভাব নেই আমার। আপনার মতো দয়ালু আত্মীয়দের আমি পেয়েছি, স্নেহ-ভালবাসার জোয়ারে আমি সর্বদা ভাসছি। আমার আদরযত্নের প্রতি আপনাদের সজাগ দৃষ্টি আছে। একমাত্র এই দেশ ছাড়া। নাটক-উপন্যাসে স্বর্গসুখের অপূর্ব বর্ণনার কথা পড়েছি বটে, কিন্তু বাস্তবে তা দেখতে পাচ্ছি।

–বাঃ, কি সুন্দর সাজিয়ে গুছিয়ে মেপে মেপে কথা বল তুমি, এমন শোভনীয় আচরণ, নিশ্চয়ই তোমার মায়ের সুশিক্ষার ফল। এই পরিবারের একজন হতে পেরে তুমি যে সত্যিই নিজেকে সুখী বলে মনে কর, তাও আমার অজানা নয়। তবে এখানে একটা জিনিসের অভাব! মা বলে ডাকার মতো কেউ নেই তোমার।

–ছাড়ুন না, পিসিমা, লুসিয়া ক্যারোলিনকে থামিয়ে দিল। বলল, মায়ের সম্পর্কে কোন কথা শুনতে চাই না। ওসব বাদ দিন।

বেশ, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, এ বিষয়ে কোন কথা কখনও বলব না, আমতা আমতা করে বলতে থাকেন ক্যারোলিন–তোমায় দুঃখ দেওয়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই, মিথ্যে

বলছি না। বিশ্বাস কর। লুসিয়া...... মানে.....তুমি যদি চাও, আমার কাছে ভাল স্মেলিং সল্ট আছে, নিতে আরো।

ধন্যবাদ, পিসিমা। ওসব লাগবে না, লুসিয়া সহজভাবে বলে চলল, শরীর আমার ভালই আছে, চিন্তা করবেন না।

-খুব ভাল স্মেলিং সল্ট, বুঝেছ। ক্যারোলিন বলতে থাকেন, সুন্দর ছোট্ট একটা শিশিতে কড়া আঁঝের জিনিস। নামটা ঠিক মনে পড়ছে না এখন স্যাল অ্যামোনিয়া সম্ভবত। স্টিরিট অব সল্ট মনে হচ্ছে। তবে যাইহোক না কেন, তোমার ওই স্নানের জলে গোলা জিনিস নয় এটা।

লুসিয়া নীরব হল, কেবল ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল।

ক্যারোলিন বিষয়ান্তরে চলে এলেন। এপাশ-ওপাশ ছড়িয়ে পড়া গদিগুলোকে স্বস্থানে গুছিয়ে রাখতে রাখতে তিনি বললেন–এই তো আজ সকালেও তুমি বহাল তবিয়তে ছিলে, হঠাৎ কোথা থেকে ঠাণ্ডা লাগালে যে, নাকি ওই ইটালিয়ান ডঃ ক্যারোলিনকে হঠাৎ দেখে মনে পড়ে গিয়েছিল নিজের দেশের কথা। তাই হয়তো শরীরটা খারাপ হয়েছে। তোমার।

এসব কথাবার্তার মাঝখানে ও ঘরে এসে ঢুকল রিচার্ড। পিসি ক্যারোলিন ভাইপোকে দেখতে পাননি। কিন্তু লুসিয়া তাকে দেখে হকচকিয়ে গেল। নিশ্চয়ই পিসির বলা কথাগুলো রিচার্ড শুনেছে। কি যে হবে এবার। ভয়ে তার বুকটা ধড়াস করে উঠল, দু'চোখ কেঁপে কেঁপে উঠল।

ক্যারোলিন বলল–কি হল, বাছা? আবার নিশ্চয়ই শরীর খারাপ হচ্ছে?

দরজা বন্ধ করার আওয়াজ হল। ক্যারোলিন ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। রিচার্ডকে দেখতে পেলেন। বছর তিরিশের এক যুবক, মাঝারি উচ্চতা, বাদামি বর্ণের চুলে মাথা ঢাকা, পেটানো চেহারা, নিয়মিত ব্যায়ামের ফল–এক সুপুরুষ ইংরেজ। এক সময় সামরিক বাহিনীতে ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত ছিল। ক্যারোলিন জানে, এই ইংরেজ যুবক তাকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না, তাই যতটা সম্ভব তিনি তাকে এড়িয়ে চলেন।

–পিসিমা, এ কেমন তোমার ব্যবহার। খাওয়া শেষ না করে উঠে এলে, রিচার্ড কৈফিয়তের সুরে বলে চলল, বাবার খাওয়া এখনও শেষ হয়নি, আর তুমি তো খুব ভাল ভাবেই জানেনা, খাওয়া শেষ না করে উঠে যাওয়া বাবার একেবারে পছন্দের নয়। এসব কথা তোমাকে নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। যাও, ওপরে যাও। আমি আছি লুসিয়ার কাছে। ও খুব শিগগির ভাল হয়ে উঠবে।

-বাঃ, খুব ভালই হল। তুমি এসে গেছ, আমার আর থাকার দরকার নেই বল। ক্যারোলিন উঠে দাঁড়ালেন এবার আমাকে যেতেই হচ্ছে। ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন রিচার্ড, আমার খাওয়া শেষ না করে এভাবে চলে আসা ছাড়া, তার গলায় তিক্ততা ঝড়ে পড়ছে, ওঁর গবেষণার কাছে যেসব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে, তার সবকটিই কিন্তু তোমার বাবার অপছন্দের, বিশেষ করে ওই অচেনা অজানা অতিথিটি, বলা নেই কওয়া নেই এসে জুটেছেন, তাকে তো একেবারেই নয়।

লুসিয়া আর রিচার্ড চুপ, হাড় জ্বালানো মহিলা ক্যারোলিন, কান ভাঙিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছেন।

তুমি পৃথিবীর এই প্রান্তে ঘর-সংসার পেতে বসেছ, যোগাযোগ না-থাকলে ওই লোকটা, মানে ডঃ ক্যারোলি জানবেন কি করে? চাপা হিসহিসানি কণ্ঠস্বর ক্যারোলিনের অ্যাবটস ক্লিভের কাছাকাছি কোন সরাইখানাতে উঠেছেন খবর পেয়েই তুমি তাকে নিয়ে এলে জামাই আদর করে। ডঃ ক্যারেলিও তোমার পিছু পিছু ঢুকে পড়লেন, আমার দাদার অতিথি হয়ে দিব্যি দিন কাটাচ্ছেন, নড়বার নাম নেই।

বজ্জাত পিসিমার এমন অপমানসূচক মন্তব্য শুনে লুসিয়া মনে মনে রেগে গেল, কিন্তু তা প্রকাশ করল না। বলল–সত্যি ঠিকই বলেছেন, পিসিমা, অবাক হবার মতোই ঘটনা।

–যাই বল বাপু, তোমার ওই, ইটালিয়ান বন্ধুটি দারুণ সুদর্শন, তাই কিনা?

–পিসিমা, ভুল, ভুল। আপনার সবটাই ভুল, প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা গেল লুসিয়ার আপনি সেই থেকে ডঃ ক্যারোলিকে আমার বন্ধু বলে চালিয়ে যাচ্ছেন, আগেও বলেছি, আবার বলছি, ওনার সঙ্গে আমার কোনরকম বন্ধুত্ব নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার দেখা হয়েছিল ওঁর সঙ্গে, তা অনেক দিন আগের কথা। সেই খাতিরেই ওঁকে নেমতন্ন করে এখানে এসেছি। ওঁর সঙ্গে কথা বলে খুশি হয়েছিলেন গৃহকর্তা স্বয়ং, তার অনুরোধ ফেলতে পারেননি ডঃ ক্যারোলি। ব্যাস, এই পর্যন্ত। এব্যাপারে, আপনার সঙ্গে আর কোন কথা বলতে চাই না।

রিচার্ড নীরবে সব শুনছিল। বুঝল, ক্যারোলিন ও লুসিয়ার মধ্যে ঝগড়া বাঁধতে দেরি নেই। ক্যারোলিনকে ভেজানো দরজা খুলে দিয়ে ওপরে চলে যেতে ইঙ্গিত করল।

তবু আমি দেখেছি, কিছু কিছু বিদেশী নিজেকে জাহির করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দেশের বাইরে পা বাড়ালে প্রথমে চেনা-জানা বন্ধুর খোঁজ করে, খাওয়া-থাকার খরচটাতে বাঁচল। ক্যারোলিন বলতে বলতে এগিয়ে গেলেন। থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালেন–তবে আমাদের লুসিয়ার কথা আলাদা, বিদেশী বটে, তবে পুরোপুরি ইটালিয়ান এখন আর নেই। ব্রিটিশ আর ইটালিয়ান–আধাআধি।

ক্যারোলিন লাইব্রেরি ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়িতে পা রাখলেন।

উফ, কি মতলববাজ মহিলা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রিচার্ড ঘরের দরজা বন্ধ করে এগিয়ে এল। লুসিয়ার পিঠের ওপর হেলান দিয়ে বসল। বলল–পিসিমা খুব জ্বালাচ্ছিলেন, তাই না, লুসিয়া?

রিচার্ড, এই পরিবারে যেদিন আমি বউ হয়ে এসেছি, সেদিন থেকেই লক্ষ্য করেছি, আমাকে খোঁচা দিয়ে কথা না বললে ওনার শান্তি হয় না। আমি ইটালিয়ান বলে হয়তো আমাকে সহ্য করতে পারেন না। ইটালিয়ানরা কেন যে ওনার দুচোখের বিষ, বুঝে পাই না।

–এসব হল হিংসা, জ্বালা, বুঝেছ লুসিয়া। সামান্য হেসে রিচার্ড বলতে থাকে, অনেক মহিলা আছে, যাদের বিয়ে হয়নি, সে আশাও নেই, কমবয়সী বিবাহিত মেয়েদের দেখলে তাদের গা রি-রি করে জ্বলে–ঈর্ষায়। পিসিমার ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে গেছে। আর একটা

কারণ হতে পারে, ছোটবেলায় আমি আমার মাকে হারিয়েছি। আমার পিসি এসে এই সংসারের হাল ধরেছিলেন। তিনিই এ বাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী। তুমি আসার পর থেকে তার মনে সম্ভবত একটা আশঙ্কা সর্বদা তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

–এই বোধ হয় গদিচ্যুত হলাম।

রিচার্ড একটু থামল, আবার বলতে শুরু করল–তবে আমি নিশ্চিত, পিসিমার চটে যাওয়ার পেছনে অন্য আর কারণ আছে। পিসিমাকে একবার ইটালিতে যেতে হয়েছিল লিওনার্ডো ডা ভিসির ওপর গবেষণামূলক কাজ করতে। ওইসব এক ইটালিয়ান গাইডের প্রেমে পড়েন, লোকটি তার থেকে বয়সে অনেক ছোট ছিল। প্রেম পেকে যখন রসপূর্ণ হয়েছে, ঠিক সেই সময় তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। মনমরা হয়ে পিসিমা ফিরে এসেছিলেন। এসব মা-ই শুনিয়ে ছিলেন।

রিচার্ড আবার থামল, দম নিল। আবার শুরু করল–আমারও নিজের ওপর কম রাগ হয়, লুসিয়া বাবার কথা মেনে চাকরিতে স্বেচ্ছা অবসর দিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। বাবার ইচ্ছানুযায়ী তার গবেষণার কাজে সাহায্য করতে শুরু করলাম। ভাবলাম, এর ফলে আর্থিক দিক থেকে উন্নতি ঘটবে। কিন্তু এখন দেখছি সব ভুল, ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমার নিজস্ব পরিচয় বলতে কিছু নেই। না আমি এক ফৌজী ইঞ্জিনিয়ার, না আছে বাবার মতো বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, গবেষণার কাজে এক্কেবারে অনুপযুক্ত।

কথা শেষ করে রিচার্ড স্ত্রীর কাছে এগিয়ে এল। ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। চার চোখের মিলন ঘটে গেল।

লুসিয়া, বল, কিভাবে তোমায় সাহায্য করি? কিছু প্রয়োজন? আমি এখন তোমার কাছেই থাকব।

-তাই বুঝি! লুসিয়ার ঠোঁটে কাষ্টহাসি। কিন্তু রিচার্ড, ডিনার টেবিল থেকে খাওয়া ফেলে চলে আসা বাবার অপছন্দ, পিসিমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে, অথচ তুমি নিজের বেলায় ভুলে গেলে? যাও, ডিনার হলে গিয়ে খাওয়া শেষ করে নাও।

আমি খাওয়া সেরেই এসেছি তোমার কাছে, কিছুক্ষণ গল্প করব। রিচার্ড মুচকি হেসে বলল–ওভাবে না বললে পিসিমাকে এ ঘর থেকে নড়ানো যেত?

–কিন্তু রিচার্ড, লুসিয়া আলগোছে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরল, আমি যে একা থাকতে চাই, তাই এঘরে চলে এসেছি। আমার শরীরের কথা ভেব না, ভাল আছি, বিশ্বাস কর।

লুসিয়ার মাথার পাশের ফ্রেঞ্চ উইন্ডোটা খোলার জন্য রিচার্ড এগিয়ে এল, জানলা খোলার চেষ্টা করল, কিন্তু ব্যর্থ হল। ঘেমে নেয়ে একশা। শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিয়ে, ফিরে এল স্বস্থানে–ধু! এ যেমন-তেমন ছিটকিনি নয়। তারপর চুপ। ভাবনার আলোড়ন-বুঝেছি, নিরাপত্তার কারণে বাবা বিশেষ ছিটকিনির ব্যবস্থা করেছেন, চাবিটা নিজের কাছেই রেখেছেন।

লুসিয়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল–বাদ দাও, জানলাটা বন্ধই থাক।

রিচার্ড টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। চেয়ার টেনে বসল। টেবিলে কনুই রেখে সামান্য ঝুঁকল–আমার বাবা, আশ্চর্য মানুষ বটে। চব্বিশ ঘণ্টা আবিষ্কারের নেশায় মশগুল।

পারমাণবিক অস্ত্র শুরু থেকে নতুন মানের মজবুত ছিটকিনি, আর কি বাকি আছে কে জানে। ভাবনার অন্ত নেই।

-তোমার বাবা কতরকমের আবিষ্কার করেছেন, নিশ্চয়ই প্রচুর অর্থ রোজগারও করেছেন? লুসিয়ার অন্যমনস্ক কণ্ঠস্বর।

–কি বলছ, লুসিয়া! প্রচুর নয়, কাড়ি কাড়ি। কিন্তু টাকা কড়ির প্রতি তেমন লোভ নেই। রিচার্ডের নীরস কণ্ঠস্বর, সবই বিজ্ঞানীরা বোধহয় একই ধাতু দিয়ে গড়া, অর্থ, বিষয় সম্পত্তির প্রতি আসক্তি সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক কম। মানুষ যেসব জিনিস অকেজো ভেবে ফেলে দিচ্ছে, বিজ্ঞানীরা সেগুলো কুড়িয়ে কাড়িয়ে নিয়ে আসছেন, সর্বক্ষণ গবেষণা করে চলেছেন।

-তাহলে উনি যে সে মানুষ নয় বল?

নিশ্চয়ই, রিচার্ড জোর গলায় বলে উঠল, আমি আমার বাবাকে বর্তমান বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীদের একজন বলে মনে করি। তবে ওঁর একটা দোষ আছে–নিজের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রাধান্য দেন। আমার সঙ্গে উনি যে আচরণ করে চলেছেন, আমি তা সহ্য করতে পারছি না। বিরক্ত ধরে গেছে।

–ঠিকই বলেছ, রিচার্ড, লুসিয়া স্বামীকে সমর্থন করল, নয়তো কেউ নিজের ছেলেকে বিনা কারণে বাড়িতে বন্দী রাখতে পারে, যেন জেলের কয়েদি।

একথা আগেই তোমায় বলেছি, রিচার্ড বলে চলল–বাবা বললেন চাকরিটা ছেড়ে দিতে। তাঁর গবেষণার কাজে সহযোগিতা করতে। তাহলে শুরু করা কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করা সম্ভব হবে। আর অর্থনৈতিক উন্নতিও ঘটবে আমাদের। রিচার্ড কণ্ঠে একরাশ বিরক্তি এনে বলে চলল বাবা ঠিকই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভেবে চাকরিটা ছেড়ে দিলাম। আর এখন তার খেসারত দিতে হচ্ছে। আমি কি ছাই ওইসব মৌলিক গবেষণার কিছু বুঝি। সামান্য এক ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষে বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি সূক্ষ্ম ব্যাপারে মাথা ঘামানো কি চাট্টিখানি কথা! তবে একটা রক্ষে, স্বেচ্ছা অবসর নিয়েছিলাম, মেয়াদ এখনও ফুরোয়নি। চাইলে যে কোন সময় কাজে যোগ দিতে পারি। দরকার পড়লে ওরাও ডাকতে পারে।

–টাকা। প্রচুর টাকা। কাড়ি কাড়ি টাকা, বিড়বিড় করে উঠল লুসিয়া। তারপর অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে বলতে থাকল–টাকা, টাকা আর টাকা। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার মূলে আছে অহোরাত্রি ছুটে মরছে–আরো টাকা! আরো টাকা!

-লুসিয়া, জালে আটকে পড়া মাছি দেখেছ তুমি? রিচার্ডের গলায় বিষণ্ণতার সুর। পিষে মেরে ফেলা মাছি? আমার অবস্থাও ঠিক তাই, অসহায় এক মাছি!

রিচার্ড! লুসিয়া স্বামীর দিকে তাকাল, ব্যাকুলতা ঝরে পড়ছে তার কণ্ঠে আমার দিকে ভালভাবে তাকাও। কি মনে হয় তোমার? আমি কি খুব ভাল আছি? তোমার মতোই অসহায় এক মাছি।

স্ত্রীর কথা শুনে রিচার্ড চমকে উঠল। অজানা আশঙ্কায় তার বুকের ভেতর তোলপাড় শুরু হল।

রিচার্ড, আমায় রক্ষা কর। কথা বলতে বলতে লুসিয়া উঠে দাঁড়াল। চাপা উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে সে আবার বলল–চল, আমরা পালিয়ে যাই, দূরে অনেক দূরে, এবাড়ির দমবন্ধ করা পরিবেশ যেখানে নেই। দয়া কর, রিচার্ড!

–কি বলছ! পালিয়ে যাব? তোমাকে নিয়ে? কিন্তু কোথায়? কত দূরে সেই জায়গা? রিচার্ডের কথায় ফাঁকা হতাশার সুর।

–যেখানে তুমি বলবে। পৃথিবীতে কি এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে আমরা নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে দিন কাটাতে পারি। কিন্তু এ বাড়ি নয়, এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি বিদায় হওয়া যায়, ততই মঙ্গল। রিচার্ড, আমাকে সর্বদা ভয়ে আতঙ্কে দিন কাটাতে হচ্ছে। ভালভাবে তাকাও। কি মনে হয়, আমি কি খুব ভাল আছি? তোমার মতোই অসহায় এক মাছি।

স্ত্রীর কথা শুনে রিচার্ডের হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠল, অজানা আশঙ্কায় বুকের ভেতরে তোলপাড় শুরু হল।

রিচার্ড, আমাকে বাঁচাও, লুসিয়া উঠে দাঁড়াল, চাপা উত্তেজনার আবেগে কাঁপছে তার শরীর আমি বাঁচতে চাই। এই দমবন্ধকরা পরিবেশে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। তুমি আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চল, দোহাই তোমার।

ঘাড় ঘুরিয়ে লুসিয়া পেছন দিকে কি যেন দেখাল। তারপর আবার বলল–অশুভ কালোছায়ারা সর্বদা এ বাড়ির যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি তাদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বিশ্বাস কর।

রিচার্ডের বোধহয় কথা হারিয়ে গেছে। খানিক বাদে জানতে চাইল কিন্তু লুসিয়া, যেখানেই যাই না কেন টাকার প্রয়োজন। সে টাকা কোথায় পাব। প্রচুর টাকা চাই। লুসিয়া, তুমি তো ভাল ভাবেই জান, পুরুষ মানুষ যতই সুদর্শন হোক না কেন, পর্যাপ্ত অর্থ না থাকলে কোন মেয়ের কাছে কদর পায় না। কি ঠিক বলেছি তো?

–কি যা-তা বকছ? লুসিয়া চমকে উঠল, আসল কথাটা খুলে বল তো।

-বেশ, তাই হোক। তুমি যখন রিচার্ড নিজেকে গুটিয়ে নিল–না না, কিছুই বলার নেই আমার।

আর এখানে থাকা ঠিক হবে না বুঝে রিচার্ড উঠে দাঁড়াল, পা বাড়াতে গিয়ে বাধা পেল। ততক্ষণে লুসিয়ার দুটি হাত চেপে বসেছে রিচার্ডের কাঁধে। তাকে চেপে ধরে জোর করে আগের জায়গায় বসিয়ে দিতে দিতে বলল–রিচার্ড, লক্ষ্মী সোনা–স্বামীর চোখের দিকে তাকাল, নীলনয়না লুসিয়া তখনও মুখ খুলছে না।

রিচার্ডের বিরক্তি ভরে এক ঝটকায় কাঁধ থেকে স্ত্রীর হাত দুটো সরিয়ে দিল।

–রিচার্ড, কোনরকম শব্দটা বের করে স্তব্ধ হয়ে গেল লুসিয়া, কে যেন তার মুখ টিপে ধরেছে, মনে হল।

লুসিয়া, তুমি ভেবেছ, আমার মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, গোবর পোরা, গবেট, কোনও দিকে চোখকাণ নেই, তাই তো। বোঝা গেল রিচার্ড ধীরে ধীরে তার রাগ প্রকাশ করছে।

পলকহীন চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইল ডিনারে বসার আগে তোমার ওই পুরনো বন্ধু এক টুকরো কাগজ তোমার হাতে গুঁজে দিয়েছিলেন, কেউ না লক্ষ্য করুক, ব্যাপারটা আমার চোখ এড়ায়নি।

একটু থামল রিচার্ড, তার মাথায় এখন রক্ত চড়ে গেছে–তুমিও তালবাহানা শুরু করলে, চোখেমুখে এমন ভাব ফুটিয়ে তুললে যে, এখনই জ্ঞান হারাবে। ডিনার টেবিল ছেড়ে উঠে এলে, রিচার্ডের গলার স্বর তখন উঁচু পর্দায় চলে গেছে। আসলে ব্যাপারটা ছিল এইরকম–তোমার ওই পুরনো বন্ধু, যিনি আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়ে ঢুকেছেন, ওই চিলতে কাগজে তিনি কি লিখেছেন, তা জানা-না-পর্যন্ত তোমার স্বস্তি হচ্ছিল না। তখন তুমি উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছ। কিন্তু একদিকে আমি, আর অন্যদিকে আমার পিসিমা যে তোমাকে সবসময় গোয়েন্দার দৃষ্টিতে নজর রেখে চলেছেন, তাদের সামনে তো পড়া সম্ভব নয়। তাই অসুস্থতার ভান করলে, ডিনার টেবিলে ছেড়ে পালিয়ে এলে এঘরে, তোমার পেছন স্মেলিং সল্ট নিয়ে পিসিমাও ছুটে এলেন, তোমাকে সুস্থ করতে হবে তো, খানিকবাদে আমি এসে পড়লাম। আমি যে এঘরে ঢুকে পড়ব, তা তোমাদের দুজনের কেউই আন্দাজ করতে পারোনি।

একনাগাড়ে কথাগুলো বলে রিচার্ড থামল। লুসিয়া বুঝতে পারল, তার আচরণে স্বামী দেবতাটি ক্ষেপে গেছে, অপমানের জ্বালায় জ্বলছে।

রিচার্ড, লুসিয়া কঁদো কাঁদো গলায় বলল, কি আজে বাজে কথা বলছ? মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার। সত্যি বলছি রিচার্ড, ডঃ কারোলির সঙ্গে আমার কোন গোপন সম্পর্ক

নেই। দিনরাত ওঁর কথা ভাবতে যাব কেন? বিশ্বাস কর আমায়, মিথ্যে বলছি না। এসব ভুল ধারণা মন থেকে ত্যাগ কর।

–কথা বাড়িও না। কঠিন কণ্ঠ রিচার্ডের। দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে ঘৃণা কারোলি ওই কাগজে কি লিখেছে, আমি শুনতে চাই। বল, তোমার মঙ্গলের জন্যই বলছি।

-কিন্তু না, বিশ্বাস কর তুমি। কাগজে কিছুই লেখা ছিল না।

-না না, কেবল মুখের কথা বিশ্বাস করব না, রিচার্ড হাত বাড়িয়ে বলল, নিজের চোখে দেখতে চাই। দাও, কাগজটা আমায় দাও। দেখি তোমার কথা সত্যি কিনা দাও, দাও, দেরি কর না।

কোথায় পাব ওটা? অসহায়তা ঝরে পড়ল লুসিয়ার কথাগুলিতে। ওটা ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেলে দিয়েছি, আমার কাছে নেই।

–লুসিয়া! রিচার্ড গর্জে উঠল, মুখে বাঘের নিষ্ঠুর হাসি। কেন খামোখা মিথ্যে কথা বলছ, লুসিয়া, আমি নিশ্চিত ওটা তোমার কাছেই আছে। দাও, দিয়ে দাও ওটা।

স্ত্রীর খুব কাছে এসে দাঁড়াল রিচার্ড, হাত বাড়াল।

লুসিয়া নীরব, কি যেন ভাবল, মুহূর্ত খানেক পরে বলল–তার মানে তুমি আমায় বিশ্বাস করছ না।

-যদি মনে করি, ওটা ছিনিয়ে নিতে পারি। রিচার্ড তখন আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে। দাঁতে দাঁতে পিষে বলল–আমার এই পেশীবহুল চেহারাটা দেখেছ তো। কিন্তু না, গায়ের জোর তোমার ওপর খাটাব না, এ আমার নীতিবিরুদ্ধ। বরং........ রিচার্ড কথা শেষ করল না।

রিচার্ডের হিংস্র চাউনি লুসিয়াকে ভিত করল। আঁতকে উঠে তফাতে সরে গেল।

রিচার্ড তাকাল লুসিয়ার চোখের দিকে, মিনতি ঝরে পড়ছে। কিছুক্ষণ একভাবে সেদিকে তাকিয়ে রইল রিচার্ড। তারপর দৃষ্টি সরিয়ে নিল না, তোমাকে মারধোর করা সম্ভব নয়, সে কাজ আমার নয়।

লুসিয়ার দিকে কঠিন চোখে তাকাল রিচার্ড–তবে......... তবে তোমার ওই বন্ধু উঃ কারোলিকে আমি ছাড়ছি না। উচিত শিক্ষা দেব। আমার দু-চারটে ঘুসিই যথেষ্ট। মুখ থেকে : আসল কথা হুড়হুড় করে বেরিয়ে আসবে। আমার বাড়িতে বসে আমার স্ত্রীর সঙ্গেই ফষ্টিনষ্টি। মজা করা বের করছি।

-না না, ওসব করতে যেও না। লুসিয়া আঁতকে উঠল। বোঝা গেল, দারুণ ভয় পেয়েছে সে দোহাই রিচার্ড, শান্ত হও। ওর গায়ে হাত দিও না, মারধোর করো না।

-বাঃ, চমৎকার, পুরনো প্রেমিকের জন্য দরদ উথলে উঠছে। রিচার্ড ব্যঙ্গের স্বরে বলতে থাকল–ডঃ কারোলিকে আমি মারবই, তাতে তোমার কি?

বাড়াবাড়ি কর না রিচার্ড। চাপা গর্জন শোনা গেল লুসিয়ার কথায়–উনি আমার প্রেমিক নন, কোনকালে ছিলেন না।

-আ-হা-হা! রেগে যাচ্ছো কেন? স্ত্রীকে শান্ত করতে রিচার্ড তৎপর হল। লুসিয়ার কাঁধে হাত বোলাতে বোলাতে বলল–হয়তো উনি এখনও তোমার প্রেমিক হয়ে ওঠেন নি, হয়তো উনি........

রিচার্ড তার কথা শেষ করতে পারল না। বাইরে কারা যেন কথা বলতে বলতে এদিকেই আসছে। রিচার্ড ঝট করে স্ত্রীর কাছ থেকে সরে এল, ফায়ার প্লেসের দিকে পা বাড়াল, সিগারেট ধরাল, দৃষ্টি দরজার দিকে মেলে দিল। লুসিয়া ততক্ষণে ভাল মানুষের মতো রিচার্ডের খালি চেয়ারটা দখল করেছে।

দরজা ঠেলে ঢুকলেন দুই মহিলা ক্যারোলিন অ্যামরি আর রিচার্ডের বোন বারবারা অ্যামরি।

কুড়ি-একুশ বছরের সদ্য তরুণী আধুনিকা বারবারার হাতে ঝুলছে সুন্দর একটি ব্যাগ। কোনদিকে না তাকিয়ে সে সটান এসে দাঁড়াল লুসিয়ার সামনে লুসিয়া, তোমার খবর কি? শরীর ভালো আছে তো?

.

০৩.

লোক দেখানো হাসির ঝিলিক ঠোঁটে ছড়িয়ে লুসিয়া জবাব দিল–হ্যাঁগো সোনা, আমার শরীর ঠিক আছে, কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

-সত্যি? তাই বুঝি? বারবারা রসিয়ে রসিয়ে কথাগুলো বলল।

খানিক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা বড় ভাই রিচার্ডকে লক্ষ্য করে চাপা গলায় বলল–সুখেই আছ। তোমাদের মতলবটা বুঝতে পেরেছি। তাই দু'জনে এঘরে এসে ঢুকেছ।

ননদের রসিকতাপূর্ণ ইঙ্গিতটার অর্থ বুঝতে দেরি হল না লুসিয়ার। সে শুকনো হাসি হেসে ঘাড় কাত করল।

বারবারা! এসব কি মজা হচ্ছে? পিসি ক্যারোলিন ধমকে উঠলেন–কি যে অসভ্যতা করিস, ভাল লাগে না।

–আমার কথাগুলো অসভ্যের মতো শোনাচ্ছে, বারবারা উত্তর দিল, বিয়ের পরে মা হওয়া মামুলি এক দুর্ঘটনা। আর এই দুর্ঘটনার শিকার হবে বলেই নারী জাতির জন্ম। এই সহজ সত্যি কথাটা কেন তুমি মেনে নিতে পারছ না, পিসিমা?

–আবার ফাজলামো! ক্যারোলিন আবার ধমকে উঠলেন। বর্তমান যুগের মেয়েরা এত নোংরা রসিকতা করতে কোথ থেকে শিখেছে, কে জানে। আপন মনে বলে চললেন পিসিমা–আমরা বাপু, তোদের মতো বয়সে এত ফাজিল হয়ে উঠতে পারিনি, কখন কার পেটে বাচ্চা আসবে তা দূর অস্ত।

এসময় রিচার্ড নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

–দিলি তো তোর দাদাকে রাগিয়ে, ক্যারোলিন আবার ধমকে উঠলেন, আহা বেচারা, পুরুষ মানুষ, নিজের বউয়ের সামনে এমন খোলমেলা আলোচনা সহ্য করতে পারে। তাই তো গোমড়া মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সত্যি বারবারা, তোর যে কবে জ্ঞান গম্যি হবে, কে জানে।

শোনো পিসিমা, বারবারা মৃদু হেসে বলতে লাগল, কিছু মনে করো না, অবশ্য মনে করলে আমার বয়ে গেল, রানী ভিক্টোরিয়ান যুগে যা করেছ, তাই আঁকড়ে ধরে বসে আছে। দুনিয়া কি সেই মান্ধাতা আমলে পড়ে আছে? এখন এগিয়ে যাবার সময়, সামনের দিকে সবাই ছুটছে–এসব খবর কি রাখ?

–মেনে নিলাম তোর কথা। তবে সেকাল-একাল নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। অতএব পছন্দ অপছন্দের দ্বন্দ্বও নেই, জেনে রাখিস তুই।

-এ নেহাতই ব্যক্তিগত ব্যাপার, পিসিমা। বারবারা হেসে উঠল–কিন্তু তোমাদের জমানায় মানুষ কি ভাবে বাবা-মা হয়, এ প্রশ্নের উত্তরে ছোট ছেলেমেয়েদের বলা হত, কোন দেবদূত বা সারস পাখি বেঁচি গাছের ঝোপে বাবা-মায়ের জন্য বাচ্চা রেখে যায়। সত্যি, তোমাদের কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হয়, তাজ্জব হতে হয়। তবে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, পিসিমা, বাস্তব না-হলেও তোমাদের ওই ব্যাখ্যা আজও শুনতে ভাল লাগে। ভারী মিষ্টি।

বারবারা, থামবি! ক্যারোলিন কৃত্রিম ধমক দিলেন। তারপর মুচকি হেসে লুসিয়াকে ইশারায় দেখিয়ে বলল–বেচারি, ওর জন্য আমার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই, কেমন আছে ও, জানার জন্য মনটা আনচান করছিল, তাই তো আবার ছুটে আসতে হল। আর এসে অব্দি তুই আমার সঙ্গে মজা করে চলেছিস। এমন করে আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলিস না, ভাল হবে না বলে রাখছি।

সত্যিই তো, লুসিয়ার কান্না ভেজা গলা। শেষ পর্যন্ত চোখের জল ধরে রাখতে পারল না। রুমাল দিয়ে চোখ মুছল। দুই মহিলাকে লক্ষ্য করে বলল ধরা গলায় এ বাড়ির প্রত্যেকে আমার সঙ্গে কত সুন্দর ব্যবহার করে। ভাগ্যিস রিচার্ডের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল, তোমার কাছে আশ্রয় পেলাম, দয়ামায়া কাকে বলে বুঝতে শিখেছি। বলতে দ্বিধা নেই, তোমাদের আশ্রয়ে এসে সামান্য ভালবাসার পরশ পেয়ে আমি কৃতার্থ হয়েছি। আমার কৃতজ্ঞতার প্রকাশ ঘটাব কি করে, বুঝতে পারছি না।

-বাছা, কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে আর লাভ নেই, অনেক দেখিয়েছ। নীচু স্বরে কথাগুলো বলতে বলতে ক্যারোলিন এগিয়ে এলেন লুসিয়ার কাছে। আদরের ছোঁয়া রাখলেন তার মাথায়-গায়ে–জানি, জীবনের প্রথম দিকটা মেয়েদের মা-মাসির স্নেহ ভালবাসায় দিন কাটে, কিন্তু তুমি ওই সময় একাকী বহু দূরে, বিদেশে দিন কাটিয়েছ। ফলে লেখাপড়া দুরে থাক, সহবত শিক্ষা কিছুই হয়নি তোমার, একথাই বলতে চাইছ তো? যাক, ওসব ভেবে চোখের জল ফেলে কাজ নেই।

লুসিয়া চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, তার দৃষ্টি আটকে আছে পিসিমার দিকে। পিসিমা তার হাত ধরলেন। সযত্নে সোফায় বসালেন। ছড়িয়ে পড়ে থাকা গদিগুলোকে নিজের

সুবিধামতো সাজিয়ে আয়েস করে পাশে বসলেন। সোনা, মুখ ভার করে থেকো না। তোমার মনের মধ্যে কি ঝড় চলছে, আমি কি বুঝতে পারছি না? যাক, তোমার ঘাড় থেকে ইটালি নামক ভূতটাকে তাড়াও দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। লক্ষ্মীটি, আর মন খারাপ করে থেকো না।

লুসিয়ার দিকে বাঁকা চোখে তাকাতে তাকাতে বারবারা ফোড়ন কাটল–ওর এখন একটু ড্রিঙ্কস হলে ভাল হয়। যে সে নয়, কড়া। তার কথায় রুক্ষতার প্রকাশ সহানুভূতি দেখানো চুলোয় দিয়ে একাল-সেকাল নিয়ে পড়ল–পিসিমা, আমাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেছ? কি হাল! একালের হয়ে সেকালের পরিবেশের মধ্যে কাটাতে হচ্ছে ড্রিঙ্কস বলতে তো ওই ডিনারের আগে হুইস্কি, নয়তো পরে ব্রান্ডি। এর বাইরে ককটেল নামে যে একটা পানীয় আছে, এ বাড়ির লোকেরা তো জানে না। আর রিচার্ডকে দেখ, ভাল করে একটা ম্যানহাটান ককটেল তৈরি করতে অক্ষম সে। সে কেবল হুইস্কিই চিনেছে। ডিনারের আগে এডওয়ার্ড রেনরকে হুইস্কি সার্ভ করতে বলবে, আর নিজেও তাই গিলবে। স্যাটনিস হুইস্কার জান? খানিকটা লুসিয়ার পেটে পড়লেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

-স্যাটনিস হুইস্কার? সেটা আবার কি? ক্যারোলিন ভুরু কুঁচকে অবাক মুখে তাকালেন–এমন বিদঘুঁটে নাম, না বাবা, জীবনে শুনিনি।

–এটা ঘরে তৈরি করা একটা পানীয়। বারবারা সবজান্তার মতো হেসে উঠল। ব্র্যান্ডি আর ক্রি ডি মেছে–দুটো সমান পরিমাণে নিয়ে মিশিয়ে দিতে হয়। এর পর দিতে হয় কিছুটা শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো। পুরো মিশ্রণটা খুব ভাল করে ঝাঁকালেই তৈরি হবে এক ককটেল,

তাকে স্যাটনিস হুইস্কার বলে, বুঝেছ? শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো না দিলে পানীয়ের ঝাঁঝ হবে না। জম্পেশ মাল তৈরি করতে হলে তাই চাই শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো। দেখবে কেমন ঝাঁঝ ও ঝাল। সত্যি, দারুণ এক ককটেল!

–থাম দিকি, বারবারা, তোর বকবকানিতে মাথা ধরে গেল। বিরক্তিতে ক্যারোলিন বলে উঠলেন–বাবার মুখে শুনেছি, শরীর সতেজ রাখার জন্য টনিক জাতীয় কিছু খেতে হয়, অ্যালকোহল মোটেও নয়। আমার বাবা........

ক্যারোলিনের কথা থামিয়ে দিয়ে বারবারা হো হো করে হেসে উঠল, বড় বড় চোখে তাকাল তোমার বাবা, মানে সিনিয়ার অ্যালগারলনের কথা বলছ? থাক, পিসিমা, তার কথা ঢাক ঢোল পিটিয়ে আর নাই-বা বললে। এ এলাকার কাকচিলও জানে, নেশা জমানোর জন্য ওনার তিনটি বোতল পরপর চাই-ই, আর আমরা জানব না!

ক্যারোলিনের মাথায় তখন রক্ত চড়ে গেছে। তবুও কি ভেবে নিজেকে সংযত করলেন। এদৃশ্য দেখে বারবারা খুশিতে ফেটে পড়ল। মুচকি হাসি দেখা দিল তার ঠোঁটে।

আর লুসিয়া? আহা বেচারি, গোমড়া মুখ, শূন্য দৃষ্টি। সে একবার ক্যারোলিনকে লক্ষ্য করল, তারপর বারবারাকে দেখল। ধীরে ধীরে মুখ খুলল, আমতা আমতা করে বলল সেই থেকে তোমরা কি বলছ বল তো? আমি তো আগা মাথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

-বাছা, তোমাকে নিয়েই তো আমার যত চিন্তা। পিসিমা আলগোছে লুসিয়ার চিবুক তুলে ধরলেন, তারপর বারবারাকে উদ্দেশ্য করে বললেন–বারবারা ওর যা অবস্থা, কিছু একটা খাইয়ে না দিলে হবে না। খানিকটা স্যালবোলাটাইল হলেও চলত। আমার কাছে এক

শিশি ছিল, কিন্তু ওই শয়তানি ঝি-টা। সকালে ঘর ঝাঁট দিতে এসে ফেলল মেঝেতে, ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

–এত চিন্তা করছ কেন তুমি? বারবারা বলে চলল–তোমার স্যালবোলাটাইল নেই তো কি হয়েছে, হাসপাতালের গুদোম ঘর আছে, যাও, খোঁজ কর, কিছু একটা পেয়ে যাবে মনে হয়।

–হাসপাতালের গুদোমঘর? আবার অবাক হতে হল ক্যারোলিনকে কি বলছিস, স্পষ্ট করে বলতো।

-আরে এডনার ধনভান্ডারের কথা বলছি, বারবারা জবাব দিল, হাতড়ে দেখ, ঠিক কিছু মিলবে।

-এতক্ষণে তোর সুবুদ্ধির দোর খুলেছে দেখছি, পিসিমা খুশি হলেন, লুসিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন–ও, তুমি তো আবার এডনাকে চেনো না। বারবারার বড় বোন এডনা। সে এখন ইন্ডিয়াতে আছে তার স্বামীর সাথে খুব ভাল মেয়ে, নিখুঁত তার কাজকর্ম। এডনা চলে যাবার তিনমাস পর তুমি এখানে এসেছ।

-সত্যি, তা যা বলেছ, নিখুঁত কাজ। পিসিমার পেছনে লাগার মতো একটা অস্ত্র বারবারার হাতে এসে গেছে, এ সুযোগ আর কি ছাড়ে?–খাঁটি মেয়ে বলেই তো ইন্ডিয়াতে যেতে না যেতেই সন্তানের মা হয়েছে–একটা নয়–দু-দুটো। ইন্ডিয়াতে বৈচিগাছের ঝোপ নেই বলেই আমার ধারণা, তবে সারস পাখি আছে। নিশ্চয়ই বাচ্চা দুটোকে কোন জাম গাছের নীচে ঘাসের বিছানায় সারাস পাখি রেখে গিয়েছিল তাই তো?

-মুখটা বন্ধ কর, বারবারা। ক্যারোলিন ধমকে উঠলন, লাগাম ছাড়া মুখ, কিছু আটকায় না। চোখ ফেরালেন লুসিয়ার দিকে হা, যে কথা বলছিলাম। ঘরে বসে সময় খরচ করা এডনার ধাতে ছিল না। সে তাই এখানকার কাউন্টি হাসপাতালের ডিসপেনসারিতে যোগ দিল। তার দৌলতে সারা টাউন হলটা হাসপাতালে পরিণত হয়েছিল। যুদ্ধ একদিন শেষ হল, এডনা কাজ ছাড়ল না। বিয়ের আগে পর্যন্ত সে কাজ চালিয়ে গেছে। এমনকি এখানকার কাউন্টি হাসপাতালের ডিসপেনসারিতেও তার ডাক পড়েছিল। ধীরে ধীরে ওর অসুখ-বিসুখ সারিয়ে তোলার একটা প্রাথমিক ধ্যানধারণার জন্ম হয়েছিল। কোন ওষুধ, কোন বড়ি, কোন রোগে লাগবে, এ জ্ঞানটা ও ইন্ডিয়াতে গিয়ে কাজে লাগাতে পারবে বলে আমার ধারণা। তারপর কি হল? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এডনা চলে গেল, কিন্তু ওর যত ওষুধের শিশি পড়ে রইল এ বাড়িতে। কিন্তু সেগুলো গেল কোথায়?

-আমি বলছি, বারবারা বলতে শুরু করল, ওগুলো একটা কালো টিনের বাক্সে ভরে তুলে রাখা হয়েছিল চিলেকোঠার ঘরে। পারিষ্কার মনে আছে আমার। ইন্ডিয়ায় যাবার আগে এডনা সেগুলো নামিয়ে নিয়ে এল। নিজেদের বাক্স প্যাটরা গোছগাছ করল। আর ওটা তুলে রাখল ওখানে। আঙুল তুলে সে বইয়ের তাকটা দেখিয়ে দিল, সেই থেকে একইভাবে পড়ে আছে, কেউ হাত দেবার প্রয়োজনও মনে করেনি। কোনটা প্রয়োজনীয়, কোনটা নয়, সব বোঝাই হয়ে আছে।

কথা শেষ করে বারবারা উঠে দাঁড়াল। চেয়ারটা টেনে নিয়ে এল বইয়ের তাকের কাছে। উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে নামিয়ে নিয়ে এল কালো টিনের বাক্সটা।

–ওষুধ আমার প্রয়োজন নেই, লুসিয়া আঁতকে উঠে বলল, আমি ভালই আছি, বিশ্বাস কর।

লুসিয়ার কথায় আমল না দিয়ে বাক্সটা নীচে রাখতে রাখতে বলল–বেশ, তোমার কথাই সই। তবে কষ্ট করে এতদিন পরে এটাকে যখন নামালাম, তখন একবার খুলে না দেখলে চলে।

টিনের বাক্সের ঢাকনা ইতিমধ্যে খুলে গেছে। বারবারা হাত ঢোকাল। দু-আঙুলের ফাঁকে একটার পর একটা শিশি তুলে ধরল। শিশির পায়ে সাঁটানো লেবেলগুলো দেখে তার চোখ ছানাবড়া। ফিসফিসিয়ে বলল–বাব্বাঃ এতে যেমন তেমন ধনভান্ডার নয়। এটা আয়োডিন..........এটা কি........... ফ্রায়ার্স বালমাস....... ক্যাস্টর অয়েল নাকি?

আবার সে বাক্সের ভেতর হাত ঢোকাল–কয়েকটা বাদামি রঙের কাঁচের টিউব। বারবারা হাসতে হাসতে বলল–এ যে মারাত্মক ওষুধ। মানুষ মারতে ওস্তাদ অ্যাস্ট্রোপিন.......মরফিন ....স্ট্রিকনিন। ক্যারোলিন পিসিমা, তুমি কোথায়? খুব সাবধান, আমার পেছনে লেগো না। তাহলেই সর্বনাশ। এই যে, স্ট্রিকনি দেখছ, কফিতে কয়েকফোঁটা মিশিয়ে দিলে আর রক্ষা নেই। বুকের যন্ত্রণায় কাটা ছাগলের মতো দাপাদাপি করবে, অভিনয় করে দেখাল সে, তারপর সব শেষ–মৃত্যু!

ভাইঝির ভেংচিকাটা কথাবার্তা শুনে ক্যারোলিনের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

নাঃ, শুধু খেটেই মরলাম, লাভ হল না কিছু। নামিয়ে রাখা শিশি আর টিউবগুলো স্বস্থানে রাখতে রাখতে বারবারা ফিসফিসিয়ে বলল–এমন কিছু নেই, যা খেয়ে লুসিয়া চাঙ্গা হতে পারে।

এমন সময় বসার ঘরের দরজা খুলে গেল। একে একে সকলে এসে ঢুকলেন–প্রথমে বাটলার ট্রেডওয়েল। তার পেছন গৃহকর্তা স্যার ক্লড অ্যামরি, পেছনে তার সেক্রেটারি এডওয়ার্ড রেনর এবং পারিবারিক অতিথি ডঃ কারোলি।

-হ্যালো, মি. রেনর বারবার তার সামনে এসে পড়ল বারবারা, শিশি আর টিউবগুলো রাখতে রাখতে বাক্সটা দেখিয়ে সে বলল–এগুলো সব বিষ! কোন কৌতূহল আছে? দেখবেন নাকি একবার?

রেনর এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। বছর তিরিশের এক সাধারণ চেহারার শান্ত গোবেচারা যুবক।

ডঃ কারোলি এবার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, গায় তামাটে বর্ণ, ইভনিং স্যুটটা ভালই মানিয়েছে তাকে। বারবারার দিকে একটু ঝুঁকে জানতে চাইলেন–এগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করছেন কেন, মিস অ্যামরি?

তখনও দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন স্যার ক্লড, ভৃত্যের উদ্দেশ্যে বললেন ট্রেডওয়েল, একটু আগে তোমাকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলাম, সেটা করেছ?

–আজ্ঞে, করেছি স্যার ক্লড। কথা শেষ করে ট্রেডওয়েল সেখান থেকে প্রস্থান করল।

ডঃ কারোলির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্যার ক্লড বললেন–কিছু মনে করবেন না, আমায় এবার যেতে হবে, দরকারি কাজ আছে, কয়েকখানা জরুরি চিঠি লিখে আজ রাতেই পাঠাতে হবে।

কথা শেষ করে স্যার ক্লড সেক্রেটারি রেনরকে সঙ্গে নিয়ে লাগোয়া স্টাডিতে ঢুকে পড়লেন। দরজার কপাট বন্ধ হওয়ার শব্দ হল। বারবারার হাতে ধরা ওষুধের টিউবটা ছিটকে পড়ল কারণটা কেউ জানে না।

ডঃ ক্যারোলির সন্ধানী দৃষ্টি

০৪.

ডঃ কারোলির সন্ধানী দৃষ্টি চরকির মতো ঘরময় ঘুরছে। এগিয়ে এসে মেঝের ওপর পড়ে থাকা ওষুধের টিউবটা দ্রুত তুলে নিলেন। বারবারার হাতে তুলে দিতে ঝুঁকে পড়তেই দেখতে পেলেন টিউবের গায়ে লেবেল সাঁটা নামটার দিকে সাংঘাতিক ব্যাপার! আঁতকে উঠলেন কারোলি–মরফিন! টেবিলের ওপর পড়ে থাকা আর একটা টিউব তুলে নিলেন, চক্ষু ছানাবড়া তার স্টিকনিন! মারাত্মক বিষাক্ত ওষুধ।

বারবারার সামনে টিনের বাক্সটা তখনও খোলা পড়ে আছে। ওটার ভেতরটা ঘেঁটে দেখতে দেখতে ডঃ কারোলি বারবারাকে লক্ষ্য করে বললেন–এসব মারণাত্মক বিষের টিউব আপনি পেলেন কোত্থেকে, মিস অ্যামরি?

–গত মহাযুদ্ধের ছাইপাশ, মশাই। বারবারার গলায় বিরক্তি ফুটে উঠল।

পিসি ক্যারোলিন এতক্ষণে একটু ধাতস্থ হয়েছেন, কিন্তু তখনও ভয় রয়ে গেছে মনে। বললেন ডাক্তার, সত্যি করে বলুন তো, এগুলি মারাত্মক বিষ কিনা? পায়ে পায়ে বারবারা ও কারোলির সামনে এসে দাঁড়ালেন–আসলে বলছিলাম কি, এগুলো বছরের পর বছর ধরে বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে আছে, এর বিষক্ষমতা কি আগের মতোই আছে? তা হতে পারে না। এখন এগুলো মামুলি জিনিস হয়ে গেছে। পেটে গেলে প্রাণ সংশয়ের ভয় নেই, তাই না?

-না, ম্যাডাম, ভুল বললেন, ক্যারোলিনের দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাক্তার বলতে থাকেন–ওগুলোর বিষক্রিয়া একটু কমে যায়নি। বারোজন কি তার বেশি তাগড়াই চেহারার মানুষের ইহলীলা সাঙ্গ করে দেবার ক্ষমতা রাখে।

টিনের বাক্স থেকে একটা টিউব তুলে ধরলেন, মনে করুন এটা, লেবেলে চোখ বুলিয়ে নিলেন চটপট–হা, স্ট্রিকনিন হাইড্রোক্লোরাইড, ওয়ান মিক্সটিস্থ অফ এ গ্রেট। এর সাত আটটা বড়ি কোন সুস্থ মানুষের পেটে ঢুকে গেলে দেখতে হবে না। বিষের জ্বালায় হৃৎপিন্ড যন্ত্রণায় লাফালাফি করবে, অসহ্য যন্ত্রণা, একসময় সব থেমে যাবে–ব্যাস, কেল্লাফতে।

আর একটা টিউবের লেবেলের লেখা পড়ে, ডঃ কারোলি বললেন–এটা আট্রোপিন সালফে, যন্ত্রণা দিয়ে দগ্ধে দগ্ধে মারে।

টেবিলের ওপর রাখা টিউবগুলো বাক্সের মধ্যে আগের জায়গায় বসিয়ে অন্য আর একটা টিউব তুলে নিলেন কারোলি–হিস্কোসিন হাইড্রোব্রোমাইড, ওয়ান হান্ড্রেড অফ এ গ্রেন। বড়িগুলো দেখতে খুবই ছোট, কিন্তু এর আদ্ধেকখানাতেই কম্ম সাবাড়। যার পেটে যাবে, সে ঘুমের জগতে পৌঁছে যাবে, জীবনে সে আর জেগে উঠবে না। তবে হ্যাঁ, কোনরকম মহাসুখে মরতে পারা যায়।

এক চিলতে কুটিল হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। তিনি ওষুধের টিউবটা লুসিয়ার দিকে এগিয়ে দিলেন।

টিউবটা নেবার জন্য লুসিয়া হাত বাড়াল, কারোলির দিকে তাকাল, কেউ বুঝি তাকে সম্মোহন করছে, এমন ভঙ্গিতে চাপাসুরে বলল, ...গভীর ঘুমের মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যু, যে ঘুম জীবনে আর ভাঙবে না......, আর কোন শব্দ তার মুখ থেকে বেরোল না।

ডঃ কারোলি লুসিয়াকে টিউবটা না দিয়ে এগিয়ে এলেন ক্যারোলিন অ্যামরির দিকে।

এমন সময় লাইব্রেরি ঘরের দরজা ঠেলে রিচার্ড ঢুকল, পেছনে বাটলার, তার হাতে কফির জগ, ধোঁয়া উঠছে। আর আছে কয়েকটা কাপ-ডিশ।

ডঃ কারোলিকে দেখে রিচার্ড নিঃশব্দে গোমড়া মুখে ডেস্কের পাশে টুলে গিয়ে বসে পড়ল।

কফি টেবিলের মাঝখানে সব কিছু রেখে ট্রেডওয়েল নিজের কাজে চলে গেল। গরম কফি কাপে ঢালার জন্য লুসিয়া সোফা ছেড়ে এগিয়ে এল।

এই সময় বারবারা এসে দাঁড়াল তার পাশে। দুটো খালি কাপ কফিতে পূর্ণ করল। একটা কাপ রিচার্ডকে দিল, অন্যটি নিজের তফাতে সরিয়ে রাখল।

এদিকে ডঃ কারোলি নিজের কাজে ব্যস্ত। কালো টিনের বাক্সে সবকটি ওষুধের শিশি সাজিয়ে রাখলেন, ঠিক আগের মতো। তারপর ঢাকনা বন্ধ করে সেন্টার টেবিলে তুলে দিলেন।

–হরেকরকম বিষ, আর তাদের বিষক্রিয়ার গল্প শুনে আমার বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে গেছে, জানেন, ডাক্তার। ক্যারোলিন হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে, রক্ত জল হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, বিষবিদ্যা সম্পর্কে আপনার এত জ্ঞান দেখে অবাক হয়েছি, আপনি একজন ইটালিয়ান হয়ে এত সব খবর কোথা থেকে পেলেন?

সামান্য হেসে ডঃ কারোলি বললেন–মাফ করবেন, ম্যাডাম। আপনার কথা আমি জানতে পারলাম না। বিষের ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞান ইটালিয়ানদের থেকে ইংরেজদের বেশি। তাছাড়া যে কোন বিষ মেয়েদের কাছে এক অস্ত্র, যে অস্ত্রের ব্যবহার পুরুষের কোনদিন জানা ছিল না। তাই বিষের ক্ষমতা সম্পর্কে মেয়েদেরই বেশি জ্ঞান থাকা অস্বাভাবিক নয়।

ডঃ কারোলি চুপ করলেন, কি যেন ভাবলেন। তারপর প্রায় লাফিয়ে উঠলেন........ আপনি কোন ধাঁচে কথাটা বললেন, তা আগে আমার বোঝা উচিত ছিল। সরি। ম্যাডাম বর্গিয়া, ইটালির ইতিহাস ফাঁকে মারাত্মক বিষ প্রয়োগকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছে, কুখ্যাত ঘৃণিত এই মহিলা সহজ অথচ মারাত্মক অস্ত্রের সাহায্যে একের পর এক শত্রুদের বিনাশ ঘটাতেন। আপনি নিশ্চয়ই তার কথাই এতক্ষণ ভাবছিলেন। কি ঠিক বলেছি?

-হ্যাঁ, লুক্রেজিয়া বর্গিয়া, কারোলির কথার জের টেনে ক্যারোলিন বলতে থাকেন আপনার ধারণা সম্পূর্ণ নির্ভুল, ডাক্তার। মহিলা ছিলেন সুন্দরী, যেন শিল্পীর পটে আঁকা ছবি, যেমন আকর্ষণীয় চেহারা, তেমনই মুখশ্রী। হালকা হলুদ বর্ণ, ঘনকালো চুল, অথচ তার স্বভাব

ছিল রক্তপিপাসু ডাইনির মতো, সেই বর্গিয়ার কথাই আমি তখন ভাবছিলাম, আমাদের লুসিয়ার সঙ্গে তার কোন ফারাক নেই।

চিনির বাটি নিয়ে ডঃ কারোলি এগিয়ে যেতে গিয়ে বাধা পেলেন, লক্ষ্য করলেন ক্যারোলিন প্রবলভাবে হাত নাড়ছেন, অর্থাৎ তিনি চিনি ছাড়া কফি খাবেন। অতএব চিনির বাটি যথাস্থানে তিনি রেখে দিলেন। কফির কাপ নামিয়ে রেখে রিচার্ড অ্যামারি ম্যাগাজিনের পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

–ওফ! মনে পড়ে যাচ্ছে ছেলেবেলার দিনগুলোর কথা। ঘুমের ঘোরে কি সাংঘাতিক হাড় হিম করা দুঃস্বপ্ন। ভাবলে আজও গায়ে কাঁটা দেয়। ক্যারোলিন শিউরে উঠে বলতে লাগলেন–মা-কাকিমা জেঠিমা। একসঙ্গে বসে আড্ডা দিত। গল্প করত আর বড় বড় মদের গ্লাসে চুমুক দিত। ওরা রসিয়ে রসিয়ে ওই ডাইনি বর্গিয়ার নৃশংস প্রেমকাহিনীর ঘটনা শোনাত–কোন রাজকুমারকে কোন বিষ খাইয়ে খতম করেছে, এইসব আর কি। এসব শুনে শুনে রাতের বেলা ঘুমের ঘোরে আমাকে ওই রাক্ষুসী পেয়ে বসত–সুন্দরী রাক্ষসী ভুলিয়ে ভালিয়ে খানিকটা বিষ মদ আমার মুখে ঢেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেছে বিষক্রিয়া, আমার গলা-বুক জ্বলছে, যন্ত্রণায় ছটফট করছি, কি দুঃসহ সাংঘাতিক ব্যাপার, কিভাবে যে বোঝাই।

ক্যারোলিন এবার চুপ করলেন। বড় বড় নিশ্বাস নিলেন। লুসিয়ার দিকে তাকিয়ে সরাসরি বললেন–লুসিয়া, আমি বাছা কারো মন রাখা কথা বলতে পারি না। তোমার সেই সুন্দর মুখখানার দিকে তাকালেই আমার ডাইনি বর্গিয়ার কথা মনে পড়ে যায়।

-তাই নাকি! ডঃ কারোলি এগিয়ে এলেন লুসিয়ার সামনে শ্রীমতী লুক্রেজিয়া বর্গিয়া, একটু নীচু হলেন, বললেন–ক্ষতি না করে আমাদের মঙ্গল করুন।

এহেন রসিকতাপূর্ণ কথা লুসিয়ার মনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না, বরং শুনতে পায়নি এমন ভাব দেখাল।

কারোলি লুসিয়ার কাছ থেকে সরে এলেন সেন্টার টেবিলের কাছে, শূন্য এঁটো কফি কাপ রাখলেন।

বারবারা এতক্ষণ চুপচাপ সব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করছিল। ঘরময় বিরাজ করছে গুমোট হাওয়া, কেমন গম্ভীর-গম্ভীর ভাব, যা তার মোটেও পছন্দ নয়। পরিবেশ হালকা করার জন্য যে পুরনো গানের রেকর্ড বের করে গ্রামোফোনে লাগিয়ে ছিল। মুহূর্তের মধ্যে হালকা নাচের বাজনার আওয়াজ ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

ক্যারোলিন প্রায় ছুটে এলেন কিরে বারবারা, রেকর্ডের অভাব নাকি? হাত বাড়িয়ে রেকর্ডটা থামনোর চেষ্টা করলেন–আহা, বলিহারি, যাই, অমন বাজনার সঙ্গে কেমন বিশ্রী কথা! এসব কোন ভদ্রঘরের মেয়েরা শোনে না। ভাল রেকর্ড বের কর। দাঁড়া, আমি দেখছি। একটা রেকর্ড বের করে আবার ক্যারোলিন বললেন–এই নে, জন ম্যাক করম্যাক, লাগিয়ে দে। এটাও ভাল, হ্যাঁন্ডেলের লাগো.........

-তুমি কি গো পিসিমা! বারবারা নাক কুঁচকে বলতে লাগল, তোমার পছন্দ দেখে অবাক হয়ে যাই। শেষ পর্যন্ত হ্যাঁন্ডেলের লাগো। যত্তসব পুরনো বস্তাপচা বাজনা। না না, তোমাকে দিয়ে হবে না বুঝতে পারছি। তুমি সরো! কোথায় গেলেন ডঃ কারোলি? হ্যাঁ,

ওই তো। ডঃ কারোলি, এদিকে আসুন তো, আমাকে একটু সাহায্য করুন, ধ্রুপদী রেকর্ড খুঁজছি। দেখুন তো পান কিনা।

তিনজনে মিলে ভাল রেকর্ড পছন্দ করার কাজে লেগে পড়লেন। রিচার্ড অ্যামরি, একবার চোখ তুলে সেদিকে তাকালেন, পরক্ষণে ম্যাগাজিনের পাতায় মন দিল।

ঘরের সবাই যখন যে যার কাজে ব্যস্ত, লুসিয়া এই সময় আপনমনে পা টিপে টিপে এসে দাঁড়াল সেন্টার টেবিলের সামনে। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল, এবার তার নজর আটকে গেল কালো টিনের বাক্সটার দিকে। আবার সে চারদিকটা সতর্ক দৃষ্টিতে জরিপ করল, না, কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না। সে বাক্সের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা ওষুধের টিউব তুলে নিল। কি লেখা আছে লেবেলে?–হিস্কোসিন হাইড্রোব্রোমাইড একেবারে মরণ বিষ। সে সন্তর্পণে টিউবটা উলটে দিল হাতের চেটোতে, প্রায় সবগুলো বড়ি তার মুঠোবন্দী তখন।

ঠিক এইসময় স্টাডির দরজার কপাট খুলে বাইরে উঁকি দিল একটা মুখ–এডওয়ার্ড রেনর, স্যার ক্লড অ্যামরির সচিব। লুসিয়া টের পেল না। সে অন্য হাতে টিউবটা বাক্সের মধ্যে রেখে পা টিপে টিপে চলে এল সেন্টার টেবিলের কাছে, এখানেই তখনও পড়ে আছে গরম কফি ভরতি জগ আর কাপ-ডিশ। রেনর কিন্তু লক্ষ্য রেখেছে, লুসিয়াকে।

কয়েক মুহূর্ত এইভাবে কেটে গেল। স্টাডির ঘর থেকে গৃহকর্তার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সচিবের বুঝতে দেরি হল না যে, তার স্যার কি চাইছেন? ঘরের ভেতর দিকে মুখ সরিয়ে বলল–হ্যাঁ, যাচ্ছি স্যার ক্লড, আপনার কফি নিয়ে এখুনি আসছি।

–আর মার্শালকে যে কফি পাঠানোর কথা ছিল..........

ততক্ষণে রেনর স্টাডির দোরগোড়া থেকে কিছুটা ভেতের ঢুকে পড়েছে।

আবার স্যার ক্লডের হাঁক ডাক শোনা গেল–বলি, সেগুলো কোথায় গেল.......?

–আজ বিকেলের ডাকে সে চিঠি পাঠানো হয়েছে, স্যার ক্লড। রেনর জবাব দিল।

–কিন্তু রেনর, আমি তোমাকে বললাম এক.......... বসার ঘর থেকে ভেসে আসা বাজনা শুনে সচিব সেদিকে পা বাড়াতে গিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হল–আরে, ওদিকে যাচ্ছ কোথায়? স্যার ক্লডের গম্ভীর গলা, হাজারটা কাজ পড়ে আছে। এস, চটপট হাত লাগাও।

–দুঃখিত, স্যার, ক্ষমা চাইছি–রেনর আর না এগিয়ে স্টাডির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

***

স্যার ক্লডের রাসভারী গলা–লুসিয়া চমকে উঠল, কিন্তু খানিক আগে যে এডওয়ার্ড রেনর তার ওপর নজর রাখছিল, তা ছিল তার অজানা। সে লক্ষ্মী মায়ের মতো রিচার্ডকে আড়াল করে সেন্টার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। সযত্নে নিয়ে আসা মারাত্মক বিষাক্ত বড়িগুলো এক কাপ কফির মধ্যে ফেলে দিল। চুপচাপ এসে বসল সোফার ওপর।

হালকা ফক্সট্রট নাচের সমবেত বাজনার আওয়াজে ঘরের মধ্যে বসন্ত বাতাস বয়ে গেল বুঝি। ম্যাগাজিন ফেলে রেখে রিচার্ড কাপের সবটুকু কফি গলাধঃকরণ করে উঠে

দাঁড়াল। লুসিয়াকে একবার দেখে নিল। বিড়ালের মতো পা ফেলে লুসিয়ার সামনে এসে দাঁড়াল। মুখটা নামিয়ে নিয়ে এল স্ত্রীর কানের পাশে।

-লুসিয়া, অনেক ভেবেছি জান, রিচার্ডের ফিসফিসানি গলা–তোমার কথাই ঠিক, এখানে, এই পরিবেশে পড়ে থাকলে মৃত্যু অনিবার্য। তাই পালানোর একটা উপায় বের করতে হবে। তবে তোমাকে এখানে ফেলে রেখে যাব না, জেনো।

-সত্যি, পালাবে? লুসিয়ার কণ্ঠে কান্নার সুর, রিচার্ড, সত্যিই আমরা এবাড়ি ছেড়ে পালাব? কিন্তু চোখের জল মুছে লুসিয়া বলল, কিন্তু টাকা কোথা থেকে পাবে? তুমিই বলেছিলে পালিয়ে যেতে হলে অনেক টাকা দরকার, কে দেবে?

ভেব না, লুসিয়া। টাকা জোগাড় করার অনেক রাস্তা খোলা আছে।

–বুঝলাম না? লুসিয়া এবার সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছে।

–কি বলতে চাইছ, স্পষ্ট করে বল।

-বলতে চাইছি যে, তোমাকে কেন্দ্র করেই আমার প্রেম ভালবাসা, আমার চিন্তা ভাবনা। যে পুরুষ, তার বউকে এতটাই ভালবাসে যে, যে কোন কাজ হাসতে হাসতে করতে পারে।

-ওসব ছেলে ভুলানো কথা তুলে রাখ। লুসিয়া বলে চলল–বরং আমার ধারণা, আমাকে তুমি এখনও বিশ্বাস করতে পার না, টাকা দিয়ে আমার ভালবাসা কিনতে চাও।

লুসিয়া কথা শেষ করতে পারল না, কান্নায় ভেঙে পড়ল। এমন সময় স্টাডির দরজার পাল্লা খুলে গেল। এডওয়ার্ড সোজা বেরিয়ে এসে কফি টেবিলের সামনে জলে গেল। গরম কফিতে কাপগুলো পূর্ণ। একটা কাপ তুলে নিল।

ইতিমধ্যে লুসিয়া রিচার্ডের কাছ থেকে সরে এসেছে, সে এখন গদিতে উপবিষ্ট। রিচার্ড নিজের জায়গাতে নেই। সে চলে এসছে ঘরের এক কোণে রাখা ফায়ার প্লেসের কাছাকাছি। ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে, তার দৃষ্টি সেদিকেই নিবদ্ধ।

রেকর্ডে তখনও ফক্সট্রটের বাজনা বাজছে, বারবারা উত্তেজিত, নৃত্য করার জন্য মন ছটফট করছে। কিন্তু সঙ্গী কোথায়? সে চারপাশে তাকাল, এসে দাঁড়াল ঘরের ঠিক মাঝখানে ওই তো রিচার্ড। ওকে ডাকবে? না বাবা, কাজ নেই। যেমন গোমড়া মুখে কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। তাহলে?

কফি টেবিলের কাছে রেনরকে দেখে বারবারা খুশি হল। হাঁক দিল–মি.রেনর, এমন বাজনার সঙ্গে একটু না নাচলে কি ভাল লাগে? আসুন, আমরা নাচি।

-অবশ্যই, অবশ্যই। রেনরের ঠোঁটে হাসির রেখা, ফক্সট্রটের বাজনা শুনে ও ঘরে বসে থাকতে পারল না, তাই তো........ ম্যাডাম, একটু অপেক্ষা করুন, প্লিজ, স্যার ক্লডকে কফিটা দিয়ে এখুনি আসছি।

মি. রেনের, এডওয়ার্ডের কথা শুনে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লুসিয়া–ওটা রেখে দিন, স্যার ক্লডের কাপ ওটা নয়, ওরটা এখানে আছে। লুসিয়া কথা শেষ করে অন্য একটি কফির কাপ রেনরের হাতে তুলে দিয়ে আগেরটা ফিরিয়ে নিল।

যান, মি. রেনর, এটা স্যার ক্লডকে দিয়ে আসুন। রেনরের হাত থেকে ফিরিয়ে নেওয়া ফকির কাপটা ট্রে-তে রেখে দিল, আপন মনে হেসে উঠল। ফিরে এল আগের জায়গায়, সোফার এক ধারে।

লুসিয়াকে আড়াল করে রেনর নিজের পকেট থেকে ওষুধের শিশি বের করে কয়েকটা বড়ি কফির সাথে মিশিয়ে দিল। এগিয়ে গেল স্টাডির দিকে।

বারবারার মনে তখন খুশির জোয়ার। সে পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল–মি. রেনর, আমাকে যদি নাচের সঙ্গী করতে চান, চটপট আসুন। আমার আবার দেরি সহ্য হয় না। ডঃ কারোলিকে তাহলে দলে টেনে নেব। উনি আবার লুসিয়ার সঙ্গে নাচবেন বলে উদগ্রীব, বুঝতে পারছি।

-আহা বেচারি, রিচার্ড বলতে বলতে এগিয়ে এল, এত ডাকাডাকি করছে, একটু ওর সঙ্গে নাচো রেনর, শেষ অব্দি সবাইকেই নাচতে হয়। কাজটা আমায় দাও, বাবাকে দিয়ে আসছি।

কথা শেষ করে রিচার্ড রেনরের হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে নিল কফির কাপ। স্টাডির দরজার দিকে পা বাড়াল, থমকে দাঁড়াল, সকলকে পর্যবেক্ষণ করল, তারপর লাগোয়া দরজার পাল্লা ঠেলে ভেতরে অদৃশ্য হল।

বাজনার তালে তালে হাতে হাত রেখে বারবারা আর রেনর নাচতে শুরু করল। একপিঠের বাজনা শেষ। বারবারা উল্টোপিঠে ঘুরিয়ে দিল। আবার শুরু হল ফক্সট্রট নাচ।

লুসিয়ার শুকনো মুখ ডঃ কারোলিকে খুশি করল। তিনি চারপাশে তাকালেন, পরক্ষণে তার ঠোঁটে ফুটে উঠল রহস্যময় হাসি। তিনি পায়ে পায়ে চলে এলেন। সোফার ধারে, লুসিয়ার গা ঘেঁষে।

-লুসিয়া, মিস ক্যারোলিন অ্যামরিকে অশেষ ধন্যবাদ। ডঃ কারোলির চাপা গলা–উনি ছিলেন বলেই এই উইকএন্ডে তোমার কাছাকাছি আসার সুযোগ হল আমার। তাই কিনা বল।

-হ্যাঁ, মহিলার দয়ার শরীর, এমনটি আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি, লুসিয়ার কথাবলার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, ডঃ কারোলির এই কাছে আসা, সে সহ্য করতে পারছে না।

আশ্চর্য তোমাদের এই বাড়ি, খুঁটিয়ে, খুঁটিয়ে দেখতে হয়। লুসিয়ার মনোভাব আন্দাজ করে ডাক্তার সোফার অন্য পাশে এসে দাঁড়ালেন–বাড়ির ভেতরে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকালে সেকেলে শিল্প রীতির ছাপ ঝরে পড়ে। তুমি জানো না, ভিক্টোরিয়ান যুগের শিল্প ও ভাস্কর্য সম্পর্কে সামান্য হলেও জ্ঞান আছে, পড়াশোনা করেছি। সম্পূর্ণ বাড়িটা ঘুরে ঘুরে নিখুঁত ভাবে দেখতে ইচ্ছে করছে। তুমি আমায় সাহায্য করবে তো?

–আমি? এ বাড়িতে সদ্য এসেছি, কিছুই জানি না। পিসিমা, এ বাড়ির নাড়ি-নক্ষত্র জানেন।

স্টাডির দরজা আবার খুলে গেল। বেরিয়ে এল রিচার্ড। দেখল লুসিয়া আর ডঃ কারোলি ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলছে। সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না করে সে মাঝখানের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। দেখল ওষুধের শিশি আর টিউবগুলো তখনও পড়ে আছে। সেগুলো বাক্সের মধ্যে সাজিয়ে রাখার কাজে ব্যাপৃত হল।

ডঃ কারোলি একফাঁকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলেন ঘরময় বারবারা আর রেনর নাচে মশগুল রিচার্ড ওষুধের বাক্স সাজাতে ব্যস্ত। আর পিসি ক্যারোলিন ঘুমে ঢুলছেন। অর্থাৎ তিনি উপস্থিত সকলের নজরের বাইরে উপযুক্ত সময়। কাজের কথায় আসা যাক।

তিনি লুসিয়ার পাশে বসে পড়লেন তোমায় যা করতে বলেছিলাম, তা করেছ নিশ্চয়ই। চাপা অথচ ব্যস্ত কণ্ঠস্বর।

–আপনি সত্যিই নিষ্ঠুর। লুসিয়ার ফিসফিসানি কণ্ঠস্বর।

-বাজে কথা ছাড়। ডঃ কারোলি সামান্য ধমকে উঠলেন, যেটা করতে বলেছিলাম, তা করেছ কিনা বল?

লুসিয়া ভয় পেয়েছে। অস্ফুটে কয়েকটি শব্দ বলতে বলতে ছুটে এল বসার ঘরের দরজার কাছে লোকটাকে সে মোটেও সহ্য করতে পারছে না। সে দরজার হাতল ঘোরালো। দরজা খুলল না। আবার চেষ্টা করল, বারবার–তবুও ব্যর্থ হল।

হতাশা ভরা চাউনিতে লুসিয়া পেছন ফিরে তাকাল। উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্য চেঁচিয়ে বলল–দেখুন না, দরজাটা কিছুতেই খুলতে পারছি না।

–কেন, কি হল? নাচতে নাচতে বারবারা জানতে চাইল।

কি জানি, দরজাটা খুলছে না। লুসিয়ার গলা থেকে আর্তনাদ ভেসে এল।

নাচ থেমে গেল, বারবারা ছুটে এল, পেছনে রেনর। দুজনে চেষ্টা করল, কিন্তু সব ব্যর্থ। লুসিয়া বোকার মতো ভীত চকিত চিত্তে দাঁড়িয়ে আছে।

বাজনাটা বোধহয় শেষ হয়ে এসেছে, রিচার্ড এগিয়ে গিয়ে গ্রামোফোনের সাউন্ডবক্স বন্ধ করে দিল। দ্রুত পায়ে ছুটে এল দরজার পাশে, হাতল ধরে ঘোরালো এপাশ-ওপাশ। না, সে বেচারীকে হাল ছেড়ে দিতে হল। ডঃ কারোলি ততক্ষণে বইয়ের শেলফের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আর মিস ক্যারোলিন অ্যামরি? আচমকা চেঁচামেচিতে তার তন্দ্রা কেটে গেল, চোখ খুললেন, ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলেন।

ইতিমধ্যে স্যার ক্লড তার স্টাডি থেকে বেরিয়ে এসেছেন, সকলের পেছনে দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন আর কফির কাপে সুখটান দিচ্ছেন। কেউ তার উপস্থিতি টের পেল না।

এবার বীরদর্পে এগিয়ে এল এডওয়ার্ড রেনর। দরজার হাতল ঘোরাল–আশ্চর্য, তালাটা বোধ হয় কোনভাবে এঁটে গেছে, তাই হয়তো.....

পেছন থেকে স্যার ক্লড অ্যামরির গম্ভীর গলা ভেসে এল–রেনর, তোমার ধারণা ভুল। সেক্রেটারির দিকে তাকালেন, তালা ঠিকই আছে, বাইরে থেকে ওটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মানে? ক্যারোলিন চমকে উঠলেন, কিছু বলার চেষ্টা করলেন। ভাই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন–আমিই বলেছি, এ এমনই তালা, ভেতর থেকে হাজার চেষ্টা করলেও খুলবে না।

স্যার ক্লড এসে দাঁড়ালেন কফি টেবিলের সামনে। সুগার পট থেকে কয়েক চামচ চিনি নিয়ে কাপের কফিতে মিশিয়ে দিলেন। সবাইকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললেন–তোমাদের সাথে কিছু কথা আছে, তাই স্টাডি থেকে, বেরিয়ে এলাম। ও হ্যাঁ, রিচার্ড, স্যার ক্লড ছেলের দিকে তাকিয়ে হুকুম দিলেন–ঘণ্টা বাজাও, ট্রেডওয়েলকে ডাকো, গ্যারাজে টেলিফোন করতে বলেছিলাম, কি করল দেখি।

রিচার্ড বাবার কথা শুনে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কি মনে করে মুখ টিপে এগিয়ে গেল ফায়ার প্লেসের দেওয়ালের দিকে। এখানেই ঘণ্টার বোতাম সাঁটা আছে।

দরজার সামনে তখনও কৌতূহলী মুখে সকলে দাঁড়িয়ে আছে। স্যার ক্লড বললেন কি হল, ওভাবে সবাই দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসো। আমার সব কথা তোমরা শোন।

ধীর পায়ে চিন্তিত মনে সকলে যে যার আসনে বসে পড়ল। টুলে বসলেন ডঃ কারোলি। রিচার্ড এগিয়ে এসে দাঁড়াল। রেনর আর লুসিয়া ফায়ারপ্লেসের কাছাকাছি দুটো চেয়ার দখল করল। সোফায় দুটো গদিতে হেলান দিয়ে পাশাপাশি বসেছে পিসি-ভাইঝি।

এই সময় বাইরে থেকে টুক করে দরজার কপাট খুলে গেল। দেখা গেল ট্রেড ওয়েলকে। সে তার মনিবের কাছে জানতে চাইল, তাকে কেন ডাকা হয়েছে।

–ট্রেডওয়েল, স্যার ক্লড জানতে চাইলেন, ডিনার টেবিলে তোমাকে একটা টেলিফোন নম্বর দিয়ে কি করতে বলেছিলাম মনে আছে?

-হ্যাঁ স্যার, মনে আছে। বাটলার জানাল, যা বলতে বলেছিলেন ওই নম্বরে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছি অনেকক্ষণ আগে।

-স্টেশনে ওরা গাড়ি পাঠাবে তো?

–হ্যাঁ, স্যার, ট্রেন স্টেশনে ঢোকার আগেই ওদের গাড়ি পৌঁছে যাবে।

–বেশ, এবার তুমি যেতে পারো। স্যার ক্লড হুকুমের সুরে বললেন–বাইরে থেকে তালাটা এঁটে দিয়ে যেও।

–আচ্ছা, ট্রেডওয়েল দরজার বাইরে চলে গেল। পরমুহূর্তেই চাবি আঁটার মৃদু শব্দ।

–ক্লড, ক্যারোলিন আর উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছেন মা–কি ব্যাপার বল তো? ট্রেডওয়েল, দরজায় বাইরে থেকে তালা চাবি লাগিয়ে দিল কেন? কি চায় ও?

ট্রেডওয়েল, আমার হুকুম পালন করছে মাত্র। স্যার ক্লডের কঠিন কণ্ঠস্বর।

–কিন্তু, রিচার্ড নিস্পৃহ গলায় প্রশ্ন করল, এসবের মানে কি, এ প্রশ্ন তো আমরা করতেই পারি, তাই কিনা?

–নিশ্চয়ই, প্রশ্নের উত্তর পাবে, শান্ত হও। স্যার ক্লড বলে চললেন, প্রথমেই বলি, তোমরা সকলেই জান, আমার স্টাডিতে ঢুকতে হলে দুটো দরজা পার হতে হয়। লাইব্রেরির গায়ে ওই ছোটো দুটো দরজা, চোখের ইঙ্গিতে সেদিকটা দেখালেন, আবার বলতে শুরু করলেন, ওই দুটো কিন্তু বাইরে থেকে বন্ধ। আমার স্টাডি থেকে কাউকে বাইরে বেরতে হলে এই বসার ঘরের দরজা দিয়েই যেতে হবে। বসার ঘরের ওই ফ্রেঞ্চ জানলা দুটোও একইভাবে আটকান।

স্যার ক্লড সরাসরি এবার তাকালেন পারিবারিক অতিথি ডঃ কারোলির দিকে যে তালার সাহায্যে এ ঘরের দরজা জানলা এঁটে দেওয়া হয়েছে, তা আমিই বিশেষভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তৈরি করেছি, এ সংসারের সকলেই তা জ্ঞাত। কিন্তু তালা খোলার ব্যাপারে কারো কোন ধারণা নেই। এখনও নটা বাজেনি। দশ মিনিট বাকি আছে। অপেক্ষা কর, কলে আটকে পড়া ইঁদুর ধরার লোক এল বলে।

তার মানে? আমি তো এসব কথার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারছি না, রিচার্ডের কথায় অধৈর্যের আভাস লোকটা কে?

–একজন গোয়েন্দা। স্যার ক্লড কঠিন কণ্ঠে বলে উঠলেন।

.

০৫.

–গোয়েন্দা! নাম কি? রিচার্ড এবার সত্যিই খেপে গেছে, এখানে তার কাজ কি?

–গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারো বেলজিয়াম পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা ছিলেন, অবসর নিয়েছেন। গম্ভীর গলায় স্যার ক্লড অ্যামরি বলে চললেন, লন্ডনে বাস, বেসরকারি গোয়েন্দা হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি আছে, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সকলের কাছে খুব পরিচিত নাম। কিছুদিন আগে এক সমস্যায় পড়েছিলাম, তখন থেকেই পরিচয়ের সূত্রপাত্র। খানিক বাদেই ভদ্রলোক এখানে এসে পা রাখবেন।

শ্বশুরের মুখের কথা শুনে লুসিয়া আর্তনাদ করে উঠল। রিচার্ড বুঝি বোবা হয়ে গেছে, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল স্ত্রীর দিকে।

একেই বলে কপাল, শেষ পর্যন্ত গোয়েন্দা। ক্যারোলিনের গলায় আক্ষেপের সুর। বারবারাও চাপা গলায় একইরকম আক্ষেপ প্রকাশ করল। আর ডঃ কারোলি? তিনি যেন পাথর হয়ে গেছেন, অপলক চোখে স্যার ক্লডকে দেখছেন।

এডওয়ার্ড রেনর মুখ খুলল–স্যার ক্লড, সত্যি বলছি, আপনার জুড়ি মেলা ভার।

–কথাগুলো তোমাদের আগাম জানিয়ে রাখা উচিত মনে করে বললাম, কঠিন কণ্ঠে স্যার ক্লড বললেন। কফির শূন্য কাপ ছোট টেবিলে রেখে আর্মচেয়ারে ঠেস দিয়ে বসলেন–কফিটা বড্ড তেতো লাগছিল, বিস্বাদ, কেন কে জানে!

তিনি তাকালেন বোনের দিকে এ পরিবারের খুঁটিনাটি দেখার দায়িত্ব তার হাতে। ক্যারোলিন একথা শুনে বিরক্ত হলেন, ক্ষোভ জমল মনে, চোখে মুখে তার প্রকাশ ঘটে গেল।

কিন্তু ওই গোয়েন্দাকে কেন এখানে ডাকা হয়েছে, রিচার্ড গম্ভীর গলায় বলল, এ প্রশ্ন আমাদের সকলের।

–নিশ্চয়ই, জানবে বৈকি! স্যার ক্লডের ঠোঁটে কুটিল হাসির রেখা।

-হ্যাঁ, বলছি, শোনো সকলে। আমাদের প্রত্যেকের জানা আছে, বর্তমানে আমি পারমাণবিক অস্ত্রের বিষয়ে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। সম্প্রতি ওই পারমাণবিক বোমা তৈরির ফর্মুলাও আবিষ্কার করেছি। এ হল মারাত্মক ক্ষমতাশালী বিধ্বংসী বোমা, যা তোমাদের ধারণার বাইরে।

***

স্যার ক্লড থামলেন, ডঃ কারোলিকে নিরীক্ষণ করলেন। আবার বলতে শুরু করলেন, হ্যাঁ, কাজের কথায় ফিরে আসি। অ্যামারাইট’–আমার ফর্মুলায় তৈরি বোমার নাম। কয়েক মুহূর্তের বিরতি এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা যেসব পারমাণবিক বোমা বের করেছে, তার দশগুণ শক্তি ধরে আমার ফর্মুলায় তৈরি অ্যামারাইট–লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ধ্বংস করে সব ধূলিসাৎ করে দিতে পারে।

–ওফ, কি নৃশংস কাণ্ড! লুসিয়া শিউরে উঠল।

–তবুও বাস্তবকে মানতেই হবে, বাছা আমার। স্যার ক্লডের ঠোঁটে হাসি, সত্যের অন্তরালে থাকে সীমাহীন কৌতূহল, অজানাকে জানার তীব্র আকাঙ্খা।

কিন্তু এসব আমাদের বলে তোমার লাভ কি? রিচার্ড কৈফিয়তের সুরে বলল।

কারণ আছে, তাই বলছি। চাপা গম্ভীর গলায় স্যার ক্লড বলতে থাকেন, আমি হলফ করে বলতে পারি, আমার পরিবারের কেউ ওই অ্যামারাইট-এর মহামূল্যবান ফর্মুলা হাতিয়ে নেবার চেষ্টা করে চলেছে। তাই আমি গোয়েন্দা পোয়ারোর শরণাপন্ন হয়েছি। ঠিক করেছিলাম, উইক এন্ডেই অর্থাৎ আগামীকাল এখানে আসার আমন্ত্রণ জানাব। পরে ভেবে দেখলাম, তাহলে বড় দেরি হয়ে যাবে, তাই আজই তাকে চলে আসার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি। উনি দু-দিন এখানে থাকবেন। সোমবার সকালে ফিরে যাবেন লন্ডনে, আমি আমার বোমা তৈরির ফর্মুলা ওনার হাতে তুলে দেব। উনি তা পৌঁছে দেবেন প্রতিরক্ষা দপ্তরের কোনো দুদে অফিসারের কাছে।

স্যার ক্লড থামলেন, সকলের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, তাদের মনের প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করলেন। ফের বলতে শুরু করলেন–মহামূল্যবান ফর্মুলাটি লেখা ছিল মামুলি একটা কাগজে। এটা সুরক্ষিত করার জন্য খামে ভরে সিন্দুকে তুলে দিলাম। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, আজই সন্ধ্যের পরে ডিনারের আগে সেই বড় খামটা উধাও হয়েছে, সিন্দুকে নেই। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি নিশ্চিত, এই ঘরে, এই মুহূর্তে যারা আমার সামনে রয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ একজন কান্ডটা ঘটিয়েছে।

স্যার ক্লডের মুখ থেকে ছিটকে ছুটে আসা শেষ শব্দগুলো শুনে সকলে চমকে উঠল, চোখ হল চড়কগাছ। পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল তারা দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে সন্দেহের কালো ছায়া।

-ফর্মুলা চুরি হয়ে গেছে? ক্যারোলিন বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইলেন।

বন্ধ সিন্দুক থেকে ফর্মুলা উধাও? রিচার্ডও অবাক। চেঁচিয়ে বলল–এ তো অসম্ভব!

সকলেই যখন বিস্ময়াহত, তখন একজনের মধ্যে ব্যতিক্রম দেখা গেল। তিনি হলেন ডঃ কারোলি। তিনি নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন। কপালে চিন্তার ভাঁজ, বোঝা গেল তার মনের মধ্যে দুশ্চিন্তার ঝড় শুরু হয়েছে।

আজ সন্ধ্যার খানিক বাদে ফর্মুলাটা একটা বড় খামে পুরে আমার স্টাডির সিন্দুকে রেখে দিয়েছিলাম, তখন ঘড়িতে সাতটা বেজে কুড়ি মিনিট, এক চুলও এদিক ওদিক নয়। স্যার ক্লড গম্ভীর গলায় বলে গেলেন। তারপর আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাই, রেনর ঢুকল।

–স্যার ক্লড, আপনি আজে বাজে কিসব বলছেন? রেনর তেড়ে উঠল। চোখ দুটো জ্বলছে।

স্যার ক্লড হাতের ইঙ্গিতে তাকে থামিয়ে দিলেন–যেমনটি ঘটেছে আমি তার পুনরাবৃত্তি করছি। স্টাডিতে ঢুকে রেনর নিজের কাজে মন দিল। ঠিক এই সময় স্টাডির দরজাতে এসে পা রাখলেন ডঃ কারোলি। তাকে দেখে রেনর ঘর থেকে বেরিয়ে এল, অর্থাৎ

কারোলি তখন স্টাডিতে একা। রেনর এসে লুসিয়াকে খবরটা দিল যে, রেনর ছাড়া ওঘরে কেউ নেই।

–স্যার ক্লড আপনি কি আবোল তাবোল বলছেন! সব মিথ্যে। চেঁচিয়ে উঠে ডঃ কারোলি প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু স্যার ক্লডের হাতের ইশারায় তাকে থামতে হল।

-খানিকবাদে বসার ঘরে অর্থাৎ এখানে এসে ঢুকল আমার বোন ক্যারোলিন আর ভাইঝি বারবারা। ওদের দেখে রেনর চুপচাপ স্টাডি থেকে বেরিয়ে এল, ক্যারোলিন আর বারবারার সঙ্গে গল্পে মেতে উঠল, এরপরে ডঃ কারোলি এসে যোগ দিলেন ওদের সঙ্গে। অর্থাৎ আমার বোন আর ভাইঝি ছাড়া সকলেরই ওই সময়টুকুতে স্টাডিতে পা পড়েছে।

-জ্যেঠু, বারবারা বাঁকা চোখে একবার পিসি ক্যারোলিনের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। বলল–তুমি ভুল বলছ। তোমার সন্দেহভাজনদের তালিকায় আমার নামটাও জুড়ে দেওয়া উচিত। কারণ, তুমি হয়তো দেখোনি, তবু বলছি, একটু আগে পিসিমা আমায় বলেছিল, সেলাইয়ের বাক্সে সূঁচ খুঁজে পাচ্ছে না, নিশ্চয়ই মনের ভুলে স্টাডিতে রেখে এসেছে, আমি যেন খুঁজে সেটা নিয়ে আসি। পিসিমা, ও পিসিমা, তুমি এখন চুপ করে আছ কেন? তোমার কথাকে বিশ্বাস করেই তো আমি তো জ্যেঠুর স্টাডিতে ঢুকে ছিলাম।

বারবারা একটানা কথাগুলো বলে গেল বটে, কিন্তু ধোপে টিকল না। নিজের কথার জের টেনে স্যার ক্লড বললেন কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর রিচার্ড স্টাডিতে ঢুকল, অন্য কেউ সে সময় ঘরে ছিল না, কয়েক মিনিট সেখানে ছিল।

-বাবা, তুমি থামবে? রিচার্ডের উত্তেজিত কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল নিজের ছেলেকে চোর বদনাম দিচ্ছ? এতজনের মধ্যে আমাকেই তোমার মনে হল চোর, তাই না? ধানাই পানাই করে এটা ওটা বলে সেটাই প্রমাণ করতে চাইছ। তোমার ওই কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং ফর্মুলা নিতে আমার বয়েই গেছে।

-যাকে তুমি কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং বলছ, তার মূল্য জানা আছে তোমার? লক্ষ লক্ষ পাউন্ড, তোমার ধারণার বাইরে। ছেলের চোখে চোখ রেখে স্যার ক্লড বললেন।

-বুঝেছি, রিচার্ড পালটা জবাব দিল, এদিকে প্রচুর টাকা আমি ধার করে বসে আছি, এই কথাটাই তো তুমি সকলকে বোঝাতে চাইছ, ঠিক বলেছি তো?

–আমার কথা এখনও বাকি আছে, ছেলের দিকে দৃষ্টি সরিয়ে স্যার ক্লড বললেন রিচার্ড কয়েক মিনিট একলা ওখানে কাটানোর পর লুসিয়াকে বসার ঘরে আসতে দেখে স্টাডি থেকে বেরিয়ে পড়ল। ডিনারের ঘণ্টা পড়তে তখনও অনেক বাকি, লুসিয়া স্টাডিতে ঢুকে সিন্দুকের পাশে দাঁড়াল–আমি তার গতিবিধির ওপরে নজর রেখেছি।

-ওহ, কি হচ্ছে বল তো? রিচার্ড খুব জোর রেগে গেছে। দ্রুত পায়ে লুসিয়ার পাশে চলে এল, দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে স্ত্রীকে নিরাপত্তার বাঁধনে বন্দী করল–কি বলতে চাইছ পরিষ্কার ভাবে বল। সকলে শুনুক। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর বিরুদ্ধে তোমার মনে সন্দেহ যদি সত্যিই উঁকি দিয়ে থাকে, সাফ বলি, যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে আমরা প্রস্তুত।

পরের ঘটনা বলছি, স্যার ক্লড নিজের কথা বলে চললেন,–ডিনারে যাওয়ার আগে আমি দেখলাম, লুসিয়া আপন মনে সিন্দুকের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ওর উত্তেজনাপূর্ণ মুখ-চোখ দেখে আমার মনে হল, ওর শরীর খারাপ লাগছে। লুসিয়া নিজেও সেকথা মুখে প্রকাশ করল। আমি ওকে একটু ওয়াইন খাওয়ার পরামর্শ দিলাম। কারণ মেয়েদের শরীর নানা কারণে খারাপ হয়। খানিকটা অ্যালকোহল পেটে পড়লে শরীর চাঙ্গা হবে। আমার কথার গুরুত্ব না দিয়ে লুসিয়া বলল, ওসবের দরকার হবে না। কিছুক্ষণ পরে আপনা আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। কথা শেষ করে লুসিয়া ওখান থেকে চলে এল। আমি তখন স্টাডিতে একা। হঠাৎ মনে যেন কেমন খটকা লাগল। সিন্দুক খুললাম, দেখি বড় খাম সমেত ফর্মুলা সেখানে নেই, উধাও হয়ে গেছে।

স্যার ক্লড থামলেন। ঘরের, মধ্য তখন পিনপতন নীরবতা, গৃহকর্তা সকলের মুখের দিকে তাকালেন। কঠিন চোখে জরিপ করলেন। বুঝতে পারলেন, প্রত্যেকেই ফর্মুলা খোয়া যাওয়ার ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারছে।

-সব শুনলাম, বাবা। কিন্তু তুমি কেন আমাদের স্বামী-স্ত্রীকে দোষী ভাবছ, বুঝতে পারছি না। রিচার্ড রুক্ষ্ম গলায় জানতে চাইল.....।

-দোষী ভাবার অবশ্যই কারণ আছে নিজের চোখে আমি সব দেখেছি, উড়িয়ে দিই। কি করে, স্যার ক্লড ছেলের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকলেন, তাছাড়া ট্রেডওয়েলের কাছে খোঁজ খবর নিয়ে যেসব তথ্য পেয়েছি, সব মিলিয়ে এইরকমই দাঁড়ায়।

ক্যারোলিন এবার শাণিত তরবারির মতো আঘাত হানলেন কিন্তু ট্রেডওয়েল বা বাড়ির অন্যান্য চাকর-বাকরদের তুমি তোমার সন্দেহের বাইরে রেখেছ কেন, ক্লড? বাইরে যাদের সন্দেহ করছ, তারা তোমারই পরিবারের একজন।

-ক্যারোলিন ভেব না, যিনি এই বাড়িতে অতিথি হয়ে আছেন, যাঁর সাথে আমাদের রক্তের কোন সম্পর্ক নেই, তাকেও আমি আমার সন্দেহের তালিকাভুক্ত করেছি। ধারাল গলায় স্যার ক্লড বলতে থাকেন, আর বাড়ির দাস-দাসীদের কথা বলছ? ফর্মুলা সিন্দুকে রাখা থেকে শুরু করে তা উধাও হওয়া–এই সময়টুকুর মধ্যে ওরা কেউ স্টাডিতে ঢোকেনি, এমনকি ট্রেডওয়েলও নয়। তাই ওরা সন্দেহমুক্ত।

স্যার ক্লড একটু থামলেন, ঘরের চারদিকে তার দৃষ্টি ঘুরে বেড়াল। তারপর আবার তিনি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন আপনারা নিশ্চয়ই ঘটনাটার গুরুত্ব ও জটিলতা অনুধাবন করতে পারছেন, আশা করি নতুন করে বুঝিয়ে বলতে হবে না। যাই হোক, ফর্মুলা যে কেউ একজন হস্তগত করেছে এবং সেটা এখনও তার কাছেই আছে ওটা খাবার ঘরে পাওয়া যায়নি, কারণ ডিনার শেষ করে আমরা একে একে এঘরে চলে এলে ট্রেডওয়েল খুব ভালভাবে খুঁজেছে। তন্নতন্ন করে খুঁজেও পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ আপনাদের কারো সঙ্গেই জিনিসটা রয়েছে। তাই এখানেই সকলকে আটকে থাকতে হবে, যতক্ষণ না........

স্যার ক্লড চুপ করলেন। ঘরে নেমে এল অখণ্ড নীরবতা। হঠাৎ নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে গেল ডঃ কারোলির কণ্ঠস্বরে–স্যার ক্লড, আপনি কি করতে চাইছেন বলুন তো? কেউ আমাদের খানাতল্লাশি করছে, আর আপনি তা চোখ চেয়ে উপভোগ করবেন, তাই তো? মুখ ফুটে সেটা বলে ফেলুন।

না, একথা আমি একবারও বলিনি, আর চাইও না। স্যার ক্লড কবজিতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকালেন। বলতে শুরু করলেন দুমিনিট বাকি আছে ন'টা বাজতে। পাক্কা নটায় এরকুল পোয়ারো মার্কেট ক্লিভ স্টেশনে পৌঁছোবেন। ওঁকে আনতে গাড়ি যাবে, সে ব্যবস্থাই করা হয়েছে। নটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বড়ির সব লাইট নিভে যাবে। এক মিনিট অন্ধকার। তারপর আবার সমস্ত বাড়ি আলোতে ভরে উঠবে। আমার হুকুমে বাটলার ট্রেডওয়েল এসব কাজ করছে। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমশ আমার হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো ততক্ষণে এসে পড়বেন। এই রহস্য অনুসন্ধানের দায়িত্ব আমি তাঁর হাতেই তুলে দেব।

স্যার ক্লড একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন–এখনও সময় আছে, যে-ই ফর্মুলা হাতিয়ে নিয়ে থাকুক না কেন, অন্ধকারের মধ্যে কেউ কাকেও দেখতে পাবেন না, সকলের অগোচরে ফর্মুলাটা রেখে যান, তাহলে আমি কথা দিচ্ছি, এরকুল পোয়ারোকে বলব, যে কাজের জন্য আপনাকে ডেকেছিলাম, তা সমাধান হয়ে গেছে, আপনি এখন আসুন আবার বলছি, ফর্মুলা ফেরত পাবার পরেই আমিও সব বলব।

কথা শেষ করে স্যার ক্লড টেবিলের ওপর ঘুসি বসালেন।

-বাবা, তোমার সিদ্ধান্ত শুনে আমরা অপমানিত বোধ করছি। উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে রিচার্ড বলল। ঘরের সকলের দিকে কঠিন চোখে তাকাল। আবার বলল আমার মনে হয়, আমাদের প্রত্যেককে আগাগোড়া তল্লাশি করলেই ব্যাপারটা মিটে যায়, অন্ততঃ আমার সেই ধারণা।

-আমি আপনার মতকে সমর্থন করছি। আমিও চাই আমাদের সার্চ করা হোক। এডওয়ার্ড রেনর তার মত জানাল।

ডঃ কারোলির দিকে রিচার্ড পলকহীন কঠিন চোখ তাকিয়ে ছিল। ডঃ কারোলি বিব্রত বোধ করলেন। তার মনে কি আছে কে জানে, কিন্তু মুখে তিনিও রিচার্ডের সিদ্ধান্তকে মেনে নিলেন, জানালেন, খানাতল্লাশিতে তার কোন আপত্তি নেই।

–তোমরা যখন চাইছ, তখন আমি আর না' বলব না। ক্যারোলিন বললেন।

–আর লুসিয়া? রিচার্ড তাকাল স্ত্রীর দিকে সেই দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে প্রচণ্ড ক্রোধ তুমি কি বল?

–আমি... আমি...... ভয় জড়ানো কণ্ঠে লুসিয়া বলল–তোমার কথায় আমার সায় নেই। তোমার বাবা যা চাইছেন, সেটাই বরং ভাল।

স্ত্রীর কথা শুনে রিচার্ড তাজ্জব বনে গেল। হতচকিত হয়ে নীরবে বউয়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

এতক্ষণ স্যার ক্লড, চুপচাপ ছেলের রঙ্গ দেখছিলেন। এবার বললেন–রিচার্ড, চুপ কেন? এবার কিছু বল।

রিচার্ডের বুক থেকে গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে এল। সে ঘাড় ঘোরাল বারবারার চোখে চোখ পড়ল। বারবারা ঘাড় নাড়ল, অর্থাৎ তল্লাশিতে সেও রাজী আছে।

রিচার্ড অবশেষে বলল–বেশ, সকলে যখন খানাতল্লাশি চাইছে, আমি আর আপত্তি করি কেন? তোনার সিদ্ধান্তই মেনে নিলাম, বাবা।

স্যার ক্লড নড়ে চড়ে আরাম কেদারায় আয়েশ করে বসলেন–বিড়বিড়িয়ে বললেন–আজ কফিটা এত তেতো লাগল কেন, কে জানে! মুখ বিকৃত করলেন–গলা পর্যন্ত তে হয়ে আছে। তিনি হাই তুললেন, বুঝি ঘুম আসছে।

এদিকে ম্যান্টলপিসে রাখা পুরনো ঘড়িটা নিজের কাজ করে চলেছে–এক...... দুই..... তিন........ চার...... পাঁচ......... সকলে হকচকিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল-নটা বাজে। ঘণ্টা বেজে চলেছে ছয়....... সাত.........আট...... নয়.........। নটার শেষ ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সব আলো নিভে গেল। ট্রেডওয়েল তার মনিবের আদেশে বেসমেন্টে-এ বাড়ির মেইন সুইচ টিপে বন্ধ করে দিল। ঝুপ করে নেমে এল নিঃসীম অন্ধকার। পুরো বাড়িটাই সীমাহীন আঁধারের অতলে নিমেষে ডুবে গেল।

দারুণ আতঙ্ক এসে গ্রাস করেছে ঘরের বাসিন্দাদের। মেয়েরা চিৎকার করতে শুরু করল।

ক্যারোলিন ঝাঁঝিয়ে উঠলেন,–আরে, এসব কি হচ্ছে। ছাই পাঁশ কিছু তো বুঝতে পারছি না।

-পিসিমা, কি করছ? চুপ কর। চাপা গলায় বারবারা ধমকে উঠল কিছু একটা হচ্ছে, ভালোভাবে শুনতে দাও, দোহাই।

এক-একটি মুহূর্ত কেটে যাচ্ছে। কালি ঢালা আঁধারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে চাপ চাপ নীরবতা। বসার ঘরকে তারা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। এর মধ্যে ভেসে এল একটা ছোট্ট আওয়াজ–কেউ জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। কাগজের খসখসানি শোনা গেল। তারপর ধাতবের ঠুনঠান, কেউ বুঝি কিছু ছিঁড়ে ফেলছে, বোঝা গেল, টেবিল যা চেয়ার উলটে পড়ল, আওয়াজ হল–তারপরেই সব স্তব্ধ, নেমে এল নীরবতা।

–স্যার ক্লড। স্যার ক্লড! লুসিয়ার আর্ত চিৎকার রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিল ডঃ, আমি আর পারছি না, অসহ্য, দয়া করে আলো জ্বালতে বলুন।

তখনও ঘর আলোহীন, জোরে জোরে শ্বাস নেওয়ার শব্দ তখনও নিঃসীম অন্ধকার ভেদ করে বেরিয়ে আসছে, ঠিক এই সময় দরজার বাইরে টোকার শব্দ। সে এক বীভৎস পরিস্থিতি। লুসিয়ার আর্ত চিৎকার আবার শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাতিগুলো জ্বলে উঠল। সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

দেখা গেল দরজার সামনে রিচার্ড দাঁড়িয়ে, দরজা খুলবে কিনা ভাবছে। মেঝেতে উল্টানো চেয়ার, পাশে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছে এডওয়ার্ড রেনর। আর লুসিয়াকে একটা চেয়ারে বসে থাকতে দেখা গেল, কিন্তু চোখ-মুখের যা দশা, বুঝি এখুনি ভিরমি খাবে।

একইভাবে স্যার ক্লড বসে আছেন আর্মচেয়ারে হেলান দিয়ে, যেন পাষাণ মূর্তি, চোখের পাতা বন্ধ, উনি কি ঘুমিয়ে আছেন, না জেগে কেউ জানে না।

রেনর প্রথম মুখ খুলল–ওই তো, ওই তো সেই হারানো নিধি। তার কথা শুনে সকলের দৃষ্টি চলে গেল আমচেয়ারের পাশের টেবিলটার দিকে। স্যার ক্লড যে বড় খামটার কথা বলছিলেন, সেটি পড়ে আছে টেবিলের ওপর।

–ঈশ্বর দয়াময়! লুসিয়া যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, পাওয়া গেছে তা হলে!

আবার দরজায় টোকা, কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা, ধীরে ধীরে দরজার কপাট খুলে গেল। কয়েক জোড়া কৌতূহলী দৃষ্টি এখন দরজার কাছে এসে আটকে গেছে।

সকলে দেখল ট্রেডওয়েলকে, সঙ্গে একজন অচেনা অজানা লোক। আগন্তুক ঘরের ভেতরে ঢুকলেন, ট্রেডওয়েল ফিরে গেল নিজের কাজে।

পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা লোককে বেঁটে বলা যায় না, তবে ছোটখাট, মাথায় মস্ত এক টাক, এক ফালি মিলিটারি গোঁফ নাকের নীচে শোভা পাচ্ছে, যেন মুরগির ডিম। আভিজাত্যপূর্ণ পোশাক। আত্মমর্যাদা সম্পন্ন,–সবমিলিয়ে এমন এক ব্যক্তিত্ব আছে মানুষটার মধ্যে, যার সামনে আপনিই মাথা অবনত হয়ে আসে।

ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন আমি এরকুল পোয়ারো, মাথা সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়ে বললেন–আপনাদের সেবা করার জন্যই আমার আগমন।

আর এক ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকলেন হুঁশিয়ারি পদক্ষেপে, লম্বা চওড়া মিলিটারি মার্কা চেহারা, মধ্যবয়সী।

পোয়ারো চোখের ইশারায় তাকে দেখিয়ে বললেন–ইনি ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, আমার বন্ধু ও সহকারী।

রিচার্ড এগিয়ে এল, হাত বাড়িয়ে দিল, দু'জনে হাত মেলালেন। পোয়ারো প্রশ্ন করলেন–আমি কি স্যার ক্লডের সঙ্গে কথা বলছি? পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে শুধরে নিলেন না, ঠিক বলিনি, যা বয়স আপনার, তাতে আপনাকে স্যার ক্লডের ছেলে বলেই মনে হচ্ছে, কি ঠিক বলেছি?

রিচার্ড হেসে ঘাড় নেড়ে সায় দিল। পোয়ারো তার সঙ্গীকে নিয়ে চলে এলেন একেবারে ঘরের মধ্যখানে।

ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর সঙ্গে রিচার্ড হাত মেলাল। ক্যাপ্টেন মনে মনে বললেন–বাঃ, দারুণ সুন্দর সাজানো ঘর।

রিচার্ড এগিয়ে এল পোয়ারোর সামনে মাফ করবেন মশিয়ে পোয়ারো, রিচার্ড আমতা আমতা করে বলতে লাগল–বলতে খারাপ লাগছে, একটা ভুল বোঝাবুঝি আর কি, ওই কারণেই আপনাকে ডাকা হয়েছে। মিটে গেছে, আপনাকে আর দরকার নেই।

-তাই বুঝি। পোয়ারো জবাব দিলেন।

-হ্যাঁ, ঠিক তাই। বলতে খারাপ লাগছে, সেই লন্ডন থেকে আপনাকে শুধু-শুধু ডেকে আনা হল। এসবের কোন মানে হয় না। যাক গিয়ে, আপনার প্রাপ্য পারিশ্রমিক, এমনকি আপনার এখানে আসা ও ফিরে যাওয়ার খরচও আপনি পেয়ে যাবেন। ভাববেন না।

-না, ভাবছি না। পোয়ারো নীরস কণ্ঠে বলতে থাকেন, আপনার বক্তব্য আমি বুঝতে পেরেছি। আমার পারিশ্রমিক বা যাতায়াত খরচ নিয়ে আমি একটু-ও চিন্তিত নই।

-তাহলে? তাহলে আপনি কী করতে চাইছেন, মশিয়ে পোয়ারো।

একই ভঙ্গিতে পোয়ারো জবাব দিলেন, মিঃ অ্যামরি, আমার বক্তব্য পরিষ্কার। যিনি আমায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, সেই স্যার ক্লড কোথায়। ওনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। উনি যদি না-চান, তাহলে চলে যাক।

-হ্যাঁ, তাইতো, বাবার মুখ থেকে না শুনে..... রিচার্ড আর্মচেয়ারের কাছে চলে এল, যেখানে স্যার ক্লড পাথরের মতো গা এলিয়ে বসে আছেন।

-বাবা, মশিয়ে পোয়ারো এসেছেন। রিচার্ড জোরালো গলায় ডাকতে লাগলেন। তোমার যে ওঁনাকে আর প্রয়োজন নেই, তা বলে দাও। উনি চলে যাবেন। বাবা, তোমার মুখ থেকেই কথাটা উনি শুনতে চাইছেন, না-হলে উনি লন্ডনে ফিরে যাবেন না বলছেন।

বাবার মধ্যে কোন ভাবান্তর না দেখে গলার পর্দা আর একটু বাড়িয়ে রিচার্ড ডেকে উঠল–কি হল বাবা, তুমি শুনতে পাচ্ছ না? চোখ খুলে তাকাও।

না, ছেলের ডাকাডাকিতে বাবার চোখ খুলল না।

রিচার্ড এবার ঘাবড়ে গেল। বাবা' বাবা' বলে সে স্যার ক্লডের বুকের বাঁদিকে নিজের কান রাখল। পরক্ষণেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। চিৎকার করে ডঃ কারোলিকে ডাকল–শিগগির এদিকে আসুন, ডঃ কারোলি।

ভাইপোর ভয়ার্ত চিৎকার শুনে ক্যারোলিন আতঙ্কিত হল, মুখ হল বিবরণ।

দ্রুত পায়ে ডঃ কারোলি ছুটে এলেন, স্যার ক্লডের হাতের শিরা টিপে ধরলেন, পরীক্ষা করলেন, সামান্য ঘাড় নাড়লেন, এবার স্যার ক্লডের হৃৎপিন্ডে কান পাতলেন। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। গম্ভীর মুখে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ডঃ কারোলি। পকেট থেকে ছোট্ট টর্চ বের করলেন, চোখের পাতা টেনে ধরলেন, টর্চের আলো ফেললেন। টর্চ নিভিয়ে দিলেন। ঘরের সকলের দিকে তাকালেন, নিরাশার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লেন।

–ডঃ কারোলি, বারবারার উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর, জেঠুর কি হয়েছে? কথা বলছেন না কেন?

বড্ড দেরি হয়ে গেছে, মিস অ্যামরি, ডঃ কারোলি বললেন–স্যার ক্লড, আর বেঁচে নেই, উনি হার্টফেল করছেন, অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছেন।

.

০৬.

এরকুল পোয়ারোর চিন্তাচ্ছন্ন মন–আমি যদি একটু আগে এখানে আসতাম, এমন দুর্ঘটনা ঘটত না। এমন অপূরণীয় ক্ষতি, এ যে আমার স্বপ্নের অতীত।

রিচার্ড তখনও নিশ্চিত হতে পারছে না–ডঃ কারোলি, আপনি ঠিক বলছেন তো, আচমকা হার্টফেল করে বাবার মৃত্যু হয়েছে?

–তাই তো মনে হচ্ছে। কয়েকটি কথায় জবাব দিলেন ডঃ কারোলি।

ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে বোন ক্যারোলিন শোকে ভেঙে পড়লেন। কান্নাকাটি শুরু করলেন। বারবারা ছুটে এল, এখুনি পিসিমাকে, শান্ত করা প্রয়োজন, নয়তো উনি বেঁহুশ হয়ে পড়বেন।

এডওয়ার্ড রেনরও এগিয়ে এল বারবারার পাশে। নীচু স্বরে জানতে চাইল–ওই কারোলির কথা বলছি। সত্যিই কি উনি ডাক্তার?

-হ্যাঁ, ডাক্তার। সহজ ভাবে বারবারা বলল, তবে এদেশের নয়, ইটালির।

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিলেন পোয়ারো। ওদের কথাবার্তা তার কানে এল। গোঁফে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি বললেন–এখানে উপস্থিত সকলের অবগতের জন্য বলছি, আমি একসময় পুলিশের গোয়েন্দা ছিলাম, অবশ্য বেলজিয়ান পুলিশের, তাহলে মনে রাখবেন, আমরা, অর্থাৎ বিদেশীরা সমস্যার আসল সমাধানটা খুঁজে বের করি, কচ্চিৎ দু-একটা বাদে।

পোয়ারোর কথা শুনে বারবারা লজ্জায় মাথা হেঁট করল, তার বুঝতে দেরি হল না যে, তাকে ইঙ্গিত করেই এমন ঠেস দেওয়া কথা বলা হল। বারবারার মুখ ভার হল। এডওয়ার্ড পরিস্থিতি সামাল দিতে বারবারার সঙ্গে মামুলি কথাবার্তা বলতে লাগল।

ইতিমধ্যে লুসিয়া এসে দাঁড়িয়েছে পোয়ারোর পাশে। তাকে ধরে টেনে নিয়ে গেল ঘরের অন্যপাশে। চাপা গলায় অনুরোধের সুরে বলল–মশিয়ে পোয়ারো, আপনি কারো কথা মানবেন না। এখানেই আপনি থাকুন, যে কাজে এসেছেন, তা শুরু করুন, প্লীজ।

মাদাম, পোয়ারো তাকালেন লুসিয়ার দিকে, আপনি কি সত্যিই চান, আমি এখানে থাকি?

-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, স্যার ক্লডকে ইশারায় দেখিয়ে লুসিয়া বলে চলল–এটা কোন সহজ ব্যাপার নয়, গোলমেলে, আমি হলফ করে বলতে পারি। স্যার ক্লড আমার শ্বশুর হন, ওঁনার বুকে কোন রোগ ছিল না বলেই জানি, সেরকম কোন অসুখ থাকলে নিশ্চয়ই আমার কানে আসত। মশিয়ে পোয়ারো আবার আপনাকে অনুরোধ করছি, দয়া করে এ রহস্যের জট আপনি খুলুন।

ওদিকে মৃত স্যার ক্লডকে ঘিরে আছে রিচার্ড ও ডঃ কারোলি। রিচার্ড দিশেহারা, কি করা উচিত বা উচিত নয়, ঠিক করতে পারছে না।

ডঃ কারোলি তাকে সাহায্য করল–মিঃ অ্যামরি আপনি এক কাজ করুন, আপনাদের পারিবারিক ডাক্তারকে ডেকে পাঠান। উনি এসে স্যার ক্লডকে পরীক্ষা করুন।

রিচার্ড এতক্ষণে ধাতস্থ হল। নিজেই নিজেকে শুধালো আছে তো একজন, ডঃ গ্রাহাম, কেনেথ গ্রাহাম। অল্প বয়সে বেশ পশার জমিয়েছে। ওকে ডাকাটা কি ঠিক হবে? বারবারার ওপর ওর যা নজর, যদি......

দূর, এসব অর্থহীন চিন্তা করার কি সময় এখন? দেখি ফোনে পাই কিনা। কিন্তু....

রিচার্ড তার খুড়তুতো বোন বারবারাকে ডেকে ডঃ কেনেথ গ্রাহামের ফোন নম্বরটা চাইল।

–বলছি, বারবারা পায়ে পায়ে জ্যেঠতুতো ভাইয়ের পাশে এসে দাঁড়াল, মার্কেট ক্লিভ ফাইভ।

রিচার্ড রিসিভার তুলে নম্বর ডায়াল করতে, উদ্যত হল। ঠিক এই সময় এডওয়ার্ড রেনর ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলল–তাহলে মশিয়ে পোয়ারোকে ফেরত পাঠানো জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করতে বলি।

রেনরের এই আগ বাড়িয়ে কথা লুসিয়ার মোটেও পছন্দ হল না। পোয়ারো কি বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে বাধা দিয়ে লুসিয়ে জোর গলায় বলল–না না, গাড়ির দরকার নেই। মশিয়ে পোয়ারো এখানেই থাকবেন। সমস্ত ব্যাপার মিটিয়ে তবেই ফিরবেন। আমি ওঁকে অনুরোধ করেছি।

-কি বলছ, লুসিয়া? রিসিভার কানের কাছে চেপে ধরেই রিচার্ড বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইল–তুমি ভেবে-চিন্তে বলছ তো?

নিশ্চয়ই, লুসিয়া জোর গলায় বলল, উনি এখানেই এখন থাকবেন।

ক্যারোলিন এখন চুপ করেছেন, চোখে আতঙ্কের ইশারা। চার দিকে তাকালেন। বারবারা আর রেনরের চোখেও উৎকণ্ঠা ও ভয়। ডঃ কারোলি আপন মনে তাকিয়ে আছেন স্যার ক্লডের মৃত মুখের দিকে, কি সব ভাবছেন।

ক্যাপ্টেন, হেস্টিংস নীরবে এতক্ষণ সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছিলেন। লাইব্রেরির তাকে সাজিয়ে রাখা বইগুলো টেনে টেনে বের করছিলেন, আর মন দিয়ে পাতা উল্টে উল্টে কি যেন দেখছিলেন। একসময় তিনি সামনের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। উপস্থিত সকলকে জরিপ করতে লাগলেন।

ফোনে ডায়াল করতেই ওদিক থেকে সাড়া পাওয়া গেল। রিচার্ড শশব্যস্ত হয়ে জানতে চাইল–হ্যালো, মার্কেট ক্লিভ ফাইভ। ডঃ গ্রাহাম? সামান্য বিরতি– হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেনেথ গ্রাহামকে চাইছি। আবার বিরতি–হ্যালো কেনেথ, আমি রিচার্ড অ্যামরি বলছি। তোমাকে ভাই এক্ষুনি আমাদের বাড়িতে আসতে হবে। বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। যদুর মনে হয়, উনি আর বেঁচে নেই। আবার বিরতি–না, নিশ্চিত হতে পারছি না। তোমার অপেক্ষাতেই আছি তাড়াতাড়ি চলে এস, ঠিক আছে?

ঘটাং করে ক্রেডেলের ওপর রিসিভার নামিয়ে রেখে রিচার্ড তীক্ষ্ণ চোখে বউয়ের দিকে তাকাল, ঝাঁঝাল গলায় বলল, লুসিয়া, তোমার মাথায় কি বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই? ওই শয়তান গোয়েন্দাকে যেভাবেই হোক এখনই তাড়াতে হবে এখান থেকে। তুমি তো সব জানো, বোঝো, নাকি সব বুঝেও ছেলে মানুষির ভান করছো?

রিচার্ড! স্বামীর ধমকানি খেয়ে লুসিয়া তেড়ে উঠে দাঁড়াল–কি বলতে চাইছ স্পষ্ট করে বলল।

বাবা শেষ কথাগুলি কি বলেছিলেন, খেয়াল আছে তোমার? রিচার্ড প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল–আজ কফিটা বড্ড তেতো লাগছে–ঘুরে ফিরে কয়েকবার এই কথা বলছিলেন।

লুসিয়া তখনও হাঁ–আজ কফিটা বড্ড তেতো লাগছে? বলছিলেন নাকি? স্বামীর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সে। হঠাৎ তার বুঝি ঘুম ভাঙল, অজানা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল, পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিল।

-এতক্ষণে তাহলে মগজে ঢুকেছে, কি তাই তো? আবার রিচার্ডের গলা থেকে চাপা ধমকানি শোনা গেল–শোনো, বাবা এই পরিবারের কোন একজন বিষ খাইয়েছে, বুঝতে পারছ, ওই টাক মাথার লোকটাকে এখানে রেখে দিলে সব খুঁচিয়ে বের করবে, অ্যামরি পরিবারের কেলেঙ্কারির কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। তুমি কি জেনে-বুঝে তা হতে দিতে চাও?

-হা কপাল, লুসিয়া সামনের দিকে তাকাল। বিড়বিড় করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাল–দয়াময়, আমাদের রক্ষা করুন।

রিচার্ড এবার পোয়ারোকে ডাকল। পোয়ারো শান্তগলায় সাড়া দিলেন।

-মশিয়ে পোয়ারো, রিচার্ড থামল, নিজের কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে উগরে দিল আমার স্ত্রী লুসিয়া আপনাকে কেন এখানে রাখতে চাইছে, তা এখনও আমার বোধগম্য হচ্ছে না।

তাই বুঝি? পোয়ারো একটু হেসে রসিয়ে রসিয়ে বললেন, মনে করুন, একটা দলিল চুরির তদন্তের কারণেই। তাছাড়া বারবারাকে ঈঙ্গিত করে আরও বললেন, উনি, ওই মহিলাও আমাকে একই কথা জানিয়েছেন।

-কিন্তু যে দলিল খুঁজে বের করার দায়িত্ব আপনার ওপর ন্যস্ত করা হচ্ছে, তা তো পাওয়া গেছে, মশিয়ে পোয়ারো। রিচার্ড কথাগুলো বারবারাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল।

-সত্যিই কি পাওয়া গেছে? পোয়ারো পাল্টা প্রশ্ন করলেন। তার কথা শুনে রিচার্ড ধন্দে পড়ল।

আচমকাই একটা লম্বা খাম পোয়ারোর নজরে পড়ল, স্যার ক্লডের আর্মচেয়ারের পাশের ছোট টেবিলের ওপর সেটা পড়ে আছে। মৃত্যুর ঘটনায় ভীত ও উত্তেজিত নারী পুরুষের তা নজরে পড়েনি।

তার মানে? রিচার্ডের কঠিন কণ্ঠস্বর।

পোয়ারো আবার নিজের গোঁফে হাত বুলাতে লাগলেন, তারপর ধুলো সাফ করার অছিলাতে জ্যাকেটে দু-আঙুল টোক্কা দিলেন। স্মিত হাস্যে জবাব দিলেন, মি. অ্যামরি, এখানে কি ঘটেছে, এখনও সে ব্যাপারে আমি অজ্ঞ। তবু একটা গল্প মনে পড়ে যাচ্ছে, অনেক আগে শুনেছিলাম–খালি বোতল, যার মধ্যে কিছুই ছিল না।

-আপনার হেঁয়ালি আমি বুঝতে পারছি না, মশিয়ে পোয়ারো।

–আপনাকে দেখে তা মনে হচ্ছে না। আপনি সব বুঝতে পারছেন, অথচ মুখে তা স্বীকার করছেন না। কথা বলতে বলতে পোয়ারো টেবিলের ওপর থেকে খামটা তুলে নিলেন, ফাঁক করে উঁকি দিলেন কিছুই নেই। সেটা রিচার্ডের হাতে দিয়ে দিলেন।

রিচার্ড দেখল, খামটা খালি। সে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে সেটা আগের জায়গায় রেখে দিল। লুসিয়ার দিকে তাকিয়ে কৈফিয়তের সুরে বলল–কোথায় গেল সেই ফর্মুলা, খামটা তো খালি।

স্বামীর কথার বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে পিছিয়ে যেতে লাগল। রিচার্ড আপন মনেই বিড়বিড়িয়ে উঠল–খানা তল্লাশি ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ রইল না।

রিচার্ড ঘর ভর্তি নারী, পুরুষের দিকে তাকাল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কি যেন বোঝার চেষ্টা করল। ক্যারোলিন ও বারবারার সন্দেহ ভরা দৃষ্টি তাকে ভাবিয়ে তুলল।

এডওয়ার্ড রেনরের চোখে জমেছে যত রাজ্যের ঘৃণা, যা রিচার্ডের কাছে অপমানজনক মনে হল। কেবল ডঃ কারোলিকে ব্যতিক্রমী দেখা গেল। তিন ভদ্র ও অমায়িক। এবার নিজের স্ত্রীর দৃষ্টি দেখে তার মনের কথা পড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু ব্যর্থ হল, কারণ লুসিয়া ঘনঘন তার দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটাচ্ছিল।

–মশিয়ে অ্যামরি, পোয়ারো তীক্ষ্ণ চোখে রিচার্ডের দিকে তাকালেন, বললেন আমাকে আপনি মোটেও সহ্য করতে পারছে না, বুঝতে পারছি। কিন্তু ঢিল হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। অতএব, যতক্ষণ না ডাক্তার এসে আপনার বাবাকে পরীক্ষা করছেন, ততক্ষণ আপনাকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতেই হচ্ছে।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। লাইব্রেরির লাগোয়া দরজাটা আঙুল তুলে দেখিয়ে পোয়ারো জানতে চাইলেন–মশিয়ে অ্যামরি, ওই দরজাটা কোন কাজে লাগে?

–পাশেই বাবার স্টাডি। ওই দরজাই একমাত্র পথ।

রিচার্ডের কথা শুনে ধীর পায়ে এরকুল পোয়ারো সেদিকে এগিয়ে গেলেন। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে স্টাডির ভেতরে দৃষ্টি দিলেন। বনবন করে ঘুরে বেড়াল তার অনুসন্ধানী চোখ। কয়েক মিনিট কেটে গেল। সন্তোষজনক ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লেন। ঘুরে দাঁড়ালেন রিচার্ডের দিকে।

চোখ ঘুরে গেল ঘরের অন্যান্য সদস্যদের দিকে। আটকে গেল তা ডঃ কারোলির ওপর। সামান্য হেসে বললেন–আপনাদের আর কলে পড়া ইঁদুরের মতো এখানে আটকে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তবে হ্যাঁ, বাড়ির বাইরে কারো যাবার হুকুম নেই।

একথা শুনে সকলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বারবারা বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াল। এডওয়ার্ড রেনর এগিয়ে এসে তার হাত ধরল, তারা পাশাপাশি হেঁটে বসার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

–কথাটা খেয়াল রাখবেন, মশিয়ে অ্যামরি, পোয়ারো রিচার্ডকে লক্ষ্য করে বললেন, এ বাড়ি ছেড়ে আপনারা কোথাও যেতে পারবেন না, আবারও বলছি।

-ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর বলতে, হবে না, বোঝা গেল রিচার্ড প্রচণ্ড রেগে গেছে– আপনার হুকুম সকলের কানে গেছে।

ক্যারোলিন ধীর পায়ে ভাই স্যার ক্লডের আরাম কেদারার পাশে এসে দাঁড়ালেন হায় রে, হতভাগা ভাই আমার! তার চোখ দুটি জলে ভরে উঠল–বেচারা ক্লড।

-মাদাম, শান্ত হোন, এভাবে ভেঙে পড়বেন না, পোয়ারোর কণ্ঠে সান্ত্বনা ঝরে পড়ল–এ অপূরণীয় ক্ষতি, জানি না কিভাবে সব ঠিক হবে। মনে সাহস রাখুন।

-ফ্রাইসোল ছিল আমার ভাইয়ের প্রিয় খাবার। ক্যারোলিনের কান্নাভেজা কণ্ঠস্বর। অনেক দিন পর ওটা আজ বেঁধে ওকে খাইয়েছিলাম।

-ভাইয়ের শোককে ভুলে থাকার এটাই আপনার সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা, পোয়ারোর ঠোঁটে হাসি। পৃথিবীতে এমন কটা বোন আছে, যে তার ভাইকে তার প্রিয়পদ খাইয়ে জীবনের মতো বিদায় জানায় আপনি তো সৌভাগ্যবতী, মাদাম।

ক্যারোলিন আর দাঁড়ালেন না। রুমালে চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরোবার উদ্যোগ নিলেন। রিচার্ড তাকে সাহায্য করল। তাদের পেছন পেছন লুসিয়াও চৌকাঠ ডিঙিয়ে ওপারে চলে গেল।

এই মুহূর্তে বসার ঘরে উপস্থিত আছেন মাত্র তিন জন একটি মৃত, দুটি জীবন্ত।

সদ্যমৃত স্যার ক্লডকে কেন্দ্র করে পোয়ারো তার সহকারী ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর সঙ্গে আলোচনায় মেতে উঠলেন।

ক্যাপ্টেন হেস্টিংস জানতে চাইলেন

০৭.

–কি মনে হচ্ছে, পোয়ারো, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস জানতে চাইলেন।

–আগে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এস।

বন্ধুকে এই নির্দেশ দিয়ে পোয়ারো ঘরটি তীক্ষ্ণচোখে জরিপ করলেন। হঠাৎ এক জায়গায় এসে তার চোখ আটকে গেল। তিনি এগিয়ে এলেন ওল্টানো চেয়ারটার কাছে, যেটা মৃত স্যার ক্লড থেকে সামান্য দূরে। ওই চেয়ারটিতেই বসেছিলেন স্যার ক্লড অ্যামরির সেক্রেটারি এডওয়ার্ড রেনর।

ওটা কি? পোয়ারো নীচু হয়ে কি যেন একটা তুলে নিলেন।

ক্যাপ্টেন বন্ধু জানতে চাইলেন–কি পেলে?

–চাবি, পোয়ারো, জবাব, নিখুঁত একটা চাবি। শশব্যস্ত হয়ে বললেন, বন্ধু, চট করে স্টাডিতে যাও তো। ওঘরে একটা সিন্দুক আছে দেখেছি এই চাবিটা লাগিয়ে দেখ খোলে কিনা। কেউ আসার আগেই কাজটা সেরে ফেলা দরকার।

চাবি নিয়ে ক্যাপ্টেন হেস্টিংস এসে ঢুকলেন স্টাডিতে। পোয়ারো ইতিমধ্যে মৃত স্যার ক্লডের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। চারপাশে একবার সতর্ক চোখে তাকালেন, কান খাড়া

করলেন। না, প্রশস্ত সময়। তিনি চট করে স্যার ক্লডের ট্রাউজার্সের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। টেনে বের করলেন একটা চাবির গোছা। সন্ধানী চোখে প্রত্যেকটা চাবি পরখ করলেন।

ইতিমধ্যে স্টাডি থেকে বেরিয়ে এসেছেন ক্যাপ্টেন হেস্টিংস ঠোঁটে খুশির ঝিলিক তুমি ঠিকই ধরেছ, বন্ধু, এই চাবি ওই সিন্দুকেরই, গর্তে ঢোকাতেই কেমন টুক করে ঘুলে গেল, আবার বন্ধ হল। এবার আমি এই ঘটনার গলদ কোথায়, ধরতে পেরেছি।

-বন্ধু, অত সহজ ভেবো না, কেসটা যেমন জটিল, তেমন রহস্যঘন, সময় লাগবে জট খুলতে, পোয়ারো হাত বাড়িয়ে বললেন, দাও, চাবিটা দাও দেখি।

বন্ধু-তথা সহকারীর কাছ থেকে চাবি পোয়ারো এক হাতে নিলেন, অন্য হাতে স্যার ক্লডের পোশাকের পকেট থেকে পাওয়া চাবির গোছর নির্দিষ্ট একটি চাবি তুলে ধরলেন। দুটো চাবি মিলিয়ে দেখলেন। একই তালার চাবি নিখুঁত ভাবে তৈরি কোনটা নকল আর কোনটা আসল, বোঝা মুশকিল।

চাবির গোছাটা আগের জায়গায় রেখে দিয়ে পোয়ারো হাতের চাবিটা দেখিয়ে বললেন– খুব তাড়াহুড়ো করে তৈরি হলেও নিখুঁত, এর সাহায্যেই কাজ হাসিল হয়েছে নিঃসন্দেহে।

তাহলে তো এর মানে হল.......... ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

হঠাৎ শোনা গেল দরজায় লাগানো তালা খোলার মৃদুশব্দ। পোয়ারো সচকিত হলেন এবং ক্যাপ্টেন হেস্টিংসকে চুপ থাকতে বললেন। এগিয়ে গেলেন দরজার কাছে। কপাট দুটো ভেতর থেকে টেনে দিলেন, দরজা খুলে গেল। ট্রেডওয়েলকে দেখা গেল।

-মাফ করবেন, স্যার, পোয়ারোকে লক্ষ্য করে ট্রেডওয়েল বলল–উনি, আমার মনিব, ইশারায় আরামকেদারায় আধ শোওয়া স্যার ক্লডকে দেখিয়ে বলতে থাকল, তার হুকুমেই আমি এ ঘরের দরজা বাইরে থেকে তালা এঁটে দিয়েছিলাম। আপনি এখানে না আসা পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বজায় থাকবে–তাও বলেছিলেন।

–আমার ধারণা, তোমার মনিবের মৃত্যু হয়েছে। তোমার নাম কি, ছোকরা।

–আজ্ঞে, ট্রেডওয়েল। বলতে বলতে সে স্যার ক্লডের মৃত দেহের কাছে এসে দাঁড়াল। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল–ওঃ ভগবান! তোয়ালে দিয়ে চোখ মুছল। শোক সংবরণ করে জানতে চাইল–ওর মৃত্যুর কারণ কি স্বাভাবিক, নাকি ইচ্ছে করে মারা হয়েছে?

-তার মানে? কি বলতে চাইছ তুমি?

ট্রেডওয়েলের চোখে চোখ রেখে পোয়ারো জিজ্ঞাসা করলেন।

-আজ সন্ধ্যার পর থেকে এ বাড়িতে এমন কিছু ঘটেছে, যা আমার মনে... ট্রেডওয়েল থামল।

-তাই বুঝি। পোয়ারো ট্রেডওয়েলের কথায় সায় দিলেন। তারপর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে ইশারায় ট্রেডওয়েলের বক্তব্য বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

ট্রেডওয়েল, তোমার এমন কিছু ঘটনার কথা আমার জানা খুব জরুরি। পোয়ারো বললেন–বল, এমন কি ঘটেছে, যা তোমার মনে খটকা জাগিয়েছে।

–ভেবে পাচ্ছি না স্যার, কোথা থেকে এই ঘটনার শুরু, ট্রেডওয়েল সহজ ভঙ্গিতে বলে চলল–তবে এখন আমার, পরিষ্কার মনে হচ্ছে, যেদিন ওই ইটালিয়ান ভদ্রলোক এ বাড়ির সকলের সঙ্গে বিকেলে চায়ের আসরে যোগ দিয়েছিলেন, তখনই প্রথম মনে হয়েছিল, কোথাও কোন গোলমাল হয়েছে।

ইটালিয়ান ভদ্রলোক? তার নাম কি?

–ডঃ কারোলির কথা বলছি, স্যার।

-উনি বিকেলে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসছেন, এটা নিশ্চয়ই বাড়ির সকলে জানতেন না?

-ঠিক বলেছেন, স্যার। উনি মিসেস লুসিয়া রিচার্ডস-এর বন্ধু, তাই মিস ক্যারোলিন তাঁকে অতিথি হয়ে এখানেই থাকতে বলেন। তবে কথা শেষ না করে ট্রেডওয়েল মুখ বন্ধ করল।

–কী হল, থেমে গেলে কেন? পোয়ারো জানতে চাইলেন, তবে কি?

-আমি কেন চুপ করে গেলাম, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, স্যার ট্রেডওয়েলের বিনীত কণ্ঠস্বর। এই পরিবারে যা কিছু ঘটছে, তা পাঁচকান করা উচিত নয়। এতদিন যাঁর সম্মানের কথা ভেবে কিছু বলিনি, তিনি যখন আজ আর বেঁচে নেই, তবে আর ভয় কিসের? তাই আমি মনে করি........

ট্রেডওয়েল তার মনিবের মৃত্যুতে যে মানসিকভাবে অত্যন্ত ভেঙে পড়েছে, পোয়ারোর বুঝতে দেরি হল না। তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে। সহানুভূতির সুরে বললেন ট্রেডওয়েল, তুমি মুখে না বললেও আমি আঁচ করতে পারছি তোমার মনের কথা। তুমি এই পরিবারের বাটলার, সাবেক রীতিনীতিতে আটকে আছ। অন্যদিকে তোমার মনিবের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা এসব ছেড় বাইরে বেরোতে পারছ না। তাইতো?

ট্রেডওয়েল নীরবে ঘাড় নেড়ে পোয়ারোর কথায় সায় দিল।

তবে তোমাকে জানিয়ে রাখি, তোমার মনিবের ডাকেই আমি এখানে এসেছি। সাক্ষাতে তিনি সব আমায় বলতেন। অতএব, আমি চাই, তুমি যা কিছু জানেনা, সব ঝেড়ে বলে ফেলল।

–বেশ, তাই হোক। ট্রেডওয়েল বলতে শুরু করল, মিস ক্যারোলিন অ্যামরি এই ডঃ কারোলিকে পরিবারের সকলের সঙ্গে ডিনারে আমন্ত্রণ জানালে লুসিয়া রিচার্ডস মোটেই খুশি হননি। ওঁর চোখ মুখ ও আচরণে তা প্রকাশ পেয়েছিল।

–আচ্ছা, এবার বল, পোয়ারো জিজ্ঞাসা করলেন–ওই ইটালিয়ান লোকটাকে দেখে তোমার কি মনে হয়?

–স্যার, ডঃ কারোলির ওপর ট্রেডওয়েল যে বিরক্ত, তা বোঝা গেল, মাফ করবেন স্যার, ডঃ কারোলিকে অন্যান্যদের কেমন লাগে জানি না, তবে আমার তাকে গোলমেলে লোক বলে মনে হয়।

–অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ, পোয়ারো বললেন, ডঃ কারোলি এই পরিবারে আসার পর থেকেই তোমার অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে, ঠিক বলেছি?

-হ্যাঁ, স্যার, ঠিক তাই।

–এমন কোন ঘটনা ঘটেছিল, যার ফলে, তোমার মনে ডঃ কারোলি সম্পর্কে সন্দেহজনক ধারণার জন্ম হয়েছে?

-তাহলেও বলি, স্যার। ট্রেডওয়েল বলে চলল, আজ বিকেলে সকলে যখন চা পানে ব্যস্ত, সেই সময় স্যার ক্লড আমাকে ডেকে লাইব্রেরি অর্থাৎ এ ঘরের দুটো ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর পাল্লা ভেতর থেকে বন্ধ করে তালা আটকে দিতে বলেছিলেন, এমনকি দরজায় লাগানো তালাও। তারপর ডিনার শুরু হল। পরিবারের সদস্যরা ডিনার টেবিলে হাজির। ডিনারের ফাঁকে স্যার ক্লড আমাকে হুকুম দিলেন গ্যারাজে ফোন করতে, গাড়ি পাঠিয়ে স্টেশন থেকে আপনাকে নিয়ে আসার জন্য। মিসেস লুসিয়া রিচার্ড, তার হাবভাবেও অস্বাভাবিকতা ছিল। ডিনার শেষ না করেই টেবিল ছেড়ে কোনরকমে বেরিয়ে এসেছিলেন। ওনার আবার ফিটের অসুখ আছে, কোথায় কখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবেন, আগে ভাগে কেউ বলতে পারে না। তাই উনি তেড়ে খুঁড়ে চলে আসাতে, সকলে

ভাবলেন, নিশ্চয়ই লুসিয়ার শরীর খারাপ করছে, জ্ঞান হারাবে। অতএব একে একে খাওয়া না সেরে সবাই টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন।

পোয়ারো শান্তভাবে চিন্তা করতে লাগলেন, স্যার ক্লড আমাকে উইক এন্ডেই আসতে বলে ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ উনি মত পালটে শুক্রবার অর্থাৎ আজই আমায় অনুরোধ করেন। কিন্তু কেন? এখন ব্যাপারটা সামান্য হলেও আঁচ করতে পারছি।

-ডিনার টেবিল থেকে লুসিয়া তাহলে সোজা এঘরেই এসে ঢুকেছিলেন, তাই না ট্রেডওয়েল?

-হ্যাঁ, পোয়ারোর প্রশ্নের জবাবে ট্রেডওয়েল বলল।

বাটলার ট্রেডওয়েলের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে পোয়ারোর অনুসন্ধানী দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছিল ঘরময়। টেবিলের ওপর একটা ব্যাগ দেখে হাতে তুলে নিলেন লেডিস ব্যাগ।

–কোন মহিলা বোধহয় মনের ভুলে তার ব্যাগটা ছেড়ে চলে গেছেন। ট্রেডওয়েল, বলতে পার, এটা কার ব্যাগ?

-ওটা মিসেস লুসিয়া রিচার্ডস-এর, ট্রেডওয়েল বলল, আমার পরিষ্কার মনে আছে এঘর ত্যাগ করার সময় উনি ব্যাগটা টেবিলে রেখে চলে গেলেন।

পোয়ারো তার বন্ধু ও সহকারীর দিকে তাকালেন, অর্থাৎ বন্ধু, এ সম্পর্কে তোমার কি ধারণা।

–ট্রেডওয়েল মিথ্যে বলছে না। ক্যাপ্টেন হেস্টিংস বললেন–ঘর ছেড়ে চলে যাবার সময় মিসেস লুসিয়া টেবিলে ওই হাত ব্যাগটা রেখে চলে গেলেন, আমি নিজের চোখে দেখেছি।

–ঘর থেকে বেরোলেন, অথচ নিজের ব্যাগ নিতে ভুলে গেলেন। সত্যিই আজব ব্যাপার।

কথা বলতে বলতে এরকুল পোয়ারো লেডিস ব্যাগটা সোফার ওপর রেখে দিলেন। এখন তার মনে নানা সম্ভাবনা উঁকি দিয়েছে। ব্যাগটা তাকে ভাবিয়ে তুলল। দুদে গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারো এখন গভীর চিন্তার সমুদ্রে তলিয়ে গেলেন।

ট্রেডওয়েলের কথাতে তাঁর চিন্তার ঢেউগুলো ছড়িয়ে পড়ল। তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন।

–আর একটা ব্যাপার, স্যার, খানিকটা থেমে ট্রেডওয়েল আবার বলতে শুরু করল এ ঘরের দরজা জানলা ভাল করে বন্ধ করার কথা বলছি। স্যার ক্লড আমায় বলেছিলেন........ ট্রেডওয়েল কথা শেষ না করে চুপ করে গেল।

-বল বল। পোয়ারো আগ্রহ ভরে জানতে চাইলেন, বল, তোমার মনিব কি বলেছিলেন, কোনো কিছু গোপন করো না এসো, আমরা বরং বাড়ির সামনের দরজা দেখিয়ে তিনি বললেন ওপাশে গিয়ে কথা বলি।

ট্রেডওয়েলের পেছন পেছন পোয়ারোকে এগিয়ে যেতে দেখে ক্যাপ্টেন হেস্টিংস বললেন–তোমরা যাও, আমি এখানেই থাকি কি বল?

হাসতে হাসতে ক্যাপ্টেন হেস্টিংসও তাদের সঙ্গী হলেন।

একে একে তিনজনে বসার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে থেকে দরজার কপাট ভাল করে বন্ধ করল ট্রেডওয়েল।

এরপর কেটে গেছে কিছুটা সময়। হঠাৎ ভেতর থেকে ওই ঘরের দরজা খুলে গেল, বেড়ালের মতো অতি সাবধানে পা ফেলে ঢুকল লুসিয়া। চারপাশে তার সজাগ দৃষ্টি। না, কেউ কোথাও নেই, ঘর একেবারে ফঁকা। নিশ্চিন্ত হল। চলে এল কফি টেবিলের সামনে। এখন তাকে দেখে মনে হচ্ছে, কোন মন্ত্রবলে সে এক ডাইনিতে পরিণত হয়েছে। মুখের কোমল নিরপরাধ ভাব উঠে গেছে, কুটিলতা মাখা মুখে শেয়ালের ধূর্তামি। বয়সটাও এক ধাপে বুঝি অনেকটা বেড়ে গেছে।

খুব সাবধানে নিঃশব্দে স্যার ক্লডের এঁটো কফির কাপটা তুলে নিল। এবার সে কি করবে? কিছু করার আগেই বাইরের দিকের দরজা দিয়ে পোয়ারো ঢুকে পড়লেন ভেতরে। ভূত দেখার মতো চমকে উঠল লুসিয়া।

কিছু মনে করবেন না, মাদাম, পোয়ারো তড়িঘড়ি কফির কাপটা লুসিয়ার থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিলেন।

–আমার ব্যাগটা যে কোথায় গেল, এক নিঃশ্বাসে লুসিয়া কথাগুলো বলল, মনে হয় এখানে রেখেছিলাম, তাই........।

-ব্যাগ খুঁজছেন? পোয়ারোর ঠোঁটে হাসির রেখা, আপনার এ ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর একটা লেডিস ব্যাগ দেখেছিলাম খুব সম্ভবত। কোথায় দেখেছি, কোথায় দেখেছি, হা, ওইতো পড়ে আছে সোফার ওপর।

পোয়ারো নিজে ব্যাগটা তুলে এনে লুসিয়াকে দিলেন।

লুসিয়া তাকাল পোয়ারোর দিকে। একগাল মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে বিদায় নিল। ভেতরের দরজা দিয়েই সে চলে গেল।

পোয়ারো কি মনে করে স্যার ক্লডের ব্যবহার করা কফির কাপটা সামনে তুলে ধরলেন, কিছুটা তলানি পড়ে আছে, নাকের কাছে এনে গন্ধ নিলেন। পকেট থেকে একটা কাঁচের নল বের করলেন। সাবধানে কিছুটা তলানি টেস্টটিউবে ঢেলে নিলেন। কর্কের ছিপি লাগিয়ে টিউবের মুখ বন্ধ করলেন। জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে সেটা চালান করে দিলেন। কাপটা যথাস্থানে ট্রে-র ওপর রেখে দিলেন। গুণে দেখলেন, ট্রে-তে মোট ছটি কাপ রয়েছে।

পোয়ারো আবার চিন্তার সমুদ্রে ডুব দিলেন। ভুরু কুঁচকে সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজতে লাগলেন। হঠাৎ তার মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বুঝিবা কোন পথ পাওয়া গেছে।

পোয়ারো আবার বাইরের দরজাটা ব্যবহার করলেন। বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে সশব্দে দরজার পাল্লা দুটো টেনে দিলেন। দুটো ফ্রেঞ্চ উইন্ডো, পুরু পর্দা লাগানো, জানলা ছাড়িয়ে নীচ পর্যন্ত ঝুলছে।

পোয়ারো নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন একটি পর্দার আড়ালে। বাইরে থেকে সজাগ দৃষ্টি রইল বসার ঘরের ভেতরে।

হ্যাঁ, আবার সে এসেছে। তবে আগের চেয়ে আরো বেশি সাবধানী। একটুও আওয়াজ না করে লুসিয়া ঘরের মাঝখানে চলে এল। জানলার পর্দার আড়াল থেকে পোয়ারো সব কিছু লক্ষ্য করলেন।

লুসিয়া ওই কাপটা তুলে নিল, একটু আগে তিনি যেটি সরিয়ে রেখেছিলেন। ওই কাপটা লুসিয়ার কোন কাজে লাগবে? পোয়ারো দেখলেন, পায়ে পায়ে লুসিয়া চলে এল একটা টুলের সামনে, যেখানে রয়েছে বড় ধাতুর একটা টব, তাতে ঘর সাজাবার বাহারি পাতার চারা গাছ পোঁতা। বাইরে বেরোবার দরজার কাছেই টবটা রাখা।

মাটিটা বেশ শক্ত হয়ে আছে, খুঁড়ে বেশ খানিকটা মাটি ওপর দিকে তুলে ফেলল, একটা ছোট গর্ত সৃষ্টি হল। এবার জল ঢেলে চারপাশের শক্ত মাটিকে নরম করল। হাতের কাপটা বসিয়ে দিল গর্তের মধ্যে, তার ওপর খোঁড়া মাটি ঢাকা দিল। হাত দিয়ে সমান করে দিল, কিছু বোঝার উপায় রইল না।

হাতে লেগে থাকা মাটি জলে ধুয়ে পাত্রটা সরিয়ে রাখল। সমস্ত প্রমাণ লোপাট করে লুসিয়া বুঝি এবার নিশ্চিন্ত হল।

ঠিক এই সময় ওই ঘরে রিচার্ডকে ঢুকতে দেখা গেল, পেছনে এক সুদর্শন যুবক, হাতের ডাক্তারি ব্যাগই তার পরিচয় জানিয়ে দিল।

আচমকা লুসিয়াকে দেখে রিচার্ড ঘাবড়ে গেল–তুমি? এখানে কি কাজ?

দরকার ছিল, লুসিয়া হাসতে হাসতে বলল, ওপরে গিয়ে ব্যাগটা না পেয়ে ভাবলাম এঘরেই ফেলে রেখে গেছি, তাই আর কি! আরে ডঃ গ্রাহাম যে, ভাল আছেন তো? বাড়ির খবরও নিশ্চয়ই ভাল। দুঃখিত, আমাকে এক্ষুনি ওপরে যেতে হবে। আসি।

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তড়িৎ গতিতে লুসিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে এল। রিচার্ড বোকার মতো স্ত্রীর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল–সত্যি, তোমার মতিগতি বোঝা ভার, মনে মনে বলল রিচার্ড।

পোয়ারোর এবার প্রকাশিত হওয়ার পালা। তিনি পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। মৃদু হেসে রিচার্ডের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

-আসুন মঁসিয়ে পোয়ারো, এনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই, রিচার্ড বলল আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক, ডঃ কেনেথ গ্রাহাম।

ডাক্তার ভদ্রলোক মাথাটা সামান্য সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে পোয়ারোকে অভিবাদন জানাল। এবার এগিয়ে গেলেন আর্মচেয়ারের কাছে, যেখানে মৃত স্যার ক্লড আধবসা অবস্থায় পড়ে আছেন। রিচার্ডও ডাক্তারের পাশে এসে দাঁড়াল।

পোয়ারো ওদিকে না গিয়ে ইচ্ছে করে তফাতে রইলেন। কফির কাপগুলো রাখা যে টেবিলে, তার সামনে চলে এলেন, কান তার সজাগ রইল, ওরা কি কথা বলাবলি করে, তা শুনতে হবে বৈকি।

পোয়ারো কফির কাপগুলোর ওপর নজর দিলেন। পাঁচটা কাপ, একটা উধাও।

ডঃ গ্রাহাম খুব মনোযোগ দিয়ে স্যার ক্লডকে দেখতে থাকলেন। গায়ে হাত না দিয়ে দূর থেকে যা যা ডাক্তারি নিরীক্ষা করা চলে, তাই করলেন। তারপর ঘাড় নাড়লেন, মুখে অসহায়তার ছাপ।

ডঃ গ্রাহাম শান্ত কণ্ঠে বললেন, পোয়ারো শুনতে পেলেন–দুঃখিত রিচার্ড, মৃত্যুজ্ঞাপক প্রমাণ পত্র এই মুহূর্তে আমি দিতে পারছি না।

-কেন? রিচার্ড কৈফিয়তের সুরে জানতে চাইল। সমস্যা কি? আচমকা হার্ট অ্যাটাকেই তো বাবার মৃত্যু হয়েছে, তাহলে কেন ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পারবে না?

-দেখ ভাই, তোমার মতে যা হার্ট অ্যাটাক, আমার কাছে তা নয়, ডঃ গ্রাহামের গম্ভীর কণ্ঠস্বর তোমার বাবার স্বাস্থ্য মোটেও খারাপ ছিল না, হার্টের অসুখেও ভোগেন নি, পরীক্ষা করে যা বুঝলাম, হার্ট ফেল উনি করেননি। মারাত্মক বিষাক্ত কিছু ওঁর শরীরে প্রবেশ করেছে, যার ফলে মৃত্যু।

ডাক্তার বলে চললেন–অতএব আমাকে নিশ্চিত হওয়ার জন্য মৃতদেহ মর্গে পাঠাতে হবে, জানতে হবে গত আট দশ ঘন্টায় ওনার পাকস্থলীতে কী কী প্রবেশ করেছে। এসব

করার আগে তুমি মৃতদেহ সৎকার করতে পারবে না, মাফ কর, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না। আসি।

ডঃ গ্রাহাম কথা শেষ করে ডাক্তারি ব্যাগটা হাতে তুলে নিলেন, গট গট করে চলে গেলেন দরজা পেরিয়ে বাইরে। রিচার্ড আর কি করবে? সে বোবার মতো অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ডঃ গ্রাহামের চলে যাওয়ার দিকে।

পোয়ারোর এখানে থাকার প্রয়োজন আপাতত মিটেছে, ওপরে যাবেন ভাবছেন, এমন সময় ট্রেডওয়েল বসার ঘরে এসে ঢুকল, বলল–স্যার, আপনাদের দু'জনের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সিঁড়ির ওপর দুটো ঘর, পাশাপাশি থাকবেন। আপনাদের রাতের খাবারও তৈরি, আসুন স্যার, খাওয়া-দাওয়া সেরে নিন।

–অনেক-অনেক ধন্যবাদ, ট্রেডওয়েল। পোয়ারো তাকে মনে করিয়ে দিয়ে বলল, রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে এঘরের দরজা জানালাগুলো পরীক্ষা করে নিও, ভালভাবে তালা এঁটে লাগিও, মনে থাকবে তত?

-আপনি ওসব নিয়ে চিন্তা করবেন না, স্যার। অনুগত ভৃত্যের মতো ট্রেডওয়েল বলল, আমি রাতে বিছানায় যাবার আগে সবকটা দরজা জানলা ভালভাবে এঁটে দেব। এবার ডিনার হলে চলুন।

-আচ্ছা চল, বাঁকা চোখে রিচার্ডকে একবার লক্ষ্য করে পোয়ারো বসার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, সামনে চলেছে বাটলার ট্রেডওয়েল, গন্তব্য ডিনার হল।

.

০৮.

রাতে বিছানায় গেলেন এরকুল পোয়ারো। পরম সুখে নিদ্রা গেলেন। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল। প্রাত্যহিক কাজ সেরে ফাস্ট টেবিলে এসে বসলেন–অবাক হলেন, টেবিল খালি, কেউ কোথাও নেই। পোয়ারো নিজের মনে ব্যাপারটা ভাববার চেষ্টা করলেন।

এমন সময় ট্রেডওয়েল এসে ঢুকল, হাতে কফির ফ্লাস্ক আর পোয়ারোর জন্য ব্রেকফাস্ট।

পোয়ারো ফিসফিসিয়ে জানতে চাইলেন–কাউকে তো দেখছি না, পরিবারের সকলের টি ব্রেকফাস্ট সারা হয়ে গেছে, আমার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করবে না বলে সকলে দলবদ্ধ হয়েছে।

-ঠিক ধরেছেন, স্যার। কফির ফ্লাস্ক-টেবিলে নামিয়ে রেখে, নীচুস্বরে ট্রেডওয়েল বলল– আজ সকলের আগে ব্রেকফাস্ট সেরেছেন সেক্রেটারি এডওয়ার্ড রেনর, তারপর স্টাডিতে ঢুকতে দেখেছি। রিচার্ড দম্পতি ঘুম থেকে উঠে পড়লেও বাইরে বেরোননি, এই তো একটু আগে ওদের ঘরে ব্রেকফাস্ট দিয়ে এলাম। মিস ক্যারোলিন অ্যামরিও তাই করেছেন, নিজের ঘরে বসেই জল খাবার খেয়েছেন। এপরিবারের আর একজন আছেন, স্যারের ভাইঝি মিস বারবারা অ্যামরি। তিনি সোজা রান্না ঘরে এসে দুটো সেদ্ধ ডিম আর দুটো টোস্ট নিজে হাতেই বানিয়ে নিয়েছেন, আমাকে কেবল তিন কাপ কফি করে দিতে বললেন, আমি কফি তৈরি করে ফ্লাস্কে ভরে দিতে উনি সবকিছু নিয়ে বাড়ি থেকে

বেরিয়ে বাগানে চলে গেলেন। পুরনো খবরের কাগজ বিছিয়ে নিয়ে একা একা ব্রেক ফাস্ট করছেন।

দোতলায় একটা ঘর ক্যাপ্টেন হেস্টিংসকে দেওয়া হয়েছে। সকালের আলো এসে ঘরে ঢুকল, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস চোখ মেললেন। বিছানা লাগোয়া ঘোট টেবিলে সকালের রাত টাইমস পত্রিকা দেখে তিনি খুশি হলেন, ট্রেডওয়েলই যে এসব ব্যবস্থা করে গেছে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ঘরের বাইরে সরু একফালি ব্যালকনি, সেখানে একটা আরাম কেদারা রয়েছে। ক্যাপ্টেন হেস্টিংসের মন খুশিতে নেচে উঠল। তিনি বিছানা ত্যাগ করলেন। চোখে মুখে জল দিলেন। আরাম কেদারায় এসে বসতে গিয়ে বাধা পেলেন। অল্প কিছু দূরে একটা গাছের নীচে গিয়ে চোখের দৃষ্টি আটকে গেল–হ্যাঁ, বারবারাই, নিঃসঙ্গ বসে ব্রেকফাস্ট সারছে।

এমন সময় ট্রেডওয়েল এ ঘরে এসে ঢুকল। সকালের চায়ের কাপটা নিয়ে যাবে বলে। তা দেখে ক্যাপ্টেন হেস্টিংস বললেন–ট্রেডওয়েল, ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি বরং আমার খাবারটা এখানেই দিয়ে যাও।

–বেশ, যেমন বলবেন, ট্রেডওয়েল লক্ষ্য করল, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস অপলক চোখে বারবারাকে লক্ষ্য করছেন, মজা বোধ করল সে, মনে মনে খানিক হেসে নিল।

শোনো, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস ঘাড় ঘুরিয়ে ডাকলেন ট্রেডওয়েলকে, মানে, বলছিলাম কি, আজকের জলখাবারে কি কি পদ আছে।

আজ্ঞে, আছে টোস্ট, ডিমের পোচ, বেকন ভাজা আর কফি। আপনি এখানেই বসুন, সব তৈরি আছে, নিয়ে আসতেই যা দেরি।

ট্রেডওয়েল চলে যেতে ক্যাপ্টেন হেস্টিংস খবরের কাগজ হাতে নিয়ে আরাম কেদারায় বসলেন। কিছুক্ষণ বাদেই ট্রেডওয়েল এসে ঢুকল, ব্রেক ফাস্ট চিলতে সরু টেবিলের ওপর সাজিয়ে দিল।

–মশিয়ে পোয়ারোর কি খবর? কোন হাঁকডাক শুনতে পাচ্ছি না, হাসতে হাসতে ক্যাপ্টেন হেস্টিংস জানতে চাইলেন, এখনও ঘুম ভাঙেনি, নাকি ঘরের মধ্যে বসে আছেন?

সেসব কিছুই না, স্যার। ট্রেডওয়েল স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে চলল, উনি অনেকক্ষণ আগে বিছানা ত্যাগ করেছেন। ব্রেক ফাস্ট সেরে এই একটু আগে গ্রামের দিকে গেলেন, কি যেন দরকার আছে।

-হুম, একটা গম্ভীর আওয়াজ করলেন ক্যাপ্টেন হেস্টিংস। দেখলেন, বারবারার কফি পান এখনও চলছে। তিনি এবার খবরের কাগজে মন দিলেন। স্যার ক্লড অ্যামরির মৃত্যু সংবাদ নিশ্চয়ই কাগজে ছাপা হয়েছে–শোকসংবাদ কলমে চোখ বোলালেন, না, কিছুই বেরোয়নি। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়তে শুরু করলেন। খানিকবাদে তার তন্দ্রা এল দু'চোখের পাতায়, ঢুলে পড়লেন, চোখ মেলার চেষ্টা করলেন, ধীরে ধীরে হাত থেকে খবরের কাগজটা আপনা-আপনি পড়ে গেল, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর খেয়াল নেই, তিনি তখন নরম রোদের আভা লাগিয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছন।

এর পর কেটে গেল প্রায় তিরিশ মিনিট।

-বাঃ, দারুণ। এই সাত সকালে খবরের কাগজ ছেড়ে দিয়ে কিভাবে যে মানুষ ঘুমোয় জানি না।

পরিচিত কণ্ঠস্বর। ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে তাকালেন, দেখলেন, একটু দূরে দাঁড়িয়ে এরকুল পোয়ারো, ঠোঁটে স্মিত হাসি।

-কে বলল, আমি ঘুমোচ্ছি! ক্যাপ্টেন হেস্টিংস মৃদু প্রতিবাদ করে বললেন, আমি ঘুমোইনি, আসলে ব্রেকফাস্ট সেরে কাগজে চোখ রেখে ভাবছিলাম, কাল সন্ধ্যে থেকে অব্দি এখানে যা যা দেখেছি, সেইসব ঘটনা পরম্পরা হয়তো বা তন্দ্রা লেগেছিল একটু।

-তন্দ্রা আসতেই পারে, এ অস্বাভাবিক কিছু নয়। পোয়ারো বললেন, শুধু স্যার ক্লডের খুন নয়, ওই সঙ্গে ওঁর ফর্মুলা চুরির ব্যাপারটাকেও মাথায় রাখতে হবে, হেস্টিংস প্রথমটার মতো দ্বিতীয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

-তাইতো, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস জানতে চাইলেন, কতটা কাজ হল?

–সামান্যই, একজনকে আমি সন্দেহ করছি, জানি না ঠিক কিনা। পোয়ারো বলতে থাকলেন। সন্দেহটাকে মজবুত করার জন্যই গ্রামে গিয়ে ছিলাম একা। দেরি নেই, মনে হয় টেলিফোন মারফত খবর আসবে। তখন বলা যাবে, ঠিক পথে এগোচ্ছি কিনা।

–দোষী বলে কাকে তোমার মনে হচ্ছে পোয়ারো? ক্যাপ্টেন হেস্টিংস জানতে চাইলেন।

–ধীরে বন্ধু, ধীরে, পোয়ারো সামান্য হেসে জবাব দিলেন–এ বড় প্যাচানো গেরো, আনমনে দূরের দিকে তাকালেন। গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি চলে গেল অনেক দূর, বললেন, খোলার উপায় তাড়াতাড়ি বলা যাবে না। তুমি বরং চোখ কান খুলে রেখে সব কিছু শুনে যাও, ক্যাপ্টেন, এ এক ম্যাজিক, বুঝেছ।

পোয়ারো আবার হাসলেন–বাদ দাও এসব কথা। শোনো বন্ধু, আজ দুপুরে স্যার ক্লড অ্যামরির ছেলে রিচার্ড অ্যামরিকে দেখা করতে বলেছি। ওইসময় নীচের লাইব্রেরী ঘরে থেকে আমায় সহায়তা করো। চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হল। তোমার কাজ, মনে থাকে যেন।

নিশ্চয়ই, পোয়ারো। আমি সর্বদা তোমার পাশে আগেও ছিলাম, এখনও আছি, পরেও থাকব।

.

কিছুক্ষণবাদে কয়েকজন লোক এল স্থানীয় করোনারের মর্গ থেকে। ডঃ গ্রাহামের নির্দেশে তারা এসেছে, স্যার ক্লড অ্যামরির মৃত দেহ নিয়ে তারা চলে গেল।

এরকুল পোয়ারো ও তার সহকারী লাঞ্চে বসে বিশেষ কিছুই খেতে পারলেন না, কারণ ব্রেকফাস্টেই পেট ভরা ছিল। অতএব সামান্য একটু চিকেন সুপ আর টোস্ট খেয়ে টেবিল থেকে উঠে এলেন।

দুপুরের খাওয়া সেরে পোয়ারো সোজা নীচে নেমে এলেন, সঙ্গে বন্ধু ক্যাপ্টেন হেস্টিংস। তারা এসে ঢুকলেন লাইব্রেরিতে।

কিছুটা সময় কেটে গেল। দেখা গেল রিচার্ড অ্যামরিকে। পোয়ারোর কথা মতো সে এসে ঢুকল লাইব্রেরিতে। আজ সকাল পর্যন্ত যে আরাম কেদারায় স্যার ক্লডের দেহ পড়েছিল, সেখানে রিচার্ড বসল স্বাভাবিক ভঙ্গিতে, পোয়ারো একটা চেয়ার টেনে তার উল্টোদিকে বসলেন, কাপ্টেন হেস্টিংস সামান্য দূরে একটা চেয়ার দখল করলেন। ওদের আলোচনায় যোগ দিলেন না বটে, কিন্তু কান থাকল ওদের কথার দিকে।

পোয়ারো প্রথম কথা বলতে শুরু করলেন–মঁসিয়ে অ্যামরি, তিনি রিচার্ডের দিকে সরাসরি স্পষ্ট চোখে তাকালেন, আমি এখানে আসার আগে যা ঘটেছিল তা আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই, এমনকি স্যার ক্লড কি করেছিলেন, তার মানে আপনি যা দেখেছেন, আপনার সঙ্গে তিনি কি কি কথা বলেছিলেন, সব আমায় পরপর বলুন। তবে হ্যাঁ, কোন কিছু গোপন রাখার চেষ্টা করবেন না।

গতকাল রাতে রিচার্ডকে যেমন অস্বাচ্ছন্দ্য দেখা গিয়েছিল, আজ তার উল্টো ঘটনা। এমনকি পোয়ারোর সঙ্গেও তুলনামূলকভাবে ভাল ব্যবহার করছে। পোয়ারো এখানে পৌঁছবার আগে যা যা ঘটে ছিল, এমনকি তার বাবা তাকে কি বলেছিল, সব রিচার্ড শুনিয়ে দিল। তার কথাবার্তায় এতটুকু অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ল না। পোয়ারো কঠিন মুখে নিবিষ্ট চিত্তে নীরবে সব শুনলেন।

রিচার্ডের কথা বলা এক সময় শেষ হল। সে জানতে চাইল, বলুন মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনাকে আশা করি সব ঠিকঠাক বোঝাতে পেরেছি?

নিশ্চয়ই, মাসিয়ে অ্যামরি। চেয়ারে হেলান দিয়ে পোয়ারো নড়েচড়ে বসলেন, আপনার বলা ঘটনাগুলো এখন পরস্পর ছবির মতো আমার চোখের সামনে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। এই তো, স্যার ক্লড অ্যামরি ওই আরাম কেদারায় বসেছিলেন, এখন আপনি যেটাতে বসে, তারপর একসময় সারা ঘর অন্ধকারে ডুবে গেল, বাইরে থেকে দরজায় ঢোকার শব্দ, আপনাদের কানেও গেল। সত্যি, এ এক নাটকীয় ক্ষণ স্বীকার করতেই হয়।

–তাহলে আমার কাজ শেষ, যা জানতে চেয়েছিলেন জানা হয়ে গেছে আপনার। আমি এখন

কথা বলতে বলতে রিচার্ড চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল।

পোয়ারো ইশারায় তাকে বসিয়ে দিলেন–আরে, বসুন, বসুন, আরও কিছু জানার আছে।

-বেশ বলুন, কি জানতে চাইছেন? রিচার্ড পা ছড়িয়ে আরাম করে বসল, যা-যা চেয়েছিলেন, সব তথ্য তো পেয়ে গেছেন।

-না, গতকাল সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি কি ঘটেছে, তা জানা বাকি থেকে গেছে। আমি বলতে চাইছি, ডিনারের ঠিক পরেই কি ঘটেছিল, বলুন।

–আচ্ছা বলছি, একটু হেসে রিচার্ড বলল, আসলে মামুলি ব্যাপার, তাই আপনাকে বলার প্রয়োজন করিনি। তবে আপনার না জানলেই যখন নয়, তখন বলছি, ডিনারের পরে আমরা সবাই এই বসার ঘরে এসে ঢুকি, আর বাবা তার সেক্রেটারি এডওয়ার্ড রেনরকে নিয়ে তার স্টাডিতে চলে গেলেন।

–তারপর আপনারা কি করলেন?

–কি আর করব, ডিনারের পরে যেমনটি হয়ে থাকে। সকলে মিলে হাসি ঠাট্টায় মেতে উঠলাম। মেয়েরা পরচর্চা পরনিন্দায় মেতে উঠল। আমার খুরতুতো বোন বারবারাকে তো দেখেছেন। বড্ড খেয়ালি। পুরনো আমলের গুচ্ছের খানেক রেকর্ড বের করল। ফক্সট্রট রেকর্ডটা পছন্দ হল। গ্রামোফোনে লাগিয়ে দিয়ে বাজনার তালে তালে নাচতে শুরু করে দিল। খানিকবাদে স্টাডি থেকে বেরিয়ে এডওয়ার্ড রেনর ওর নাচের সঙ্গী হল। ওরা একসঙ্গে নাচতে থাকে।

গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনা সেই সন্ধ্যায় কি ঘটেছিল? পোয়ারো সন্ধানী দৃষ্টিতে রিচার্ডকে জরিপ করতে লাগলেন, মনে করার চেষ্টা করুন, মঁসিয়ে অ্যামরি। দেখুন, তেমন কিছু বাদ চলে গেল কিনা।

না, মনে রাখার মতো কিছু ঘটেনি, রিচার্ড চটপট জবাব দিল, যা বললাম, ওই পর্যন্তই।

-ডিনারের কত পরে কফি পরিবেশন করা হয়েছিল?

–ডিনারের ঠিক পরেই।

–বাটলার ট্রেডওয়েল নিজে কফি তৈরি করে এনেছিল, নাকি জগ ভরতি কফি দিয়ে গিয়েছিল?

-মনে নেই।

–ঘরের সকলে কফি পান করেছিলেন?

পোয়ারোর প্রশ্নের জবাবে রিচার্ড তড়িঘড়ি জবাব দিল–হ্যাঁ, সকলেই তবে একজন ছাড়া এডওয়ার্ড রেনর, কফি ওর চলে না।

–আর আপনার বাবা? ওনার কফি কি স্টাডিতে দিয়ে আসা হয়েছিল?

-হ্যাঁ, তেমনই মনে পড়ছে এবার রিচার্ড সত্যিই বিরক্ত হল। জানতে চাইল, এসব সাদামাটা ব্যাপার শুনে আপনার কোন কাজে লাগবে?

-মঁসিয়ে অ্যামরি, বুঝতে পারছি, আপনি আমার ওপর চটে যাচ্ছেন। পোয়ারো একটু থামলেন–আসলে কি জানেন, আপনার মুখ থেকে শোনা ঘটনাগুলো আমার মনের ক্যানভাসে ছবি করে ধরে রাখতে চাইছি। তার চেয়েও জরুরি যেটা সেটা হল আপনার বাবার চুরি হয়ে যাওয়া ফর্মুলা উদ্ধার, আপনারা সকলে তো তাই-ই চান, নয় কি?

-মনে হয়। রিচার্ড অবহেলা ভরে উত্তর দিল। পরক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলল–হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই, আমরা সকলেই চাই ফর্মুলাটা ফেরত পেতে।

–বেশ, পোয়ারো খুশি মনে জানতে চাইলেন, স্যার ক্লড অর্থাৎ আপনার বাবা কখন। স্টাডি থেকে এঘরে এসে ঢুকেছিলেন?

-ওরা যখন দরজাটা খোলার চেষ্টা করছিল, তখন।

–ওরা, অর্থাৎ কারা?

ঘরের সকলে।

–কে প্রথম দরজা খুলতে চেয়েছিলেন, মনে আছে?

-মনে আছে, আমার স্ত্রী লুসিয়া, রিচার্ড বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করল, সমস্ত সন্ধ্যেটা ও অসুস্থ বোধ করছিল তাই।

উনি এখন কেমন আছেন? আশা করি গতকালের তুলনায় ভাল। পোয়ারোর কণ্ঠে সহানুভূতির ছোঁয়া তার সাথেও কয়েকটা কথা বলতে চাই।

-মনে হয় না, আপনার চাওয়া পূরণ হবে। ব্যস্ত হয়ে রিচার্ড জবাব ছিল–আজ সকাল থেকে মুখ টিপে বসে আছে, চেনা অচেনা কারো সঙ্গে একটি কথাও বলছে না। তার নীরবতার কারণও বলছে না। আমার মনে হয় না, এমন কোন প্রশ্নের উত্তর কেবল এর জানা আছে। আপনি বরং আমায় প্রশ্ন করুন। বলুন আর কি জানতে চান।

-বুঝেছি, পোয়ারো ঘাড় কাত করে বললেন–তবে কি জানেন মঁসিয়ে মেয়েদের একটা স্বভাব। যা পুরুষদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এমন অনেক ব্যাপার আছে, যা পুরুষদের

নজরে পড়ে না, অথবা পড়লেও গুরুত্ব দেয় না। ছাড়ুন ওসব কথা। আপনার পিসিমার খবর বলুন। প্রয়োজনে ওঁকেও আমি প্রশ্ন করতে পারি।

পিসিমার কথা কি আর বলব, মঁসিয়ে পোয়ারো। আমার মা গত হবার পর থেকে পিসিমাই আমাদের সংসারটাকে ধরে রেখেছেন। ভাইয়ের আচমকা মৃত্যু, কোন বোন সহ্য করতে পারে বলুন। গতকাল রাত থেকে বিছানাই হয়েছে তার পরম আশ্রয়। ট্রেডওয়েল বহুবছর ধরে এ বাড়িতে আছে। পিসিমার ভাবগতিক তার জানা আছে। সে জোর করে সকালের ব্রেকফাস্ট খাইয়ে দিয়ে এসেছে। লাঞ্চও তার ঘরে দিয়ে এসেছিল।

–এরকমই হবার কথা। পোয়ারো আবার ঘাড় নেড়ে রিচার্ডের কথায় সায় দিলেন।

আরাম কেদারা ছেড়ে রিচার্ড এগিয়ে গেল ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর দিকে। দুটোই বন্ধ। রিচার্ড বলল–ভেতরটা বড্ড গুমোট হয়ে আছে, বাইরের খোলা বাতাস ঢুকলে ভাল হয়।

এব্যাপারে আপনারা অর্থাৎ ইংরেজদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। পোয়ারো হাসতে হাসতে বললেন খোলাবাতাসকে বাইরে থাকতে দিতে আপনাদের আপত্তি। যে কোন উপায়ে ঘরের মধ্যে টেনে এনে তবেই শান্তি।

আমি যদি একটা জানলা খুলে দিই, আপনার অসুবিধা হবে, মঁসিয়ে পোয়ারো। রিচার্ড জানতে চাইল।

-না না, কখনো নয়। পোয়ারো রসিয়ে রসিয়ে বলতে লাগলেন বহু বছর আগে বেলজিয়াম থেকে লন্ডনে চলে এসেছি। সেই থেকে আপনাদের রীতিনীতি, আদব

কায়দাকে নিজের মতো করে মানিয়ে নিয়েছি। কিন্তু আপনি জানলা খুলবেন কি করে? শুনেছি আপনার বাবা বিশেষ ধরনের তালা-চাবি তৈরি করেছিলেন, যা ওই

পোয়ারোর কথা থামিয়ে রিচার্ড বলল–একদম ঠিক। বাবার চাবির আছে এখন আমার কাছে।

রিচার্ড এক থোকা চাবি নিজের জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করল, পোয়ারো আড়চোখে দেখলেন, এ সেই চাবির গোছা, যা তিনি গতকাল রাতে সবার অগোচরে মৃত স্যার ক্লডের ট্রাউজার্সের পকেট থেকে বের করেছিলেন।

রিচার্ড সেই চাবির থোকা থেকে একটা চাবি বের করে বিশেষ পদ্ধতিতে বন্ধ ফ্রেঞ্চউইন্ডো খুব সহজে খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ বাঁধ না মানা ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকে পড়ল।

-মঁসিয়ে পোয়ারো, রিচার্ড ঘুরে দাঁড়াল, আপনাকে আমার স্ত্রী গতরাতে এখানে থাকার অনুরোধ জানিয়েছিল, এই সমস্যা সমাধানের কথা বলেছিল, তবে কথা কি জানেন, ও মানসিক ভাবে অসুস্থ। ফিটের অসুখ আছে। সামান্য উত্তেজনার ঘটনা দেখলে ও আর ঠিক থাকতে পারে না, বেহুশ হয়ে পড়ে। ওই অবস্থায় কাকে কি বলছে বুঝতে পারে না। গতরাতের ব্যাপারটাও তেমনই। বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে বেচারি জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিল। ঘোরের বশে যা কিছু আপনাকে বলেছে, সে সম্পর্কে কোন ধারণা ওর ছিল না। তাই বলছি, ওর কথা বাদ দিন, আমি যা বলছি, সেটাই শেষ কথা বলে জানবেন।

রিচার্ড বলে চলল–বলতে আপত্তি নেই। আমার বাবার অর্থের অভাব ছিল না। প্রচুর সম্পত্তি রেখে গেছেন আমার জন্য। তাই হারিয়ে যাওয়া ফর্মুলা ফিরে পাওয়া গেল, কি গেল না তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। তবে স্বীকার করি, ওটার দাম প্রচুর। তবুও ওটা না পেলে আর্থিক ভাবে আমি পঙ্গু হয়ে পড়ব না। আমার চাওয়া খুবই ছোট। যেটুকু বাবা রেখে গেছেন, তাতেই আমি সন্তুষ্ট। তাছাড়া আমি মনে করি ধীরে ধীরে কত রকমের উন্নত অস্ত্র তৈরি হচ্ছে। বাড়তি কোন মারণাস্ত্র তৈরি না হলে দুনিয়ার কোন লোকসান হবে না। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, খোয়া যাওয়া ফর্মুলার পেছনে আর না ছুটে, এখানেই থেমে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। এতে সকলের মঙ্গল হবে।

–অর্থাৎ আপনি চাইছেন, আমি এখান থেকে বিদায় নিয়ে ঘরে ফিরে যাই, তাইতো? পোয়ারো ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন।

-ঠিক ধরেছেন। রিচার্ডের গলায় অস্বস্তি, আপনি কি সহজে আমার বক্তব্য বুঝে গেলেন বলুন তো। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, মঁসিয়ে পোয়ারো।

কিন্তু একটা সমস্যা থেকেই যাচ্ছে, পোয়ারো বলতে থাকলেন, ধরুন, আপনার সিদ্ধান্ত মেনে মাঝপথে তদন্তের কাজ থামিয়ে আমি ফিরে গেলাম, কিন্তু সেখানেই কি ব্যাপারটা থেমে থাকবে, মঁসিয়ে অ্যামরি? ব্যাপারটা যে কত দূর প্রসারতা লাভ করবে, তা আপনার ধারণার বাইরে। চুরি করা ফর্মুলা প্রচুর টাকার বিনিময়ে কোন বিদেশি রাষ্ট্রের হাতে চলে যাবে। ওই ফর্মুলা মাথায় রেখে একের পর এক ধ্বংসাত্মক পারমাণবিক বোমা তৈরি হবে। ব্যাপারটার গুরুত্ব নিশ্চয়ই এবার অনুধাবন করতে পারছেন?

-সত্যি, এতটা তলিয়ে দেখিনি স্বীকার করছি, কিন্তু তাহলে

গতকাল, সন্ধ্যের পর এঘরে মোট পাঁচজন উপস্থিত ছিলেন। তাদের প্রত্যেকেরই ফর্মুলাটা চুরি করার সুযোগ ছিল। অতএব সন্দেহ সকলের ওপর বর্তায়। সকলেই দোষী, যতক্ষণ না আসল দোষীকে সাব্যস্ত করা যাচ্ছে।

পোয়ারোর বক্তব্য রিচার্ডের কাছে পরিষ্কার হল না, সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

ঠিক এই সময় ঘরে এসে প্রবেশ করল বাটলার ট্রেডওয়েল। রিচার্ডের কাছে এগিয়ে এল মাপ করবেন, স্যার। ডঃ গ্রাহাম এসছেন, আপনাকে চাইছেন।

-বেশ, চল। রিচার্ড চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পেয়ারের দিকে তাকিয়ে বলল মঁসিয়ে পোয়ারো, কথার মাঝখানে চলে যেতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। ভাববেন না, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি আবার ফিরে আসছি।

দ্রুত পায়ে ঘর থেকে অদৃশ্য হল রিচার্ড অ্যামরি।

এরকুল পোয়ারো ও রিচার্ড অ্যামরির আলোচনা এতক্ষণ নীরবে শুনছিলেন ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, আর উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছিলেন। রিচার্ড বিদায় নিতেই সোফা ছেড়ে চলে এলেন পোয়ারোর সামনে।

–সমস্ত ঘটনাটা আমার কাছে জলের মতো হয়ে গেছে। স্যার ক্লডের বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে।

-কিছু বলছ নাকি, বন্ধু। আনমনে পোয়ারো বললেন।

ক্যাপ্টেন হেস্টিংস সহজ ভাবে বললেন বিষ খাইয়ে স্যার ক্লড অ্যামরিকে খুন করা হয়েছে, উদ্দেশ্য ফর্মুলা চুরি, আমি নিঃসন্দেহ।

.

০৯.

–জবাব নেই, সহকারীর দিকে তাকিয়ে পোয়ারো হেসে উঠলেন, কি তাড়াতাড়ি তুমি কেমন সমস্যাটা সমাধান করে দিলে। তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না, আমার যদি তোমার মতো একটু মগজ থাকত। স্বীকার করছি, ভায়া, তোমার উজ্জ্বল সিদ্ধান্ত তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

–আমার সঙ্গে মজা করছ? হেস্টিংসয়ের গলায় মেজাজি সুর, আমি একশো শতাংশ নিশ্চিত যে, তুমিও খুব ভালভাবে বুঝতে পারছ, স্যার ক্লডের মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়। এমনকি ওঁর ছেলে রিচার্ডের কথাই ধরো না। যখন ডঃ গ্রাহাম মৃতদেহ পরীক্ষা করে বললেন, ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, তখন রিচার্ডের পিলে চমকে উঠেছিল। সেও ষোলো আনা নিশ্চিত, তার বাপ হার্ট ফেল করেনি, অতএব পোস্ট মর্টেম করতে বাধা দেয়নি।

-আমি স্বীকার করি, চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল পোয়ারোর বুক থেকে। দেখ, গ্রাহাম এখন এসেছেন ওই পোস্ট মর্টেমের রিপোর্ট জানাতে।

পোয়ারো এখানেই কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। ধীর পায়ে ফায়ার প্লেসের কাছে চলে এলেন। বড় ফুলদানিটা গড়িয়ে পড়েছে, মোম, নানা মাপের কাগজের টুকরো ম্যান্টেলপিসের ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে, ফায়ারপ্লেসের কাঠে আগুন ধরানোর জন্যই ওগুলো রাখা।

পোয়ারো বস্তুগুলো এক জায়গায় গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন। সেদিকে নজর রেখে ক্যাপ্টেন হেস্টিংস বললেন, সত্যিই পোয়ারো, তোমার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রশংসার দাবি রাখে। কেমন সুন্দর সব গুছিয়ে রাখছ বল তো।

-চুপ, চুপ, পোয়ারো মুখে আঙুল তুলে বললেন, সব কিছুর ঊর্ধে সদৃশতার অবস্থান। এমনকি মগজের প্রতি কোষও, পরিচ্ছন্ন আর শৃঙ্খলা বজায় না থাকলে সেখানে সাদৃশতার প্রকাশ ঘটবে কি করে? নিজের টাক মাথায় আলতো টোকা দিয়ে পোয়ারো বললেন।

তোমার চিন্তা যে কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে, তা আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না, ক্যাপ্টেন স্মিত হেসে জানতে চাইলেন, তোমার সাথে আমার নতুন পরিচয় হয়নি। অতএব ঝেড়ে কাশো, আসল ঘটনাটা আমাকে স্পষ্ট করে বল।

–আমি শোনাব। তা তোমার মগজের কাজ কি, বন্ধু! নিজের মাথাটা ইশারায় দেখিয়ে পোয়ারো বললেন, এই যে ঘাড়ের ওপর এটা, ঈশ্বরের দান, বয়ে বেড়াচ্ছি সকলে, এটার দাম কি?

কথা থামিয়ে দিলেন পোয়ারো, চোখ দুটো কুঁচকে ছোট হল, যেন ঝিমধরা বেড়াল। প্রসঙ্গ পালটে পোয়ারো বললেন–ডঃ গ্রাহাম যে কোন সময় এঘরে চলে আসতে পারেন, রিচার্ড বাদ যাবে না। বরং এস, এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে নিজেদের একবার ঝালিয়ে নিই, যা যা অস্বাভাবিক ঠেকছে সে সম্পর্কে আলোচনা আর কি!

–গত রাতে এ বাড়িতে আমরা আসার আগে বাড়ির সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল, হেস্টিংস বলে চললেন, স্যার ক্লড বসেছিলেন ওখানে, ইঙ্গিতে আর্মচেয়ারটি দেখিয়ে দিলেন, তখনও মারা যাননি তিনি। নিঃসীম অন্ধকারে এঘর তখন ঢেকে আছে, যেভাবেই হোক একটা চেয়ার উলটে গেল, ওটাতে স্যার ক্লডের সেক্রেটারি এডওয়ার্ড রেনর বসেছিল, ওই চেয়ারের নীচে থেকে একটা চাবি তুমি পেয়েছিলে, যার সাহায্যে স্যার ক্লডের সিন্দুকের তালা সহজে খোলা সম্ভব হয়। ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে, ওই ইটালিয়ান ডাক্তার, কারোলিই হল এই ঘটনার মূল পাণ্ডা। ওকে আমি সবচেয়ে বেশি সন্দেহ করি।

–ডঃ কারোলি, তাই না? পোয়ারোর আনমনে বলে উঠলেন, ওই লোকটাকে আমারও রহস্যজনক বলে মনে হয়।

–তা নয়, তো কি? হেস্টিংস জোরালো কণ্ঠস্বরে বলতে লাগলেন–লোকটা এতদূরে গ্রামের ভেতরে এসে ঢুকেছে। এটা এক বিখ্যাত বিজ্ঞানীর বাড়ি, ওর ডাক্তারির জায়গা নয়। এখানে ওর কি কাজ থাকতে পারে বলে তোমার মনে হয়, পোয়ারো? স্যার ক্লডের ওই বিধ্বংসী ফর্মুলা হাতিয়ে নেবার জন্য অনেক শক্তিশালী রাষ্ট্রই চেষ্টা করছে, ওরা

আমাদের কোন দেশের গুপ্তচর হয়ে এখানে এসে সেঁধিয়েছে। মূল্যবান ফর্মুলা হাতিয়ে নেওয়াই ওর কাজ, বুঝেছ?

-বুঝলাম, পোয়ারো সামান্য হাসলেন, বাঃ অনেকদিন পর এমন একটা নিখুঁত সিনেমার গল্প শুনলাম। আমি কচ্চিৎ কদাচিত সিনেমা দেখতে যাই, জান তো তুমি।

–স্যার ক্লডকে সত্যিই বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে, এটা একবার প্রমাণ করতে পারলে, ডঃ কারোলি তাহলে থাকবেন সন্দেহ ভাজন তালিকায় সবার ওপরে। তোমার নিশ্চয়ই সেই প্রাচীন কাহিনীর কথা মনে আছে বিষপাথর বসানো আংটির গল্প।

বিষক্রিয়াজনিত হত্যার ঘটনা ইটালির জনজীবনে ভুরি ভুরি ঘটেছে। কিন্তু আমার মনে আশঙ্কা কি জান, ধরা পড়ার আগে চোর বামাল সমেত উড়ে না যায়।

বন্ধু, এমন আশঙ্কা কর না। হেস্টিংস জোর দিয়ে বলল কখনো পালিয়ে যাবার সাহস ডঃ কারোলি কখনো দেখাবেন না।

–এত জোর দিয়ে বলার কারণ? ভুরু কুঁচকে পোয়ারো জানতে চাইলেন।

বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। পোয়ারোর জবাবে হেস্টিংস বললেন–কারণ, আমিও সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিত নই। তবে জেনো, ফর্মুলা চুরির ব্যাপারটা আমার মগজকেও তোলপাড় করে তুলেছে।

–আচ্ছা হেস্টিংস, ফর্মুলাটা কোথায় এখন রাখা আছে বলে তোমার মনে হয়?

–বলতে পারছি না।

–ভায়া, মাথাটাকে কাজে লাগাল। মৃদু হেসে পোয়ারো জবাব দিলেন–ওটা একটা জায়গাতেই আছে।

–কোথায়?

–এই ঘর, পোয়ারো বললেন, এ ব্যাপারে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত। এ ঘরের বাইরে এখনো ওটা যায় নি।

-কি বলছ হে?

–হ্যাঁ, ঠিক তাই। পোয়ারোর মুখ কঠিন হল। আমরা যা জেনেছি বা দেখেছি, সবটা পরপর সাজালে কেমন হয়? ট্রেডওয়েলের কাছ থেকে জানা গেছে, ফর্মুলা চুরি হওয়ার আশঙ্কায় স্যার ক্লড অ্যামরি নানারকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এই ঘরের ভেতরটা সুরক্ষিত করার জন্য তিনি নিজে বিশেষ ধরনের তালা আবিষ্কার করেছিলেন, যাতে অন্য কেউ সহজভাবে ওই তালা না খুলতে পারে। সেইমতো ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দুটো বিশেষভাবে তালা এঁটে দিয়েছিলেন, যার চাবি পাওয়া গেছে ওনার চাবির গোছায়। আমরা এখানে পৌঁছনোর আগেই চোর কম্মটি সেরে ফেলেছিল, আমার ধারণা। স্যার ক্লডের মনে সন্দেহ হওয়াতে সিন্দুক খোলেন এবং দেখেন ফর্মুলাটি হাওয়া হয়ে গেছে। তিনি নিশ্চিত বুঝতে পেরেছিলেন যে, ফর্মুলা-চোর এই ঘরেই পরিবারের সকলের মধ্যে মিশে আছে। কথাটা তিনি গোপন না রেখে ফাঁস করে দিয়েছিলেন।

পোয়ারো চোখ বুজে বলে চললেন–এতদূর পর্যন্ত ঠিক আছে। এরপরে প্রশ্ন হল, চুরি করা জিনিসটা কোথায় গেল? অনুমান করা যেতে পারে, স্যার ক্লডের নির্দেশ মেনে অন্ধকার ঘরের মধ্যে তার সামনের টেবিলে ওটাকে রেখে দেওয়া, দ্বিতীয়ত ফর্মুলা চোর আঁধারের সুযোগ নিয়ে অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারে। তবে প্রথম পথে চোর যায়নি, তা আমরা নিশ্চিত। রইল খোলা দ্বিতীয় পথ। অতএব আমি জোর গলায় বলতে পারি, ওই ফর্মুলা এই ঘরের কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

–পোয়ারো, তোমার কথাকেই আমি সমর্থন করছি। তাহলে আর দেরি কেন, উত্তেজিত হেস্টিংস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, এস, কাজে লেগে পড়ি।

-সত্যিই যদি ইচ্ছে হয়, তাহলে খোঁজার কাজে হাত লাগাও। ওটা খুঁজে বের করতে তোমায় যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে, সময়ও লাগবে। কিন্তু আমি একজনকে জানি, পোয়ারোর ঠোঁটে রহস্যপূর্ণ হাসি, যে তোমার চেয়ে কম সময়ে ও কম পরিশ্রমে চট করে দিতে পারে।

–কে সে? হেস্টিংস উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইলেন।

–যে চুরি করে ফর্মুলাটা লুকিয়ে রেখেছে, সে। চুরি করা ও লুকিয়ে রাখার মধ্যে একজনেরই হাত আছে। গম্ভীর মুখে পোয়ারো তার গোঁফ জোড়াকে আদর করতে লাগলেন, বোঝা গেল, তিনি এখন তার পুরনো মেজাজে ফিরে এসেছেন।

এর পরের কথা......

–হ্যাঁ, এর পরের কথা হল, চোরবাবাজী আজ-কালের মধ্যেই জিনিসটা এ ঘর থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করবে। তাই আমাদের সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। এই ঘরের ওপর নজরদারি চালাতে হবে আমাদের যে কোনো একজনকে।

এই সময় লাইব্রেরির দরজা ভেতর থেকে খুলে গেল, অবশ্য একটুও শব্দ না করে। পোয়ারো সচকিত হলেন। পোয়ারোর ইঙ্গিতে ক্যাপ্টেন গ্রামোফোনের আড়ালে চলে গেলেন।

ঘরে যে ঢুকল, তাকে দেখার জন্য পোয়ারো বা তার সঙ্গী প্রস্তুত ছিলেন না। তারা নজর রাখলেন। দেখলেন, মিস বারবারা অ্যামরি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এল বইয়ের তাকের কাছে। চেয়ারে উঠে দাঁড়াল, এবার হাত বাড়িয়ে টিনের কালো বাক্সটা নামানোর চেষ্টা করল, যাতে ওষুধপত্রগুলি আছে।

সময় হয়েছে বুঝে পোয়ারো ফাঁচ করে হেঁচে উঠলেন। বারবারা চমকে উঠল। তার হাত থেকে সশব্দে টিনের বাক্সটা মেঝেতে এসে পড়ল।

বারবারা ঘাবড়ে গেল–ও আপনি, মঁসিয়ে পোয়ারো নিজেকে সামলে নিল, ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল, আপনাকে এখানে দেখতে পাব, আশা করিনি।

ক্যাপ্টেন হেস্টিংস এবার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। হাসতে হাসতে মেঝে থেকে টিনের বাক্সটা তুললেন।

–কিছু মনে করবেন না, মাদমোয়াজেল, পোয়ারো বললেন, ভারী টিনের বাক্সের ভার আপনি সহ্য করতে পারেন নি, তাই হাত ফসকে পড়ে গেছে। বাক্সটা টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বললেন, আরে, এটার তো বেশ ওজন, কী রেখেছেন এতে? পাখির বাসা, নাকি সমুদ্র থেকে কুড়িয়ে আনা ঝিনুকের খোলা?

-না না, ওসব কিছু নয়, সামান্য কিছু ওষুধপত্র আছে মাত্র। বারবারা জবাব দিল।

–কিন্তু মাদাম, আপনার স্বাস্থ্য তো বেশ ভালোই দেখছি, কেমন উজ্জ্বল, তাহলে এইসব ছাইপাঁশ বাক্সবন্দী করে রেখেছেন কেন?

-না না, আমার জন্য নয়। বারবারা বলে চলল–এগুলো লাগে রিচার্ডের বউ লুসিয়ার। শুনেছেন তো, ওর একটা অসুখ আছে, যখন তখন জ্ঞান হারায়, একবার মাথা ধরলে আর রক্ষে নেই। ওর কথা ভেবেই এসব ওষুধ। বেচারী লুসিয়া, আজ সকালেও মাথা যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছে।

-ও, তাই বুঝি আপনি ওর জন্য মাথা যন্ত্রণার ওষুধ নিতে এসেছেন?

–হ্যাঁ, বারবারা বলল। অ্যাসপিরিনের বড়ি আমার কাছে দুটো ছিল, ও খেল, তবুও মাথা যন্ত্রণা কমেনি, বুঝলাম, আরও কড়া ওষুধ চাই। তাই গোটা বাক্সটাই নিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আপনারা যে এখানে ঘাপটি মেরে বসে থাকবেন, তা আগে বুঝতে পারিনি।

টিনের বাক্সের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে পোয়ারো জানতে চাইলেন তার মানে আপনার ওষুধের বাক্স নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক? আমি তো বুঝতে পারছি না।

-কী বলি আপনাকে? সামান্য শরীর খারাপ হলেই হল, ওষুধ খুঁজতে চলে আসে এই ঘরে, সব্বাই, কেউ বাদ নেই। এমনকি পিসিমা বা ওই রিচার্ড। ওরা বাক্সের ওষুধের শিশিগুলো ঘাঁটা ঘাঁটি করে, লন্ডভন্ড করে যাচ্ছেতাই করে রাখে।

মাদাম, চোখের ইঙ্গিতে বাক্সটা দেখিয়ে পোয়ারো বললেন, বাক্সটা দেখেছেন, একটুও ধুলো ময়লা নেই, তাই কিনা? আপনাদের বাড়ির কাজের লোকদের রোজ কত খাটতে হয় বলুন তো। যখন তখন চেয়ার টেনে উঠে দাঁড়াতে হয়, অত উঁচুতে বাক্স, ধুলো ময়লা পরিষ্কার করা কম ঝামেলা বলুন।

-মঁসিয়ে পোয়ারো, সত্যিই তাই। বারবারা খুশি মনে বলল–তাইতো গতরাতে এটা পরিষ্কার দেখেছি।

–গত রাতে এই ঢাউস বাক্সটা নামিয়ে ছিলেন নাকি?

পোয়ারোর প্রশ্নের উত্তরে বারবারা বলল–হ্যাঁ, ডিনারের পরে। হাসপাতালের যত পুরোনো ওষুধে এটা বোঝাই।

–দেখি, দেখি, কী কী ওষুধ আছে। কথা শেষ করে পোয়ারো বাক্সটা সামান্য টেনে নিয়ে ঢাকনা খুলে ফেললেন, একটা একটা করে কতগুলো শিশি তুলে ধরলেন, শিশির গায়ে

কাগজে সাঁটা ওষুধের নাম দেখে তার চক্ষু চড়কগাছ, বিস্মিত হলেন–আরে এসব কী দেখছি–স্ট্রিকনিন অ্যাট্রোপিন...... আর এটা? ওষুধের টিউবটা সামনে তুলে নিয়ে আঁতকে উঠলেন, সর্বনাশ, এ তো যেমন তেমন ওষুধ নয়–হিস্কোসিন হাইড্রোক্সোমাইট, অবশ্য সামান্য ওষুধ, রয়েছে টিউবে। বাঃ, মানুষ খুন করার সরঞ্জাম দেখছি থরে থরে সাজানো।

-কী বলছেন, মঁসিয়ে পোয়ারো, বারবারা অবাক চোখে পোয়ারোর হাতে ধরা ওষুধের টিউবের দিকে তাকাল–গতরাতেও এটাকে ভরতি দেখেছি, ফাঁকা কেন।

বাঃ, ভারি মজার ব্যাপার। পোয়ারো নিজের মনেই উচ্চারণ করলেন। তারপর জানতে চাইলেন–আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, গতরাতে এই শিশিটায় ওষুধ ছিল। মাদামোয়াজেল, আপনার কি মনে আছে গত রাতে এই ওষুধের শিশিগুলো কোথায় ছিল?

বাক্সটা এই টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখা হয়েছিল। ডঃ কারোলি এক একটা শিশি তুলে ধরে লেবেলে চোখ বুলিয়ে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে ওষুধের নাম ও কার্যকারিতা সম্পর্কে বলছিলেন।

বারবারা নিজেকে আর সামলে রাখতে পারল না, তার চোখ ফোটে জল গড়িয়ে পড়ল।

এমন সময় ঘরে লুসিয়ার প্রবেশ ঘটল, পোয়ারো আর তার বন্ধুকে এঘরে এসময়ে দেখবে, তা ছিল লুসিয়ার ধারণার বাইরে। তাই সে ওদের দেখে হকচকিয়ে গেল।

লুসিয়াকে দেখে বারবারার কান্না উঠে গেল। সে তখন লুসিয়াকে সামলাতে ব্যস্ত, যা বোকা ক্যাবলা মেয়ে, পোয়ারোর মতো ধুরন্ধর গোয়েন্দা যদি একটু চাপ দেয় তাহলে লুসিয়ার পেট থেকে হুড়হুড় করে সব বেরিয়ে আসবে। কোনো অপ্রিয় সত্য কথা বলে ফেললে সর্বনাশ। তাই সে স্নেহ ভরে ভাইয়ের কাঁধে হাত রেখে মৃদু স্বরে বলল–সকাল থেকে যন্ত্রণায় মাথা তুলতে পারছ না, অথচ লাইব্রেরিতে ছুটে এলে, আমি তো যাচ্ছিলাম তোমার কাছে, তর সইল না বুঝি।

-এখন আমি একটু ভালো আছি, বারবারা। পোয়ারোর দিকে তাকাতে তাকাতে বলল– তাছাড়া মঁসিয়ে পোয়ারোর সঙ্গে দরকার ছিল। তাই আসতে হল এখানে।

বেশ তো, পরে বললেই তো হয়, তাই না?

দয়া করো বারবারা, লুসিয়ার কণ্ঠে বিরক্তি, আর তোমাকে আমার জন্য ভাবতে হবে না।

-তাই বুঝি? বেশ, যা মন চায় করো।

লুসিয়ার মন্তব্য শুনে বারবারা খুশি হতে পারেনি, বোঝা গেল তার হাঁটা দেখে। সে চলে যাবার জন্য দরজার দিকে এগিয়ে এল। পোয়ারো দরজাটা খুলে দিলেন। বারবারা বেরিয়ে যেতে যেতে পেছন ফিরে তাকাল, তারপর চলে গেল।

দরজাটা এঁটে বন্ধ করে পোয়ারো লুসিয়ার দিকে এগিয়ে এলেন।

-মঁসিয়ে পোয়ারো..... লুসিয়া কী যেন বলতে গিয়েও বলতে পারছে না।

লুসিয়ার মনের ভয় ও সঙ্কোচ দূর করার জন্য পোয়ারো বললেন মাদাম, বলুন, আপনি কী বলতে এসেছেন। সঙ্কোচ করবেন না, বলুন।

-হ্যাঁ, এই তো বলছি–লুসিয়ার গলা তখন কাঁপছে উত্তেজনায়। তারপর কেটে বলল– আপনাকে আমিই এ বাড়িতে থেকে যাবার জন্য গত রাতে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু আজ সকালে সে ভুল আমার ভেঙে গেছে। ওইভাবে আপনাকে অনুরোধ উপরোধ করা উচিত হয়নি আমার।

-সত্যি বলছেন, মাদাম।

–ষোলো আনা সত্যি। লুসিয়া বলে চলল–আসলে গত রাতের ওই আকস্মিক পরিস্থিতিই এর জন্য দায়ী। বিশ্বাস করুন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি কেমন ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, তাই কী বলতে কী বলে ফেলেছি, আজ আমার ভুল ভেঙেছে। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, যা কিছু বলেছিলাম, তা মনে না রেখে এখান থেকে চলে যান, তাতে সকলের মঙ্গল হবে।

–এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল, কেন আপনি আমার কাছে এসেছেন?

-বুঝতেই যখন পেরেছেন, তাহলে আর দেরি কেন? লুসিয়া ভীত চোখে পোয়ারোর দিকে তাকাল আজই এ বাড়ি ছেড়ে নিজের জায়গায় ফিরে যান।

–আপনি কী করে ভাবলেন, আপনার কথা আমি মেনে নেব। পোয়ারো স্থির চোখে লুসিয়ার দিকে তাকালেন, গলার পর্দা একটু চড়ল–গত রাতে আপনিই আমাকে আপনার

শ্বশুর স্যার ক্লড অ্যামরির মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয় বলে জানিয়ে ছিলেন, খেয়াল আছে। নিশ্চয়ই।

-বলছি তো, যা বলেছিলাম ভুলে যান না। লুসিয়ার গলায় অসহায়তার সুর। তখন আমি অত শত ভেবে বলিনি। আর কী বলেছি, না বলেছি, তাও মনে নেই।

–আপনার কথা অনুসারে তাহলে বলতে হয়, আপনার শ্বশুরের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, এর মধ্যে কোনো গলদ ছিল না। তাই তো?

-হ্যাঁ, তাই-ই। জোর গলায় লুসিয়া বলল, কিন্তু আপনি অমন জ্বলজ্বলে শিকারির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন?

-কেন জানেন, মাদাম? পোয়ারো একইভাবে তাকিয়ে থেকে বললেন–আমরা, অর্থাৎ যারা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে চাকরি করেছেন বা করছেন, তাঁরা নিজেদের শিকারি কুকুরের সঙ্গে তুলনা করে থাকে। শিকারি কুকুরকে সহজে শিকারের পেছনে লেলিয়ে দেওয়া যায় না। তবে একবার যদি শিকার অর্থাৎ অপরাধীর গন্ধ পায় তাহলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বা ঘায়েল করে তবেই শান্তি। আমিও ওই শিকারি কুকুরের থেকে কম যাই না, জানবেন।

–এসব আমাকে বলে লাভ নেই। এসব জানতে বা বুঝতে চাই না। আমি একটাই কথা জানি, আপনাকে এ বাড়ি থেকে বিদায় করতে হবে। এখানে থেকে আপনি আমার কী সাংঘাতিক ক্ষতি করছেন, তা জানা নেই আপনার, মঁসিয়ে পোয়ারো।

ক্ষতি? সাংঘাতিক ক্ষতি? কি ভাবে?

-হ্যাঁ, করছেন? লুসিয়া নিজেকে সংযত করল। বলল–কেবল, আমার নয়, এবাড়ির সকলের ক্ষতি করে চলেছেন। আপনাকে বুঝিয়ে বলার আর কিছু নেই। তবে জানবেন, যা বলছি, তার সবটাই সত্যি। গতরাতে আপনাকে দেখে আমার কেমন ভরসা জেগেছিল, আপনার প্রতি আস্থা রাখতে শুরু করেছিলাম। সে কথা মাথায় রেখেই বলছি, এসব অনুসন্ধানের কাজ বন্ধ করে ফিরে যান। এ বাড়ি ত্যাগ করুন।

লুসিয়া নিজেকে সামলাতে না পেরে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

এমন সময় ঘরের দরজা ঠেলে পা রাখল রিচার্ড অ্যামরি, পেছনে ডঃ কেনেথ গ্রাহাম।

-একী, লুসিয়া, তুমি? বউকে দেখে রিচার্ড সত্যিই অবাক হল। ভীষণ রেগে গেল। প্রকাশ না করে বলল–সকাল থেকে বিছানা আঁকড়ে পড়ে আছো, শরীর খারাপ। অথচ এখানে? কী জন্য?

কেন, রিচার্ড, কী হয়েছে? স্বামীর কথা শুনে লুসিয়ার বুকটা আঁতকে উঠল, নতুন কিছু নিশ্চয়ই ঘটেছে, তোমার মুখমণ্ডলই তা বলে দিচ্ছে, বলল না কী হয়েছে?

–আঃ, লুসিয়া, শান্ত হও। বউকে আশ্বস্ত করল রিচার্ড। কিচ্ছু হয়নি। আমরা এখানে কিছু কথা বলব, তুমি বরং তোমার ঘরে যাও, লক্ষ্মীটি।

-কেন, আমার সামনে কি...... আর কিছু বলার সাহস হল না লুসিয়ার, রিচার্ড দরজা খুলে দিল, পায়ে পায়ে লুসিয়া বসার ঘর থেকে অদৃশ্য হল।

কী আর বলি

১০.

কী আর বলি, মঁসিয়ে পোয়ারো, হাতের ডাক্তারি ব্যাগটা টেবিলের ওপর রাখলেন ডঃ গ্রাহাম, খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে একটা খারাপ খবর নিয়ে এসেছি।

খারাপ খবর। পোয়ারো মনে মনে খুশি হলেন, নিশ্চয়ই স্যার ক্লড অ্যামরির মৃত্যুর কারণ জানা গেছে। আর সেটাই বলতে এসেছেন, তাই না?

–ঠিকই ধরেছেন। ডঃ গ্রাহাম। ঘাড় নেড়ে বললেন, পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট বলছে, বিষ ক্রিয়াই স্যার ক্লডের মৃত্যুর কারণ কফির সঙ্গে ওই বিষ মেশানো হয়েছিল।

বিষটা নিশ্চয়ই হিসকোসিন হাইড্রোব্রোমাইড বা ওই জাতীয় কিছু, তাই না ডঃ গ্রাহাম।

–হুঁ, কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?

টেবিলের ওপর রাখা ওষুধভরা টিনের বাক্সটা যাতে ডঃ গ্রাহামের নজরে না পড়ে, তাই পোয়ারো সেটা রেখেছিলেন গ্রামোফোনের আড়ালে।

–কিন্তু কেনেথ, রিচার্ড বসেছিল সোফার একপাশে, সে এবার মুখ খুলল, আমি তো এসবের মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

–জেনে রাখো, রিচার্ড, এই কেসটা পুলিশের হাতে চলে গেছে। অতএব খানাতল্লাশি বা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যে কোনো সময় তোমাদের বাড়িতে চলে আসতে পারে, প্রস্তুত থেকো। মনে রেখো এটা একটা খুনের মামলা।

–ওফ, কী সাংঘাতিক ব্যাপার, রিচার্ড চেঁচিয়ে উঠল, পুলিশ, খুন–এসব তো ভাবতেই পারছি না। ভাই কেনেথ, তোমায় অনুরোধ করছি, ব্যাপারটা এখানেই থামিয়ে দাও, আর গড়াতে দিও না, সর্বনাশ হয়ে যাবে।

রিচার্ড, উত্তেজিত হয়ো না। ডঃ গ্রাহাম সান্ত্বনার সুরে বললেন–আমি তোমাদের শুভাকাঙ্খী, মনে রেখো, কিন্তু পুলিশি ঝামেলা থেকে তোমাদের রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, দুঃখিত। ব্যাপারটা করোনার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, ধামা চাপা দেবার উপায় নেই। তাছাড়া পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট পরিষ্কার লিখেছে–আত্মহত্যাজনিত মৃত্যু নয়, এটা খুন।

তার মানে বিষমেশানো কফি খাইয়ে বাবাকে হত্যা করা হয়েছে?

রিচার্ডের প্রশ্নের জবাবে ডঃ গ্রাহাম বললেন–পরিস্থিতি তাই বলছে। রিচার্ড, আর একটা খবর শুনে রাখো। করোনারের হাতে সব তথ্য এসে গেছে, অতএব দেরি না করে ওরা আগামীকালই বিংস আমর্স-এ তদন্তের কাজ শুরু করবে।

পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তেই হচ্ছে, এটাই তোমার শেষ কথা, তাই তো?

রিচার্ড উত্তেজিত। ডঃ গ্রাহাম শান্ত সংযত কণ্ঠে বললেন রিচার্ড, এসময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হয়। তোমাকে আবারও বলছি, পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট তোমার বাবার মৃত্যুর কারণ দেখিয়েছে মারাত্মক বিষজনিত ক্রিয়া। তাই তোমাদের ভালোর জন্য এক্ষেত্রে যা যা করণীয়, সময় থাকতেই আমি করেছি। এছাড়া আর কিছু উপায় নেই।

-হা ঈশ্বর! রিচার্ডের গলা থেকে আক্ষেপ ঝরে পড়ল। এবারে পুলিশি তদন্তের পরিণতি শেষ পর্যন্ত কোথায় দাঁড়াবে কে জানে! এদিকে মঁসিয়ে পোয়ারোও বসে নেই, বরং উনি পুলিশের আগে ছুটছেন। আমার তো এখন মাথা খারাপ হবার উপক্রম, কেনেথ, কিছু করো ভাই।

পুলিশি তদন্তের ব্যাপারটা তোমাকে যথেষ্ট ধাক্কা দিয়েছে বুঝতে পারছি, সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে ডঃ গ্রাহাম বললেন, তবে এখন আমার দু-চারটে প্রশ্নের জবাব দাও তো। ঠিক-ঠিক জবাব চাই, মনে রেখো।

-বেশ, বল। কী তোমার জানার আছে? রিচার্ড বুঝি একটু ধাতস্থ হল।

–প্রথম প্রশ্ন, গতরাতে ডিনারে তোমার বাবা কী কী খেয়েছিলেন, মনে আছে?

–গতরাতে আমরা সবাই ডিনার করতে বসেছিলাম, রিচার্ড সামান্য চুপ করে বলল, হা, মনে পড়ছে, সুপ, ভাজা শশাল মাছ, কাটলেট দু-তিনটে, শেষ পাতে আইসক্রিম–ফ্রুট স্যালাড।

–ডিনারে কোনো ড্রিঙ্কস?

–আগাগোড়াই ডিনারে আমরা ভালো ফরাসী মদ্য পান করে থাকি। এটা আমাদের পরিবারের ঐতিহ্য বলতে। গতরাতে বাবা খেয়েছিলেন বাগান্ডি। পিসিমা ও বাবার সেক্রেটারি এডওয়ার্ড রেনরও ওই ড্রিঙ্কস নিয়েছিলেন। ডিনারে বসে হুইস্কির সাথে সোড়া মিশিয়ে খাওয়ার অভ্যাস আর্মিতে থাকাকালীনই হয়ে গিয়েছিল, ওটা আর ছাড়তে পারিনি, ভাই। আর যদুর মনে পড়ে, ডঃ কারোলি হোয়াইট ওয়াইন নিয়েছিলেন, সম্ভবত ওই সস্তার মদই ওর সয়।

–ডঃ কারোলি বলতে তুমি ওই ইটালিয়ান ডাক্তারের কথা বলছ তো! সত্যি আজব লোকটা। ডঃ গ্রাহাম এবার জানতে চাইলেন, এবার বলল রিচার্ড, এই লোকটার সঙ্গে তোমার কতদিনের পরিচয়, কিছু লুকিয়ো না, সব আমার জানা দরকার।

ওদের কথাবার্তা কর্ণকুহরে ধরে রাখার জন্য পোয়ারো চোখ ইশারা করলেন, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস ধীর পায়ে ওদের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন।

–পরিচয়। কী বলছ, কেনেথ, লোকটাকে চিনিও না, এমনকি ওর নামটাও শুনিনি। কখনো, গতকালই লোকটাকে প্রথম আমি দেখেছি।

–তবে শুনেছি যে, উনি তোমার বউ লুসিয়ার বন্ধু, কথাটা কি ঠিক?

বন্ধু নয়, কোনো একসময় লুসিয়ার সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছিল মাত্র, লুসিয়া সেইরকমই বলেছিল।

–তারমানে দুজনের মধ্যে মনের কোনো টান নেই, তাইতো?

–হ্যাঁ, তাই-ই।

–আচ্ছা, বেশ, ডঃ গ্রাহাম মুখে সামান্য একটা আওয়াজ করলেন। তারপর বললেন–যে সম্পর্কই থাকুক না কেন, ওই ডাক্তার কিন্তু কোনো ভাবেই এ বাড়ি ছেড়ে বাইরে যেতে পারবেন না। রিচার্ড, এটা ওঁকে বুঝিয়ে বলার দায়িত্ব তোমার।

–তুমি বলার আগেই ওঁকে একথা গতরাতেই শুনিয়ে দিয়েছি, কেনেথ। বলেছি, বাবার চুরি যাওয়া ফর্মুলার সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত তাকে এই বাড়িতে থাকতে হবে, কোথাও যাওয়া চলবে না। গ্রামের এক কম দামের সরাইখানায় উনি উঠেছিলেন। গতকাল সকালে আমার নোক গিয়ে ওঁর জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে।

উনি আসতে রাজী হয়ে গেলেন?

ডঃ কেনেথ গ্রাহামের জবাবে রিচার্ড চোখ বড় বড় করে বলল–কোনোরকম উচ্চবাচ্যই করেননি, বরং এখানে আসতে পেরে উনি বুঝি বর্তে গেলেন, এমনই ভাব দেখালেন।

-বুঝেছি। ডঃ গ্রাহামের গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হল। যাক, এবার বলো, তোমার বাবার মৃত দেহ এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরে এ ঘরের দরজা জানলাগুলো বন্ধ, না খোলা ছিল?

আমি বলছি, ডঃ গ্রাহাম, পোয়ারো এবার জবাব দিলেন। স্যার ক্লডের মৃতদেহ করোনারে পাঠানোর পর এঘরের দরজা জানলা বন্ধ ছিল। আমার নির্দেশে শুতে যাবার আগে ট্রেডওয়েল সবকটা দরজা জানলা ভেতর থেকে ভালো করে এঁটে তালা লাগিয়ে দিয়েছিল। চাবি আমার হাতে দিয়ে সে চলে গিয়েছিল। ঘরের ভেতরের জিনিসপত্র যেমন এখন আছে দেখছেন, তেমনই ছিল, কোনো নড়চড় হয়নি, শুধু কয়েকটা চেয়ার ছাড়া। আমাদের বসার জন্যই চেয়ারগুলোর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেছে।

টেবিলের ওপরে গত সন্ধ্যার একটা এঁটো কফির কাপ তখনও পড়ে ছিল। ডঃ গ্রাহামের নজর সেদিকে পড়ল। তিনি কাপটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন–রিচার্ড, এটাই কি সেই কাপ? মনে হয় এটাতেই তোমার বাবা শেষ কফি খেয়েছিলেন?

রিচার্ড এ প্রশ্ন শুনে হতভম্ব হয়ে গেল, জবাব খুঁজে পেল না বলার মতো।

ডঃ গ্রাহাম কফি টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে কাপটা তুলে নিলেন–এটা আমায় নিয়ে যেতে হচ্ছে তদন্তের স্বার্থে। যতটুকু তলানি পড়ে আছে, পরীক্ষা করলে ধরা পড়ে যাবে, আশা করি বিষের চিহ্ন পাওয়া যাবে। কাপটা তিনি নিজের ব্যাগের মধ্যে রাখার জন্য তৈরি হলেন।

রিচার্ড এগিয়ে এল–তুমি কি নিশ্চিত এই কাপে বিষ আছে? কোনোরকমে রিচার্ড বলল, কিন্তু প্রমাণ সোপাটের চেষ্টা করল না।

-হ্যাঁ, আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, স্যার ক্লডের ডিনারে কোনো বিষ দেওয়া হয়নি। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে, ডঃ গ্রাহামের চাপা কণ্ঠস্বর, বিষ মেশানো হয়েছিল তোমার বাবার কফিতে হিসকোসিন হাইড্রোব্রোমাইড।

আমি, আমি কথাটা বলে রিচার্ড এগিয়ে এল, তীব্র হতাশা তাকে গ্রাস করেছে, কী মনে করে খোলা ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর কাছে এসে দাঁড়াল, লাফিয়ে বেরিয়ে এল বাগানে।

উঃ গ্রাহাম ব্যাগ খুলে কিছুটা তুলো বের করলেন, কাপটা ভালো করে জড়িয়ে নিলেন। তারপর একটা ছোট কার্ডবোর্ডের বাক্সে ভরে চালান করে দিলেন নিজের ডাক্তারি ব্যাগের মধ্যে।

হাতের কাজ সারতে সারতে পোয়ারোকে উদ্দেশ্য করে ডঃ গ্রাহাম বলে চললেন–মঁসিয়ে পোয়ারো, কী বিশ্রী ব্যাপার বলুন তো। আগামী দিনগুলি তাকে কোন পরিস্থিতির সামনে দাঁড় করাবে, সে কথা ভেবে বেচারা রিচার্ড দারুণ মুষড়ে পড়েছে। রাজ্যের খবরের কাগজগুলোর কথাই ধরুন। স্যার ক্লড অ্যামরিকে হত্যা, সঙ্গে ওর স্ত্রীর ইটালিয়ার ডাক্তারের বন্ধুত্ব, ব্যাপারটাকে কি ওরা ভোলা চোখে দেখবে। এই কেচ্ছা কেলেঙ্কারির কথা ওরা রসিয়ে রসিয়ে কাগজগুলোতে ছাপবে। স্বাভাবিকভাবেই এই নোংরা কাদার ছিটে এসে পড়বে রিচার্ডের বউ লুসিয়ার গায়ে, শুরু হবে পারিবারিক অশান্তি। বেচারী, লুসিয়া, আমি জানি, ও সম্পূর্ণ নির্দোষ, এ বিষ প্রয়োগের ঘটনার সঙ্গে কোনো মেয়ে জড়িত নয় জানবেন।

ডঃ গ্রাহাম একটু থামলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন–আমার কী মনে হয় জানেন, মঁসিয়ে পোয়ারো? রিচার্ড মুখে যাই বলুক না কেন, আসলে কিছু জানে না। বেচারী লুসিয়া। কম বয়স, তার ওপরে ধনী গবেষকের একমাত্র ছেলের স্ত্রী। কথাটা জানতে পেরে ওই ইটালিয়ান ডাক্তার লুসিয়ার সঙ্গে ভাব জমিয়েছে এবং ধীরে ধীরে একধরনের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। মাফ করবেন, বলতে বাধ্য হচ্ছি, ডঃ কারোলির মতো বিদেশীরা প্রচণ্ড ধড়িবাজ, এরা নিজের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য যে কোনো জঘন্য কাজ করতে পারে।

তার মানে আপনি এ পরিবারের সকলকে সন্দেহের বাইরে রাখছেন, ডঃ কারোলিকেই অপরাধী মনে করছেন, তাই না?

কথাটা বলতে বলতে পোয়ারো বাঁকা চোখে একবার তার সহকারী ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর দিকে তাকালেন।

ডঃ গ্রাহাম কী বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। এদিক-ওদিক তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করলেন। তারপর চাপা গলায় বললেন, আমরা সকলেই জানি, স্যার ক্লডের হারিয়ে যাওয়া ফর্মুলাটা কতখানি মূল্যবান। অতএব এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, একজন বিদেশী, যার নাম এই বাড়ির কেউ কোনোদিন শোনেনি, তার পক্ষে ওই ফর্মুলা জানা কী ভাবে সম্ভব? তবে ভুলে যাবেন না। ওই ইটালিয়ান ডাক্তার এখানে আসার পরেই প্রথমে চুরি হল ফর্মুলা, তারপর রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল স্যার ক্লড অ্যামরির।

ডঃ গ্রাহাম সামান্য বিরতি নিলেন–জানেন তো, ইটালিয়ানদের একটা কুখ্যাতি আছে, বিষপ্রয়োগে হত্যার ক্ষেত্রে তাদের জুড়ি মেলা ভার।

–ঠিক, ঠিক, পোয়ারো গলার আওয়াজ চড়িয়ে বললেন–ওই বর্গিয়ার আংটির মতো।

পোয়ারোর শেষ কথা দুটি সম্ভবত ডঃ গ্রাহাম শুনতে পাননি, তাই তিনি কান এগিয়ে বললেন–দুঃখিত বুঝলাম না, কার কথা যেন আপনি বললেন।

বাদ দিন ওসব কথা। পোয়ারো বর্গিয়ার বিষয়ে কোনো কথা বাড়াতে চাইলেন না।

টেবিল থেকে ব্যাগটা তুলে নিতে নিতে ডঃ গ্রাহাম বললেন–মঁসিয়ে পোয়ারো, আমাকে এবার বিদায় নিতে হচ্ছে। কিছু মনে করবেন না, পুলিশ কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে আশা করি। আপনি ততক্ষণ কোনো জিনিসকে কাউকে হাত দিতে দেবেন না, নজর রাখবেন। এ আমার অনুরোধ, জানেনই তো ব্যাপারটা কত গুরুত্বপূর্ণ। এ বাড়ির সকলকে এই ঘটনার গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝানো সম্ভব নয়।

ডঃ গ্রাহাম পোয়ারোও হেস্টিংস-এর সঙ্গে হান্ডশেক করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

–আপনি সম্পূর্ণভাবে আমার ওপর ভরসা করতে পারেন। কথা দিচ্ছি, এ ঘরের কোনোকিছু এধার ওধার হবে না।

ডঃ গ্রাহাম বসার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ক্যাপ্টেন হেস্টিংস দরজার পাল্লা এঁটে দিতে দিতে বললেন, সত্যি বলছি পোয়ারো, এ বাড়িতে পড়ে আছি, কখন যে খাবারের

মধ্যে কী বিষ মিশিয়ে দেবে জানি না, এক মারাত্মক খুনি চোখের সামনে বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারওপর ওই ডঃ কেনেথ গ্রাহাম, লোকটা সুবিধার মনে হয় না। তার ওপর এ পরিবারের মেয়ে বারবারার সঙ্গে লুকিয়ে চুরিয়ে ফস্টিনষ্টি করে, এ বাড়ির কারো সঙ্গে তার তেমন ভাব আছে বলে আমার মনে হয় না।

-তুমি কি ভাবছ, খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে আমাদের কেউ মারাত্মক অসুস্থ করে দেবে। ভয়ে হাত-পা সোঁধয়ে যাচ্ছে, তাই না? পোয়ারো ভুরু কুঁচকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন ক্যাপ্টেন হেস্টিংস এর দিকে। তারপর তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন–ক্যাপ্টেন ওসব ভয় মনের ভেতর এনো না। সত্যি সত্যি তেমন কোনো মারাত্মক অসুখে পড়ার আগেই হয়তো তল্পিতল্পা গুটিয়ে আমাদের ফিরে যেতে হবে। যাইহোক বন্ধু, এসো, বসে না থেকে কাজ শুরু করি।

-তুমি কী বলতে চাইছ, খুলে বলল, বুঝতে সুবিধা হবে।

হেস্টিংস-এর কথা শুনে পোয়ারো সামান্য হেসে বললেন–সিজারে বর্গিয়াকে জেরা করব এবার। শুধু আমি নয়, তুমিও সঙ্গে থাকবে আমার।

কথা শেষ করেই পোয়ারো দেওয়ালে সাঁটা কলিং বেলের সুইচ টিপলেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেডওয়েল বসার ঘরের মধ্যে পা রাখল–বলুন, স্যার, ডাকছেন কেন?

–হ্যাঁ, ট্রেডওয়েল, পোয়ারো বললেন, ডঃ কারোলিকে ডেকে দাও তো, কিছু প্রশ্ন আছে।

ট্রেডওয়েল ঘাড় কাত করে নিঃশব্দে চলে গেল।

পোয়ারো বললেন ক্যাপ্টেন, এই টিনের বাক্সটা এখান থেকে চট করে সরিয়ে ফেলো, ডঃ কারোলি এসে যেন দেখতে না পায়।

বাক্সটা তিনি তুলে দিলেন ক্যাপ্টেনের হাতে, একটা চেয়ার টানতে টানতে নিয়ে এলেন বুক শেলফ-এর কাছে। বললেন, বাক্সটা আমার হাতে দিয়ে উঠে পড়ে।

হেস্টিংস চেয়ারে উঠে পড়লেন, বাক্সটা নিয়ে আগে যেখানে ছিল, সেখানে রেখে দিলেন।

-হেস্টিংস, পোয়ারো বলতে থাকলেন, একটা রহস্য সমাধানের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলতার দাম অনেক। মুখ টিপে হাসলেন। আবার বললেন, এবার তা তুমি দেখতে পারবে, আশাকরি।

সেই সাদৃশ্যের ওপরে কী যেন বলছিলে, তাই না? হেস্টিংসও সামান্য হাসলেন, হ্যাঁ, এবার তোমার বক্তব্য পরিষ্কার বুঝতে পারছি।

-তাই নাকি হে? বল, বল, কী বুঝেছ?

তোমার ভাবগতিক দেখে আমার মনে হচ্ছে, ডঃ কারোলিকে ঘাবড়ে দেওয়ার জন্য কিছু একটা করতে চাও। গত রাতে এই টিনের বাক্সের ওষুধের শিশিগুলো নিয়ে যারা ঘাঁটাঘাঁটি করছিলেন, ডঃ কারোলি তাদের দলভুক্ত। অন্যদিকে তুমি চাও, উনি যাতে আগে আগে সাবধানী না হয়ে যান, তার ব্যবস্থা করতে, ঠিক বলেছি?

–বাঃ, তোমার মগজের প্রশংসা করতে হয়, ভাবতে পারিনি, বয়সের সাথে সাথে তোমার বুদ্ধি এত পাকা হতে পারে। পোয়ারো বন্ধুর কাঁধে সামান্য চাপ দিয়ে বললেন।

বন্ধু, ভুলে যেও না, তোমার সাথে আমার আজকের পরিচয় নয়। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বইয়ের শেলফের ওপর আঙুল বুলিয়ে পোয়ারো বললেন, কত ধুলো জমেছে দেখ, নিজের ধুলো মাখা আঙুল তুলে দেখালেন, এদিকটায় কাজের লোকেরা চোখ দেয় না বুঝতে পারছি। নিজেই আমি জায়গাটা পরিষ্কার করে দিতাম, যদি একটা ভেজা ন্যাকড়া........

কথা শেষ না করেই তিনি চেয়ার থেকে নেমে পড়লেন, সেটাকে পূর্বের জায়গায় বসিয়ে দিলেন। হেস্টিংস তাকিয়ে আছেন তার দিকে কেমন অস্বাভাবিক চাউনি, থমথমে মুখ।

–কী হল? হেস্টিংস অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছে কিছু পেয়েছ?

-পেয়েছি, পোয়ারো চাপা গলায় বললেন–পেয়েছি, কাঁড়ি কাঁড়ি ধুলো, যা বহুদিন ধরে জমেছে।

এমন সময় ঘরে এসে পা রাখলেন ডঃ কারোলি।

–বলুন মঁসিয়ে পোয়ারো, খাঁটি ইটালিয়ান ভাষায় ডঃ কারোলি জানতে চাইলেন আপনি নাকি আমায় কিছু জানার জন্য ডেকে পাঠিয়েছেন?

-হ্যাঁ, ডঃ কারোলি,

ইটালিয়ান ভাষায় জবাব শুনে ডঃ কারোলি এবার পোয়ারোর মাতৃভাষা ফরাসিতে বললেন–ইটালিয়ান ভাষা বেশ ভালোই বলেন দেখছি, মঁসিয়ে পোয়ারো।

ক্যাপ্টেন হেস্টিংস ওদের কথাবার্তা শুনছিলেন, কিন্তু অর্থ বুঝতে পারছিলেন না। তাই বিরক্ত ভরে বলেন–কোন ভাষা?

দুঃখিত ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, ডঃ কারোলি সঙ্কোচ বোধ করলেন–আমি জানতাম না, আপনি ইটালিয়ান জানেন না। মাসিয়ে পোয়ারো, একটা কথা জানিয়ে রাখি আগেই আমার হাতে সময় কম। লন্ডনে কিছু জরুরি কাজ আছে। সেগুলো সারতে আজই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। দরকার হলে, আর এখানকার কাজ শেষ হলে তবেই যাবেন। মিছিমিছি আপনাকে বাধা দিতে যাব কেন বলুন। এসব কথায় পরে আসছি। আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন। গতরাতে আমরা দুজনে অর্থাৎ ক্যাপ্টেন হেস্টিংস আর আমি এখানে আসার আগে কী কী ঘটেছিল, সে সম্পর্কে জানতে চাইছি। খুঁটিয়ে বলুন, কিছু বাদ দেবেন না, ডঃ কারোলি।

বেশ, বলছি, গত সন্ধ্যায় ডিনার শেষ করে বাড়ির সকলে এ ঘরে এসে ঢুকলেন। আমিও তাদের অনুসরণ করলাম। স্যার ক্লড তার সেক্রেটারি এডওয়ার্ড রেনরকে ডাকলেন, তাঁরা স্টাডিতে ঢুকে পড়লেন। কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর স্যার ক্লড স্টাডি থেকে বেরিয়ে এসে জানালেন যে একটা কাগজ তিনি খুঁজে পাচ্ছে না, অর্থাৎ সেটি খোয়া গেছে।

–কাগজটা কীসের তা নিশ্চয়ই উনি বলেছিলেন? পোয়ারো শ্যেন দৃষ্টিতে ডঃ কারোলিকে জরিপ করতে লাগলেন।

-হ্যাঁ, বলেছিলেন। একটু চুপ করলেন ডঃ কারোলি, সম্ভবত কিছু বললেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন–কাগজটায় নাকি একটা ফর্মুলা লেখা ছিল, প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক এক পারমাণবিক বোমার তৈরির ফর্মুলা। স্যার ক্লড আরও বললেন, তার ধারণা যে, ফর্মুলা-চোর এখনও এঘর থেকে সরে পড়েনি, অর্থাৎ পরিবারের সকলের মধ্যেই আছে। কথাটা শুনে আমি খুব মুশকিলে পড়লাম, কারণ ঘরে যারা আছেন, সকলেই এই পরিবারের একমাত্র আমি ছাড়া, যার সাথে এদের পারিবারিক সম্পর্ক নেই। স্যার ক্লডের কথা শুনে সকলের মধ্যে থেকে কে একজন যেন বলে উঠলেন, বেশ, আমাদের তল্লাসি করা হোক। প্রত্যেকে এ প্রস্তাবে রাজী হলেন, আমারও আপত্তি নেই জানিয়ে দিলাম। হতে পারি আমি বিদেশী, কিন্তু আমার তো আত্মসম্মান আছে। এমন একটা সন্দেহ যখন ওদের মনের কোণে উঁকি দিয়েছে, তখন ওদের সাথে তাল দেওয়া ছাড়া আমি আর কি করতে পারতাম বলুন আপনি?

–ঠিকই করেছেন। পোয়ারো সায় দিয়ে বললেন, ওই মুহূর্তের পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজটা আপনি ঠিকই করেছেন। কিন্তু আজ? আজকের ব্যাপারটা কিভাবে সামলাবেন বলুন।

-মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনাকে আগেই জানিয়েছি, আবার বলছি, লন্ডনে অত্যন্ত জরুরী কাজ পড়ে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাকে লন্ডনের পথে রওনা হতে হবে।

–তাহলে আপনাকে যেতেই হবে, কী বলেন ডঃ কারোলি?

–অবশ্যই আমাকে যেতে হবে, কোনো উপায় নেই। বোঝা গেল ডঃ কারোলি বেশ চটে গেছেন।

–ওনার কথায় যুক্তি আছে। ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, তুমি কী বলে?

হেস্টিংস তার বন্ধুর দিকে ভাবলেশহীন চোখে তাকালেন, অর্থাৎ ডঃ কারোলির কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

–মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার কাছে একটা অনুরোধ রাখছি। দয়া করে আপনি মি. রিচার্ড অ্যামরিকে বুঝিয়ে বললেন। আমার এভাবে চলে যাওয়া উনি হয়তো পছন্দ করবেন না। এই নিয়ে ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি হোক, তা আমি চাই না।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ডঃ কারোলি। পোয়ারো হাত তুলে অভয় দিলেন, বললেন, এবার একটা প্রশ্নের ঠিক-ঠিক উত্তর দিন তো। মাদাম লুসিয়া অ্যামরির সঙ্গে আপনার কি আগেই পরিচয় ছিল?

নিশ্চয়ই, ডঃ কারোলি জোরের সঙ্গে বললেন, আপনার কাছে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এতবছর পর এই গ্রাম্য পরিবেশে ওকে দেখে আমি যতটা অবাক হয়েছি, খুশিও হয়েছি ততটা। সত্যি, এ অভাবনীয়, অকল্পনীয়......

–কী বললেন? অভাবনীয় ও অকল্পনীয়?

–ঠিক তাই। আড়চোখে ডঃ কারোলি তাকালেন পোয়ারোর মুখের দিকে।

পোয়ারো নিজেকে নিজে শুনিয়ে বললেন–সত্যিই অকল্পনীয় বটে! তারপর বিস্ময়ভাব কাটিয়ে বললেন–আপনার কল্পনার প্রসারতা দেখে তাজ্জব বনে যাচ্ছি। দারুণ! দারুণ!

পোয়ারো ও হেস্টিংস বাঁকা চোখে ডঃ কারোলিকে লক্ষ্য করলেন, বোঝা গেল, পোয়ারো নীচু স্বরে কথাগুলো বললেও ডঃ কারোলির কানে বেশ ভালো ভাবেই প্রবেশ করেছে।

ডঃ কারোলি তবুও নীরব। পোয়ারো এবার জানতে চাইলেন–এই যে বিশ্বে নিত্যদিন কিছু না কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘটে চলেছে, এ সম্পর্কে আপনার আগ্রহ কতটা?

–ডঃ কারোলি সামান্য হেসে বলেন–সম্পূর্ণ মাত্রায়। আমি যেহেতু একজন ডাক্তার, তাই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পর্কে আমার আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক।

স্বীকার করছি। পোয়ারো বললেন, আপনার পেশার সাথে যেসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, এই ধরুন, দুরারোগ্য ব্যাধির কোনো টিকা, নতুন বীজানুর সন্ধান, রোগ সারাতে অমুক রশ্মির সাহায্য গ্রহণ–এসব ক্ষেত্রে আপনার আগ্রহ থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু

মারাত্মক ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক বোমা বা বিস্ফোরক আবিষ্কার, এসবে আপনার আগ্রহের কারণ কী? আপনাদের চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোন উন্নতির কাজে এসব সহায়ক?

-কিছু মনে করবেন না, মঁসিয়ে পোয়ারো, রোগ সারানোর টিকা বলুন, আর পরমাণু বোমা বলুন, সবইতো বিজ্ঞানের অবদান, এটা মানতেই হবে। অর্থাৎ প্রকৃতিকে জয় করার নমুনা মাত্র। প্রকৃতির বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে মানুষ বিজ্ঞানের হাত ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অতএব, পরমাণু বোমা বা বিস্ফোরক সম্পর্কে আমার আগ্রহ থাকাটাই স্বাভাবিক বলে মনে করি।

বাঃ, কী সুন্দর সহজভাবে বুঝিয়ে দিলেন। পোয়ারো মুচকি হাসলেন। যেন একটা কবিতা, পরক্ষণে গম্ভীর মুখে বললেন কিন্তু ক্যাপ্টেন হেস্টিংস এর উপদেশ তুললে আমার চলবে না–আমি একজন রসহীন গোয়েন্দা। বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গি দিয়ে সবকিছু খুঁটিয়ে বিচার করা আমরা কাজ। ডঃ কারোলি, আমার ধারণা, স্যার ক্লড অ্যামরির আবিষ্কৃত পরমাণু বোমার ফর্মুলাটির দাম কয়েক লাখ পাউন্ড তো হবেই। আপনিও কি তাই বলেন?

হতে পারে, নিস্পৃহ কণ্ঠে ডঃ কারোলি জবাব দিলেন, আসলে এসব ব্যাপারে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।

-বুঝতে পারছি, আপনি আর পাঁচজন সাধারণের মতো নন, আপনি উন্নত দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মহানুভব ব্যক্তি। দেশে দেশে ভ্রমণ করা অর্থাৎ ঘুরে বেড়ানো ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার। আপনার অর্থের অভাব নেই। তাই অনায়াসে যেখানে খুশি বেড়াতে পারেন।

দুনিয়াটা ঘুরে দেখার চেষ্টা করা কি অস্বভাবিক কিছু? যে পৃথিবীতে বাস করছি, তার চেহারাটা দেখতে হবে বৈকি!

নিশ্চয়ই দেখবেন, তবে দেশের চেহারা দেখলেই চলবে না, বিভিন্ন মানসিকতার লোক রয়েছে, অনেকে বদ মতলবে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায় তাদের চেহারাটাও দেখা দরকার বলে মনে করি। যেমন স্যার ক্লডের ফর্মুলাটা যে চুরি করেছে, তার কথা ধরুন। তার মানসিকতা কী ধরনের সেটা জানার জন্য চোরের চেহারাটা দেখা দরকার আপনার মতো যারা নানা দেশে ঘুরে বেড়ায়, তাদের পক্ষেই সম্ভব।

-তা যা বলেছেন কারোলি খুশি মনে বললেন–অদ্ভুত মানসিকতার লোক বটে।

–এরা ব্ল্যাকমেলার। পোয়ারো চাপা গলায় বলে উঠলেন।

–মানে? ডঃ কারোলি বললেন–কী বলতে চান?

–বিশেষ কিছু নয়। আমি বললাম, ওই বিচিত্র মানসিকতার লোকটি ব্ল্যাকমেলার হতে পারে।

পোয়ারো থামলেন। খানিকবাদে তিনি নড়েচড়ে বসলেন। বললেন–আমরা কথায় কথায় মূল প্রসঙ্গ থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছি। অর্থাৎ স্যার ক্লড অ্যামরির মৃত্যুরহস্য।

–স্যার ক্লডের মৃত্যু! ডঃ কারোলি বাধা দিয়ে বললেন, স্যার ক্লডের মৃত্যু আমাদের আলোচনায় আসছে কী করে?

–কেন নয়? আমার মনে আছে, স্যার ক্লডের আধবসা পাথরের মতো দেহটাকে দেখে আপনি প্রথম পরীক্ষা করে রায় দিয়েছিলেন, হার্ট অ্যাটাকে ওঁর মৃত্যু হয়েছে। অবশ্য পরে, পোস্টমর্টেম করে জানা যায়, হার্ট অ্যাটাক নয়, বিষ খাইয়ে ওঁকে খুন করা হয়েছে। অর্থাৎ ওঁর খাবারে বা পানীয়ে বিষ মেশানো হয়েছে।

-ওঃ, তাই নাকি। ডঃ কারোলি অবাক হওয়ার ভান করলেন।

–আপনার ধারণা আর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট–দুটোর মধ্যে মিল নেই কেন, এটা ভেবে আশ্চর্য হচ্ছেন নিশ্চয়ই।

-একটুও নয়, জোর গলায় ডঃ কারোলি বললেন, কাল রাতে ওঁকে পরীক্ষা করে আমার এই ধারণাই হয়েছিল।

-এবার বুঝতে পারছেন, ব্যাপারটা আর সহজ সরল নেই, কেমন জট পাকানো। অতএব পোয়ারো কঠিন কণ্ঠে বললেন, ডঃ কারোলি, আপনি কোনো ভাবেই এ বাড়ি ছেড়ে এখন যেতে পারছেন না।

ডঃ কারোলি অসহায়বোধ করলেন–আপনার কী ধারণা, ওই ফর্মুলা চুরির আড়ালে আমার কোনো হাত আছে?

-অবশ্যই। আপনি কি নিজেকে সন্দেহের বাইরে মনে করেন?

-ফর্মুলার কথা বাদ দিলে থাকে স্যার ক্লডের মৃত্যুর ঘটনা। ডঃ কারোলি বলতে থাকলেন–এই পরিবারের কোনো একজনকে দেখাতে পারবেন, যিনি ওঁর মৃত্যু কামনা করেননি। মাফ করবেন, একটা অপ্রিয় সত্যি কথা বলি, বহুদিন ধরে এই পরিবারের লোকেরা ওনার শাসনে জর্জরিত ছিল। কারো প্রতি ওনার প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ছিল না। তিনি কেবল জানতেন নিজের আবিষ্কারে মেতে থাকতে। কাজই ছিল তাঁর প্রথম ও শেষ ভালোবাসা। ফলে প্রচুর টাকার মালিক হতে পেরে ছিলেন। যার সুবাদে পরিবারে এমন এক বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিলেন যার থেকে মুক্তি পাবার জন্য সকলেই হাঁস ফাঁস করছিলেন, তাছাড়া স্যার ক্লড ছিলেন অত্যন্ত কিপটে, আঙুলের ফাঁক দিয়ে পয়সা বেরোত না। এই অবস্থায় স্যার ক্লডের আকস্মিক মৃত্যু পরিবারের সকলকে শান্তি দিয়েছে বলে আমি মনে করি।

অবাক করা ব্যাপার! স্যার ক্লডের চরিত্রের এত বৈশিষ্ট্য আপনি কি গত সন্ধ্যাতেই লক্ষ্য করেছিলেন, ডঃ কারোলি?

মঁসিয়ে, পোয়ারো, আমি অন্ধ নই। সুতরাং সব কিছু নজরে পড়াই স্বাভাবিক। এই পরিবারের তিনজনকে জানি, যাঁরা স্যার ক্লডের মৃত্যু চেয়েছিলেন। অবশ্য এ ব্যাপারে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।

–ডঃ কারোলি, পোয়ারোর চোখে কৌতূহলের ইশারা, আপনি যতই শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চান না কেন, আপনাকে আমি কোনো রকম সাহায্য করতে পারছি না, অমি নিরুপায়।

–আশা করি, আপনার প্রয়োজন মিটেছে। যেতে পারি?

–এই মুহূর্তে আর কোনো প্রয়োজন নেই, পরে দরকার হলে ডাকব।

ডঃ কারোলি আর অপেক্ষা না করে দরজার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ কী মনে করে ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন–একটা কথা জানবেন মঁসিয়ে পোয়ারো, এমন কিছু মহিলা আছে, যাদের আমরা চিনি, আমাদের আশে পাশেই ঘুরঘুর করছে, তারা কিন্তু কম বিপজ্জনক নয়, মানুষ খুন করা তাদের কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। তাদের বাড়বাড়ন্ত বা স্বেচ্ছাচারিতা কোনোটাই সুখের কারণ নয়।

বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে রাগে গজগজ করতে করতে ডঃ কারোলি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

.

১১.

–পোয়ারো, ডঃ কারোলি বিদায় নিলে ক্যাপ্টেন হেস্টিংস বললেন, ওনার কথাগুলো শুনলে? কিছু হয়তো বোজাতে চাইছিল মনে হয়।

-না না, কাজের কাজ কিছু নয়, পোয়ারো বিরক্ত হয়ে জবাব দিলেন, আসলে, এসব হলো ওঁর ফন্দি-ফিকিরি কথাবার্তা, আমার তদন্তের কাজের মোড় ঘুরিয়ে নেবার অপচেষ্টা মাত্র। হেস্টিংস, একবার ওঠো তো, বেল টেপো, ট্রেডওয়েলকে চাই। একটু থামলেন

তিনি, তারপর বললেন–বন্ধু, তোমার হয়তো মনে নেই, গোয়েন্দাগিরির প্রথম শর্ত হল ধৈর্য। ধৈর্য হারালে সফল হবে কীভাবে?

ঘন্টা ধ্বনি শুনে দরজা ঠেলে মুখ বাড়াল ট্রেডওয়েল–বলুন স্যার, কী করতে হবে?

এসো ট্রেডওয়েল। দুটো কাজ তোমায় করতে হবে। প্রথমত, মিস ক্যারোলিন অ্যামরিকে গিয়ে বলল, আমি ডাকছি, এখুনি যেন উনি আসেন। আর দু'নম্বর হল, ওই ডঃ কারোলির ওপর নজর রাখা। উনি যেন কোনো মতেই এই বাড়ির বাইরে যেতে না পারেন। কথাটা অন্যান্য কাজের লোকদেরও জানিয়ে দিও। আর হ্যাঁ, মিস অ্যামরিকে বলল, বেশি সময় ওনাকে আটকে রাখব না। ওঁর জন্য আমরা এখানে অপেক্ষা করছি।

-ঠিক আছে, স্যার। দরজার পাল্লা ভেজিয়ে দিয়ে ট্রেডওয়েল ফিরে গেল।

-তুমি মিস ক্যারেলিনকে ডেকে পাঠালে, উনি কি আসবেন? ক্যাপ্টেন হেস্টিংস প্রশ্ন করলেন, রিচার্ডের মুখে যতদূর শুনেছি, ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদে তিনি এতই শোকাতুরা যে বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরোতে পারছেন না। খাওয়া-দাওয়া নিজের ঘরে বসেই সেরে নিচ্ছেন। বাড়ির সবাইকে বলে বেড়াচ্ছেন, উনি অত্যন্ত অসুস্থ, তা হলে?

-তোমার তো অজানা কিছু নেই হে। পোয়ারো সামান্য হাসলেন, অন্যন্যদের মতো তোমার কি মনে হয়, উনি বিছানা আঁকড়ে পড়ে আছেন?

-সাধারণ ব্যাপার নয় কি?

–ব্যাপারটা সাধারণ কী অসাধারণ, তার সন্ধান তুমি যতই ব্যঙ্গ করো না কেন, রিচার্ড যা বলেছে, তাই বললাম।

হেস্টিংস, পোয়ারো বলতে থাকলেন, গত সন্ধ্যায় নিজের বাড়িতে এইখানে দেশের এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর রহস্যজনক মৃত্যু তুমি দেখেছ। তাকে খুন করা হয়েছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তাই বলছে, বিষমিশ্রিত খাবার বা পানীয় তাকে খাওয়ানো হয়েছে। এ এক সাংঘাতিক নিদারুণ ঘটনা, অথচ তার পরিবারের লোকগুলোকে দেখ রহস্য উদঘাটনে সাহায্য না করে আমায় ভুল পথে চালনা করতে চেষ্টা করছে। লুসিয়া অ্যামরির কথাই ধরো না, গত সন্ধ্যায় যে আমাকে প্রায় হাতে পায়ে ধরে তদন্তের কাজ চালিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করেছিল, সে আজ পালটি খেয়ে গেল। সে আমাকে তদন্তের কাজ বন্ধ রেখে বিদায় নিতে বলছে। লুসিয়ার স্বামীও চাইছে, আমি এখান থেকে চলে যাই। রিচার্ড ওর পিসিমা ক্যারোলিনকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দিতে নারাজ। ক্যারোলিনের কাছে নিশ্চয়ই, এমন কোনো তথ্য আছে, যা ফাঁস হলে রিচার্ডের বিপদ বাড়বে। এইসব কেনর জবাব আমায় জানতে হবে, বন্ধু। জঘন্য অপরাধ তো করেছেই, তার ওপর বাড়িতে ঘটে চলেছে একের পর এক নাটকীয় দৃশ্য। যে নাটকের প্রতিটি অঙ্গে আছে তীক্ষ্ণ খোঁচা দেবার শাণিত ক্ষমতা।

এমন সময় দরজা খুলে চৌকাঠ ডিঙোলেন মিস ক্যারোলিন ট্রেডওয়েল বলল, আপনি নাকি আমায় ডেকেছেন, মঁসিয়ে পোয়ারো। কী সব প্রশ্ন-ট্রশ্ন করতে চান।

কথা বলতে বলতে ক্যারোলিন ঘরের একেবারে ভেতরে চলে এলেন।

–ঠিকই বলেছেন, মাদাম পোয়ারো তার দিকে এগিয়ে এলেন, গুটি কয়েক প্রশ্ন, বেশি সময় নেব না, কথা দিচ্ছি।

ক্যারোলিনকে একটা চেয়ারে বসতে বলে নিজে একটা চেয়ার টেনে তার মুখোমুখি বসলেন। এই মুহূর্তে পোয়ারোর মুখ-চোখ দেখে মনে হচ্ছে, উনি বোধহয় মিস ক্যারোলিনের দুশ্চিন্তায় ডুবে আছেন।

-সত্যি, আপনার মুখ চোখের যে হাল হয়েছে, বোঝা যায় গতকালের ঘটনা আপনাকে কতখানি শোকাহত করেছে। পোয়ারোর কথায় সহানুভূতির সুর।

–আপনি হয়তো জানেন রিচার্ডের মা অকালে মারা যায়। তারপর থেকে এই সংসারের দায়িত্ব নিয়ে ভাই ক্লডের পাশে দাঁড়িয়েছি। নিজের সুখ-শান্তির দিকে নজর দিইনি, সেই ভাই আজ আর বেঁচে নেই।

-আমি তো মেনে নিতে পারছি না, ক্যারোলিনের গলায় কান্না উঠে এল।

.........কী আর বলি, অসুস্থ হয়ে বিছানা নিতে হয়েছে। আর বাড়ির লোকগুলোকে দেখুন, এমন একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল, কাজের লোকগুলোর কোনো হেলদোল আছে, যা নয়, তাই করে চলেছে আমার শরীর খারাপ, ওদের ওপর ছড়ি ঘোরাবারও কেউ নেই। যখন তখন খেয়াল খুশি মতো যেমন তেমন করে কাজ সারছে। ফ্রিজে তুলে রাখা খাবার বলা নেই কওয়া নেই, বের করছে, গরম করছে আর খাচ্ছে। ওরা এখন হাতির পাঁচ পা দেখেছে। কে বলবে, বাড়িতে একজন মারা গেছে, বুঝি বিয়ের মহোৎসব চলেছে। লুসিয়া আর বারবারারই কী দোষ বলুন। ওদের কি আমার মতো বয়স হয়েছে। নেই

কোনো অভিজ্ঞতা, নেই ধমকে-ধামকে কাজ করানোর বুদ্ধি। এ এক চরম বিশৃঙ্খলা! ভাগ্যিস কেনেথ ছিল, মানে ডঃ গ্রাহাম। ও আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। গতবছর নিউরাইটিসে ভুগেছিলাম। ছেলেটা আমায় চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলেছিল।

ক্যারোলিন একটানা বলে চললেন-বারবারা আর কেনেথের মধ্যে ভাব–ভালোবাসা আছে। ওরা বিয়ে করে ঘর-সংসার করার মনস্থ করেছে। কিন্তু কেন যে রিচার্ড ওদের পছন্দ করে না, জানি না। আমি অসুস্থ, লুসিয়ারও শরীর ভালো নেই। কেনেথের মতো একজন ডাক্তার জামাই পেলে তো আমাদের সুবিধা। আরে, কী সব বলে চলেছি। গত সন্ধ্যার কথাই ভাবুন। রাতের খাবার খেতে খেতেই লুসিয়ার শরীর হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়ল, বুজি বা জ্ঞান হারাবে। কিন্তু না, কোনো মতে নিজেকে সামলে মেয়েটা এখানে চলে এল। বুঝতেই পারছেন, কতই বা বয়স বেচারীর, তার ওপর নার্ভও বিশেষ ভালো নয়। অবশ্য ইটালিয়ান রক্ত যার শরীরে, তার নার্ভ মজবুত হতে পারে না। সেদিনের কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। কয়েক মাস আগের ঘটনা, লুসিয়ার হীরের নেকলেসটা চুরি হল। তখন...........

ক্যারোলিন থামলেন। বুঝি বা দম নিতে।

এই সুযোগে পোয়ারো একটা সিগারেট ধরালেন। জানতে চাইলেন মিসেস লুসিয়া অ্যামরির হীরের নেকলেস চুরি হয়েছিল? কতদিন আগের ঘটনা বলতে পারেন, মাদাম?

–ঠিক দিন ক্ষণ স্থির করে বলতে পারব না, দাঁড়ান বলছি–ক্যারোলিন মনে মনে কী যেন হিসাব করলেন। বললেন–মাস দুয়েক আগে। রিচার্ড আর ওর বাবার মধ্যে কথা

কাটাকাটি, এমনকি ঝগড়াও হয়েছিল। তারপরেই, যদুর মনে পড়ছে নেকলেসটার খোঁজ পাওয়া যায়নি।

পোয়ারোর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, তিনি আনমনে আঙুলের দিকে তাকালেন, ধীর পায়ে টেবিলে রাখা অ্যাশট্রের দিকে এগিয়ে এলেন। টোকা মেরে ছাই ঝাড়লেন। বললেন, আমি ধুমপান করছি, আপনার মনে হয় বিরক্ত লাগছে, তাই না, মাদাম?

-না না, ওসব বাতিক আমার নেই, মঁসিয়ে পোয়ারো, ক্যারোলিনের ঠোঁটে হাসি খেলে গেল–তাছাড়া পুরুষ ধূমপান করবে, এটাই তো স্বাভাবিক, আমার বেশ ভালো লাগে।

–ধন্যবাদ। আচ্ছা মাদাম, বলুন তো স্যার ক্লড আর তার ছেলের মধ্যে কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল? আপনি কি জানেন?

-কেন জানব না? বলছি শুনুন। রিচার্ড প্রচুর টাকা ধার করত, অবশ্য ব্যাপারটা ক্রমশ সীমার বাইরে চলে যাচ্ছিল। অবশ্য আমি এটাকে দোষ বলে মনে করি না, ওই বয়সের ছেলেরা দেনা করবে, এটাই স্বাভাবিক। তবে ওর বাবার কথা স্বতন্ত্র। ছোটবেলা থেকেই পড়া শোনায় ভালো, বলতে পারেন মেধাবী। এমন কোনো নেশা ছিল না, যা ধার-দেনা করে চালাতে হত। পরে গবেষণা করে প্রচুর টাকার মালিক হয়েছে, একথা অজানা নেই। তবে ওর কি দোষ ছিল না? রিচার্ড আর্মিতে চাকরি করত, জানেন। এটা-সেটা বোঝাল, চাকরিটা তাকে ছাড়তে বাধ্য করল। কিন্তু হাত খরচের টাকা পাবে কোথায়? বাবা কথা দিয়েও কথা রাখেনি। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা অশান্তিতে পরিণত হল। কদিন পরেই, শোনা গেল, লুসিয়ার হার পাওয়া যাচ্ছে না, আশ্চর্যজনকভাবে। পুলিশে ব্যাপারটা

জানানো হয়নি, কারণ লুসিয়ার আপত্তি। এটাও আমাদেরকে আরও বেশি আশ্চর্য করেছে।

-সত্যিই আশ্চর্য, মাদাম, পোয়ারো সায় দিলেন, লুসিয়ার মতো সুন্দরী তরুণী, দামী হীরের নেকলেস খুঁজে না পেয়ে কোনোরকম হৈ-চৈ করল না। ব্যাপারটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।

-লুসিয়াকে দেখে তখন মনে হত, সামান্য এক নেকলেশ হারিয়েছে তো অ্যামরি কী যায়-আসে, এমনই ভাব। আম'লো যা, আপনাকে এসব বকবক করে কী বলছি, আপনার কোন কাজে লাগবে?

-মাদাম, আপনি দ্বিধা বোধ করছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু আমি বলছি, আপনার মুখ থেকে এ পর্যন্ত যে সব তথ্য আমি পেলাম, আমার তদন্তের কাজে তা সাহায্য করতে পারে। মিস অ্যামরি, কোনোরকম সঙ্কোচ করবেন না, যেসব ঘটনা ঘটে গেছে, তা যত খুঁটিয়ে আমায় বলতে পারবেন, ততই আমার তদন্তের সুবিধা হবে। হ্যাঁ, পোয়ারো জানতে চাইলেন–গত সন্ধ্যায় ডিনারের টেবিলে বসে লুসিয়ার শরীর খারাপ লাগছিল, আপনি বলেছেন, তারপর? তারপর সে কি তার ঘরে চলে গিয়েছিল?

-নিজের ঘরে যেতে ওর বয়ে গেছে। ক্যারোলিনের মেজাজ বিগড়ে গেল। ডিনার হল থেকে বেরিয়ে ও সোজা এই লাইব্রেরি ঘরে এসে ঢুকেছিল। পরমুহূর্তে আমি এসে ঢুকলাম। কত রকম বুঝিয়ে সুজিয়ে সোফায় বসিয়ে দিয়েছিলাম। রিচার্ড আর লুসিয়া কী

সুন্দর জুটি বলুন তো। গত বছর রিচার্ড ইটালিতে গিয়েছিল। ওখানেই লুসিয়ার সঙ্গে পরিচয়। এবং প্রেম। নভেম্বরে বিয়ে করে বউকে নিয়ে রিচার্ড দেশে ফিরে আসে।

ক্যারোলিন একটু দম নিলেন। আবার বলতে শুরু করলেন–মাতৃপিতৃহীন মেয়েটা অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়েছে। ওর আত্মীয় স্বজনও বোধহয় কেউ নেই। না থেকে ভালোই হয়েছে। হাজার হোক বিদেশী তো। সর্বক্ষণ পেছনে লেগে থাকত, সুযোগ সুবিধা লাভের আশায়। বিদেশীদের স্বভাব-আচরণ আমার মোটেও সহ্য হয় না, সহ্য করা দায়। মাফ করবেন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার কথাটা আপনি আবার গায়ে নেবেন না। আপনি বিদেশী, তবে বেলজিয়ান। ইউরোপের প্রত্যেকটা যুদ্ধের আঁচ আপনাদের গায়ে লেগেছে, আপনারা, অর্থাৎ বেলজিয়ানরা কী দারুণ সাহসী, তা আমার জানা।

আসুন মাদাম, ওসব কথা বাদ দিয়ে আমরা কাজের কথায় আসি। বইয়ের শেলফে ওষুধ ভরতি ওই কালো টিনের বাক্সটা, সম্ভবত ওটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এসেছিল, তাই না? আপনারা গত সন্ধ্যায় এঘরে বসে ওটা খুলে ওষুধ ঘাঁটা ঘাঁটি করছিলেন তো।

-মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার কথাই ঠিক। ক্যারোলিন একটু থামলেন, কী ভাবলেন, তারপর আবার বললেন–আমিই ওটা নামিয়ে নিয়ে আসতে বলেছিলাম। ভাবলাম, যদি স্যালভলটাইল বা ওই জাতীয় কোনো ওষুধ থাকে, তাহলে লুসিয়ার জ্ঞান ফেরাতে কাজে লাগবে। আমার কথা মতো বারবারা চেয়ারে উঠে ওটা পেড়ে নিয়ে এল। সেই সময় ঘরে এসে ঢুকল আমার ভাই, আর ওর সেক্রেটারি এডওয়ার্ড রেনর ও আমার ভাইপো। ডঃ কারোলিও এসে জুটেছিল। দেখলাম ওষুধগুলো সম্পর্কে ডঃ কারোলির কৌতূহল বেশি।

তিনি ওষুধগুলো তুলে তুলে দেখছিলেন, নাম বলছিলেন আর ওদের শক্তির পরিচয় দিচ্ছিলেন। শুনে আমার তো চক্ষু ছানাবড়া।

–যেন ডঃ কারোলি এমন কোন ওষুধের গুণাবলীর কথা জানিয়ে দিলেন, যার ফলে আপনি ঘাবড়ে গেলেন?

–একটা টিউব উনি, অর্থাৎ ডঃ কারোলি তুলে নিলেন। টিউবের গায়ে ওষুধের নাম লেবেলে লেগে আছে। নামটা শুনে আমার সাধারণ ওষুধই মনে হচ্ছে। সমুদ্রে জাহাজে চেপে বেড়ানোর সময় সি-সিকনেস দূর করার জন্য যে ওষুধ আর কী, ওর ক্ষমতা আমার জানা আছে। বহু বার খেয়েছি কিনা। কিন্তু ডঃ কারোলি আমার ধারণা মিথ্যে করে দিলেন। তিনি জানালেন যে, এই ওষুধ এমন মারাত্মক ক্ষমতা সম্পন্ন বিষ, যার ক্রিয়ার ফলে অন্তত বারোজন শক্তিশালী পুরুষের জীবন কেড়ে নিতে পারে।

–ওষুধটার নাম সম্ভবত হিসকোসিন হাইড্রোব্রোমাইড?

-কারোলির কাছ থেকে সবাই জানলাম, এই ওষুধের বড়ি দশ-বারোটা খেলেই চলবে, নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে ঘুম, যে ঘুম জীবনে আর ভাঙবে না। তার হাত থেকে লুসিয়া টিউবটা একবার নিল। আহা! ডঃ কারোলির বর্ণনা শুনে কবি লর্ড টেনিসনের কথা মনে পড়ে যায়। টেনিসন মারা যাবার পর মৃত্যুর এমন কাব্যিক বর্ণনা কারো লেখায় পড়িনি।

–এই খেয়েছে, পোয়ারো আপনমনে বললেন, বুড়ি হয়েছে, অথচ রোমান্স কমেনি। কী যে করি এখন..... পোয়ারো নিজেকে স্বাভাবিক করলেন, বললেন আপনার মুখে লর্ড টেনিসনের নাম শুনে আমার মনে পড়ে গেল তার অমর কীর্তি চার্জ অব দ্য লাইট

ব্রিগেড-এর দুটো লাইন যেখানে বলা হয়েছে ক্যাননস্ ইন ফ্রন্ট অব দেম ভলিড অ্যান্ড থান্ডার্ড'। যাক টেনিসন ছেড়ে দিয়ে, যা বলছিলেন, তাই বলুন।

-কী বলছিলাম বলুন তো, মঁসিয়ে পোয়ারো ক্যারোলিন চুপ করলেন, মনে করার চেষ্টা করলেন। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল, তিনি আবার বলতে শুরু করলেন–খেয়াল করতে পারছিলাম না, সামান্য হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে, গুচ্ছের পুরোনো বাজনার রেকর্ড ছিল বুঝলেন, বারবারা কী খেয়ালে একটা টেনে নিয়ে এসে গ্রামোফোনে লাগিয়ে ছিল। মা গো মা, বিশ্রী রেকর্ড। যাচ্ছেতাই, ছেলেবেলায় ওই রেকর্ড শুনেছি। সকলে ছিঃ ছিঃ করত। যেমন তার কথা, তেমনই অর্কেস্ট্রা। মাথা গরম হয়ে গেল। চট করে উঠে গিয়ে ওটা থামিয়ে দিলাম।

তারপর? তারপর সেই পুরোনো ওষুধের টিউবের কথা বলছিলাম, ওটাই তো ডঃ কারোলি চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন, তাই না? আচ্ছা মাদাম, ওই টিউবটা কি ওষুধে পূর্ণ ছিল? নাকি....

-না, কোনো ফাঁক ছিল না, টিউবের মুখ অব্দি বড়িগুলো ছিল, চট করে জবাব দিলেন ক্যারোলিন। ডঃ কারোলির বলা কথাগুলো আমার খুব ভালো করেই মনে আছে। ওই টিউবের যতগুলো বড়ি আছে, তার অর্ধেকটাই নাকি দশ বারোজন শক্ত সমর্থ লোককে হত্যা করতে যথেষ্ট।

আবেগের বশে ক্যারোলিন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, নিজের মনে বলে চললেন– মঁসিয়ে পোয়ারো, জানেন, ওই ইটালিয়ান ডাক্তারটিকে গোড়া থেকেই আমার কেমন যেন

মনে হত। তবে লুসিয়ার পুরোনো বন্ধু কিনা তাই কঠোর আচরণ করতে পারিনি। তবে পছন্দও করতে পারিনি। আপনি যাই বলুন না কেন, লোকটা ফর্মুলা চুরি করার মতলব নিয়েই লুসিয়ার সাথে বন্ধুত্ব করেছে। তার বিশ্বাস অর্জন করেছে এবং শেষে এ বাড়ির অতিথির ছদ্মবেশে ঢুকে পড়েছেন।

পোয়ারো নির্বিকার চিত্তে কারোলিনের দিকে তাকালেন। তাকে আরও যাচাই করার জন্য প্রশ্ন করলেন–মাদাম, স্যার ক্লডের ফর্মুলা যে ওই ডঃ কারোলিই হাতিয়েছে এ ব্যাপারে আপনি ষোলো আনা নিশ্চিত, তাই তো?

-না হলে আর কে বা হতে পারে বলুন আপনি? গত সন্ধ্যায় যখন ঘটনাটি ঘটে, তখন আমরা সবাই বাড়ির লোক উপস্থিত ছিলাম এখানে, একমাত্র উনি ছাড়া। আমার ভাই স্যার ক্লডও মনে হয় তাকেই সন্দেহ করে ছিলেন। এবং নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, ডঃ কারোলিই তার ফর্মুলা-চোর, কিন্তু সরাসরি তাকে চোর সাব্যস্ত করতে তার আভজাত্যে বেধেছিল। কারণ ডঃ কারোলি লুসিয়ার পুরোনো বন্ধু, সেই সুবাদে এবাড়ির অতিথি। তাই ক্লড বুদ্ধি করে বাড়ির আনোগুলো নিভিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছিল। যাতে চোর আধারের সুযোগ পেয়ে জিনিসটি ফেরত দিতে পারে। ফলে চোরেরও সম্মান রক্ষা হল, আবার হারানো অমূল্য সম্পদ হাতে ফিরে এল। বলুন, স্যার ক্লড কি বোকমির কাজ করেছিল?

-মোটেও না, পোয়ারো সায় দিলেন। বরং স্যার ক্লড বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। মিস অ্যামরি, আমি দেখতে চাই গতকাল সন্ধ্যায় আপনি ঠিক কোন অবস্থানে ছিলেন। দয়া করে একবার সেখানে গিয়ে বসবেন?

ক্যারোলিন কথা না বাড়িঠে উঠে গিয়ে বসলেন সোফার একটা ধারে।

বাঃ ঠিক আছে। এবারে দু-চোখের পাতা এক জায়গায় করুন। করেছেন তো? ফিরে যান গত সন্ধ্যায়, আলো নিভে গেল, চারপাশ অন্ধকার। ঠিক আছে? নিঃসীম অন্ধকার। নিজেকে নিজে দেখা যায় না। এরকমই বিশ্রী এক অন্ধকারের মধ্যে কোনো ছোট-বড় আওয়াজ আপনার কানে এসেছিল? মনে করুন, চেষ্টা করুন।

ক্যারোলিন দু-চোখের পাতা এক জায়গায় করে বসে আছেন। ফিরে গেছেন গত সন্ধ্যার সেই নিকষ কালো অন্ধকারের গর্ভে।–হ্যাঁ, মনে আছে, একটা আওয়াজ, কেউ যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে দম নিচ্ছে, পরক্ষণেই কানে এল চেয়ার উলটে পড়ার আওয়াজ, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা আওয়াজ, ছোটখাট ধাতব টুকরোর জিনিস মাটিতে ফেলে দিলে যেমন হয়, ঠিক তেমনই শব্দ।

এখন দেখুন পোয়ারো একটা চাবি বের করে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেললেন। বললেন–এরকম আওয়াজ ছিল কি?

-আশ্চর্য! দুটো আওয়াজের মধ্যে এত মিল। মঁসিয়ে পোয়ারো, ঠিকই ধরেছেন। আওয়াজটা এরকমই পেয়েছিলাম। মাদাম তখনও চোখ বুজে আছেন।

মিস অ্যামরি, মনটাকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। দয়া করে থামবেন না।

এরপরেই লুসিয়ার আর্ত চিৎকার, সে তার শ্বশুরের নাম ধরে চিৎকার করছিল। পরক্ষণেই বাইরে আওয়াজ, দরজায় কে যেন টোকা দিচ্ছিল।

এই পর্যন্তই, আর কিছু নয়। মাদাম, আর একটু কষ্ট করুন। মনে করে দেখুন, দোহাই

–সবুর করুন, ভাবতে দিন। ক্যারোলিন মুহূর্ত খানেক পর আবার বললেন–হ্যাঁ, কাপড় ছেঁড়ার শব্দ, প্রথমেই শুনেছিলাম, মনে হল কে যেন তার পরনের পোশাক ছিঁড়ছে। বারবারা আমার পাশেই বসেছিল, অতএব সে নয়। লুসিয়া হতে পারে। সে-ই তার নিজের কাপড় ছিঁড়ছিল। মঁসিয়ে পোয়ারো আর চোখ বন্ধ করে থাকতে পারছি না। বলেন তো.......।

-হ্যাঁ, খুলুন। পোয়ারো এবার জানতে চাইলেন, গত সন্ধ্যায় স্যার ক্লডের জন্য কাপে কফি কি আপনিই ঢেলেছিলেন?

-না, আমি নয়, বেশ জোরালো কণ্ঠস্বর ক্যারোলিনের। আমার খুব ভালো ভাবেই মনে আছে, লুসিয়াই তার শ্বশুরের জন্য কাপে কফি ঢেলেছিল?

-কখন বলতে পারেন?

–ডঃ কারোলি যখন ওই মারাত্মক সর্বনাশা ওষুধগুলোর ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞান দিচ্ছিল, তার পরেই।

-কাপে কফি ঢালার পর স্টাডিতে কে নিয়ে গিয়েছিল? লুসিয়া?

–না, লুসিয়া কফি ঢেলে রেখেছিল। যতদূর খেয়াল আছে, ও নিয়ে যায়নি স্টাডিতে।

–তাহলে?

-তাহলে? থামুন, ভাবতে দিন, বলছি। ক্যারোলিন ফিরে গেলেন গত সন্ধ্যার দৃশ্যপটে। খানিক হাতড়ে বেড়ালেন। তারপরেই, লাফিয়ে উঠলেন–হ্যাঁ, পেয়েছি, লুসিয়া নয়, ও কেবল কফি ঢেলে ছিল। ওটা স্টাডিতে নিয়ে যাচ্ছিল স্যার ক্লডের সেক্রেটারি এডওয়ার্ড রেনর। লুসিয়া ওকে বাধা দিয়ে বলল, ওটা স্যার ক্লডের কফির কাপ নয়, এটা। বলে ইঙ্গিতে অন্য একটা কাপ দেখিয়ে দিল। তবে আশ্চর্যের কী জানেন, দুটো কাপের কফিই ছিল দুধ ছাড়া, অর্থাৎ কালো, আর চিনিও ছিল না।

তার মানে মঁসিয়ে রেনররই স্যার ক্লডকে কফির কাপটা দিয়ে এসেছিলেন। ব্যাপারটা তাই তো দাঁড়াচ্ছে? পোয়ারোর কপালে কুঞ্চন রেখা।

-হ্যাঁ, পরক্ষণেই মত পালটে ক্যারোলিন বললেন, না, ভুল বলা হল, ঠিক ওই সময় বারবারা তার ফক্সটট নাচের সঙ্গী হতে রেনরকে অনুরোধ করল। তাই রিচার্ড এগিয়ে এসে রেনরের হাত থেকে কাপটা নিয়ে ঢুকেছিল বাবার স্টাডিতে।

-ওহো, তাই বলুন। মঁসিয়ে রিচার্ডই শেষ পর্যন্ত কাজটা করেছিলনে তো?

— হ্যাঁ, কঠিন গলায় ক্যারোলিন সায় দিলেন।

-আচ্ছা, তার আগে রিচার্ড কী করছিলেন? উনিও কি বাজনার তালে তালে নাচছিলেন?

-না, রিচার্ড নাচের ধারে কাছে যায়নি। ও টিনের বাক্সে ওষুধগুলো ঠিকঠাক সাজিয়ে রাখছিল।

-তারপর কী কী ঘটল?

-তারপরে স্যার ক্লড স্টাডি থেকে বেরিয়ে এল, হাতে শূন্য কাপ। আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিল। বলল, কফিটা কেমন বিশ্রী রকমের তেতো লেগেছে। একবার নয়, একই কথা কয়েকবার বলেছিল। আমি তো অবাক, দারুণ তেতো কী করে হবে? আমি নিজে অর্ডার দিয়ে ওই কফি পাউডার তৈরি করিয়ে আনি, সেরা কফি। লন্ডনের আর্মি নেভি স্ট্রোস-এর দোকান আছে ভিক্টোরিয়া স্ট্রিটে, রেলস্টেশন লাগোয়া দোকান আমি..

ক্যারোলিনকে কথা থামাতে হল। কারণ তখন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়েছে এডওয়ার্ড রেনর। মাথা সোজা না করে পোয়ারোকে উদ্দেশ্য করে বলল–আপনার সঙ্গে কিছু দরকার ছিল, মঁসিয়ে পোয়ারো। আপনি ব্যস্ত দেখছি, আমি না-হয় পরে আসব।

পোয়ারো সামান্য হাসলেন–না না, ব্যস্ত নই। আপনি বসুন, আমি মিস অ্যামরিকে দরজা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে আসি।

-মঁসিয়ে পোয়ারো। ক্যারোলিন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন–মনে হয় না, আমার এ তথ্য আপনার কোনো কাজে লাগবে।

কারোলিন দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। পোয়ারো তার পেছন পেছন এসে দরজার পাল্লা খুলে দিলেন। ক্যারোলিন চৌকাঠের বাইরে পা রাখতে চলেছেন। এমন সময়

ফিসফিসিয়ে পোয়ারো জানালেন মাদাম, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনাকে আন্তরিকভাবে জানাচ্ছি, এসব তথ্য আপনি না বললে, হয়তো আমার অগোচরেই থেকে যেত।

বিদায় অভিবাদন জানিয়ে দরজার পাল্লা এঁটে দিয়ে পোয়ারো ঘরের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন–মঁসিয়ে রেনর, কী মনে করে আমার কাছে?

রেনরের সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন পোয়ারো–বলুন, কী বলতে এসেছেন? নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন।

মঁসিয়ে পোয়ারো, সত্যি আশ্চর্যের ব্যাপার, রেনর বলতে থাকল, সার ক্লডের কীভাবে মৃত্যু ঘটেছে, এই একটু আগে জানতে পেরেছি। মি. রিচার্ড অ্যামরি সব আমায় বলেছেন।

রেনরের চোখে আন্তরিকতা ঝরে পড়ছে। পোয়ারো তা লক্ষ্য করে জবাব দিলেন তাই বুঝি! আচ্ছা মি. রেনর..... কথা বলতে বলতে পোয়ারো তাঁর জ্যাকেটের পকেট থেকে সেই চাবিটা বের করলেন, যেটা স্যার ক্লড মারা যাবার পরে তার মৃতদেহের কাছে উলটে পড়ে থাকা চেয়ারের নীচে পড়েছিল। ...এটা দেখুন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবেন। কী মনে হয়?

পোয়ারো তার সন্ধানী চোখে রেনরকে জরিপ করতে লাগলেন।

চাবিটা হাতে নিয়ে রেনর দেখতে লাগল, এটা তো স্যার ক্লডের সিন্দুকের চাবির মতো দেখতে। খুঁটিয়ে আবার দেখল। তারপর সেটা পোয়ারোর হাতে ফেরত দিতে দিতে

বলল–এটা কী করে সম্ভব! আমি যতদূর জানি সিন্দুকের চাবিটা চাবির গোছাতেই আছে, রিচার্ডের মুখে অবশ্য শুনেছি।

-মঁসিয়ে রিচার্ড ভুল বলেননি, আপনার অনুমানও ঠিক, এটা স্যার ক্লডের সিন্দুকেরই চাবি, তবে, পোয়ারো তীক্ষ্ণ চোখে আবার সামনে বসে থাকা রেনরের দিকে তাকালেন বলতে পারেন এটা ওই চাবির দোসর, অর্থাৎ নকল। এবার পোয়ারো তার কণ্ঠস্বর এক পর্দা উঁচুতে তুলে, অবশ্য ইচ্ছাকৃত, বললেন–গত সন্ধ্যায় এঘরে আপনি যে চেয়ারে বসেছিলেন, তার তলা থেকে এটা পাওয়া গেছে।

একথা শুনে রেনরের চোখে-মুখের কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না। আগের মতোই সাবলীল ভঙ্গিতে বলল–আপনার কি ধারণা, চাবিটা আমিই চেয়ারের তলায় ফেলে দিয়েছিলাম? তাহলে বলব, আপনার অনুমান সম্পূর্ণ ভুল, মঁসিয়ে পোয়ারো।

পোয়ারো নীরব হলেন। রেনরকে দেখতে লাগলেন-সন্ধানী দৃষ্টিতে। তারপর ঘাড় নাড়লেন–আপনার কথাই ঠিক হয়তো।

পোয়ারো এবার চেয়ার ছেড়ে চলে এলেন সোফার একধারে। বসলেন, হাতের ওপর হাত রেখে ঘষে নিলেন। তারপর তাকালেন রেনরের দিকে–মঁসিয়ে রেনর, আসুন, আমরা এবার আপনার কাজ সম্পর্কে কিছু বলি। আপনিই তো স্যার ক্লডের সেক্রেটারি ছিলেন?

-হ্যাঁ।

তার মানে আপনি ওঁর গবেষণার কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ফলে অনেক গোপনীয় তথ্য আপনার জানা আছে, তাই না?

যেহেতু, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম, তাই গবেষণার কাজে স্যার ক্লডকে একটু আধটু সহায়তা করতে হয়েছে বৈকি!

গবেষণার সঙ্গে যুক্ত নয়, অথচ এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার ওপর আলোকপাত করতে পারে, এমন কিছু কি আপনার নজরে পড়েছে? এমন কিছু যার সঙ্গে স্যার ক্লডের হত্যাকান্ডটি সম্পর্কিত?

মি. রিচার্ড অ্যামরি তার বাবার কাছে আসা চিঠিপত্রগুলি বেছে আমাকে আলাদা করে রাখতে বলেন। সেইমতো বিদেশ থেকে আসা চিঠিপত্রের গোছা থেকে চিঠিটা পেয়েছি, দু-দিন আগে এটা এসেছিল। রেনর একটা খাম পোয়ারোর দিকে এগিয়ে দিল।

পোয়ারো তাকালেন, খামের মুখটা ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছে বোঝা গেল। পোয়ারো হাত বাড়িয়ে খামটা নিলেন। ভেতর থেকে চিঠিটা বের করলেন। ঘরে উপস্থিত সকলকে শুনিয়ে পড়তে লাগলেন–

.............আপনি একটা সাংঘাতিক বিষাক্ত সাপকে স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে বুকে আশ্রয় দিয়েছেন।

–হুক-এর অর্থ এখানে কী হতে পারে? পোয়ারো তাকালেন তার সহকারী ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর দিকে, মনে হল প্রশ্নটা তিনি তার উদ্দেশ্যেই ছুঁড়ে দিয়েছেন।

তারপর আবার চিঠির পাতায় নজর দিলেন পোয়ারো–বিষধর নাগিনী সেলমা গেতজ........

–এই মহিলার পরিচয় কী?

–জানতে চান, তাহলে শুনুন। পোয়ারো সোফায় হেলান দিয়ে আরাম করে বসলেন, বললেন–সেলমা গেতজ একজন মহিলা গুপ্তচর। মেয়ে গুপ্তচরের তালিকায় তার নাম সবার ওপরে ছিল। অসাধারণ সুন্দরী ছিল, কাজের সফলতায় সে ছিল সবার সেরা। ইটালি, ফ্রান্স, জার্মানির হয়ে সে নির্ভয়ে কাজ করত, সব শেষে রাশিয়াও ওকে গুপ্তচরগিরিতে কাজে লাগিয়েছিল।

-'ছিল' মানে! এ কি অতীত? রেনর জানতে চাইল।

তার মানে হল...........

তার মানে হল সেলমা গেতজ সত্যিই আজ অতীত হয়ে গেছে। জেনোয়ার এক বন্দীশালায় তার মৃত্যু হয়েছিল।

এই চিঠির অন্তর্নিহিত অর্থ যে ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর বোধগম্য হয়নি তা বুঝতে দেরি হল না পোয়ারোর। তিনি হাত বাড়িয়ে বন্ধুর কাছ থেকে চিঠিটা ফিরিয়ে নিলেন।

–বোকা বানানোর জন্য এই চিঠি। রেনর তার অভিমত প্রকাশ করল।

সেলমা গেতজ আর তার ডিম ফুটে বাচ্চা.........–কথাগুলি নিয়ে পোয়ারো আপন মনে বিড়বিড়িয়ে উচ্চারণ করতে লাগলেন, বাচ্চা বেরিয়েছে কথার অর্থ কী? কী বলতে চাইছে?

খানিকবাদে তিনি তার চিন্তার তল থেকে উঠে এলেন। বললেন–সেলমা গেতজের একটা মেয়ে ছিল বলে জানি, মায়ের মতোই, সে ছিল অপরূপ সুন্দরী। সেলমা গত হলে মেয়েটির আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। কোথায় গেছে কেউ জানে না, কেমন এক রহস্যজনক ব্যাপার.....

চিঠিটা খামের মধ্যে ভরে পোয়ারো সেটাকে নিজের জ্যাকেটের পকেটে চালান করে দিলেন।

–হতে পারে.........রেনর কী বলতে গিয়ে ও বলল না।

পোয়ারো তাড়া দিলেন–কী হল, থেমে গেলেন কেন? বলুন, কী বলতে চাইছেন

–একটা ইটালিয়ান মেয়ের কথা বলছি। রেনর বলে চলল, একটু নীচু গলায়–এবাড়ির বউ, শ্রীমতী লুসিয়া অ্যামরি, ইটালি থেকে আসার সময় সঙ্গে করে একটি মেয়েকে নিয়ে আসেন। নাম ভিক্টোরিয়া সুজিও। এ-ও সুন্দরী। সে মিসেস অ্যামরির খাস চাকরানি বলতে পারেন। মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি যার কথা বলছিলেন, মানে সেলমা গেতজ-এর মেয়ে এ হতে পারে, তাই নয় কি!

হতে পারে। পোয়ারো আনমনে জবাব দিলেন, তবে দারুণ তথ্য, তলিয়ে ভাবতে হবে।

–তাহলে, মঁসিয়ে পোয়ারো বৃথা সময় অপচয় করার দরকার নেই। আমি এখুনি ওকে ডেকে দিচ্ছি। রেনর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, খোঁজ খবর নিন, দেখুন জবাব মেলে কিনা।

আরে, এত ব্যস্ত হওয়ার কী আছে! পোয়ারো বাধা দিয়ে বললেন–আগেভাগে জেনে গেলে মেয়েটা সাবধান হয়ে যাবে। বরং মিসেস লুসিয়া অ্যামরির কাছে জানতে হবে মেয়েটা সম্পর্কে। আশা করি কিছু তথ্য হাতে পাব।

হতে পারে। তাহলে মিসেস লুসিয়া অ্যামরিকেই বলে দিচ্ছি, আপনি তাকে ডাকছেন।

কথা শেষ করে রেনর বিদায় অভিবাদন জানিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

-এতক্ষণে ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হল। ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর কথায় উত্তেজনা ঝরে পড়ল। ডঃ কারোলি আর লুসিয়ার কাজের মেয়েটি আসলে কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের গুপ্তচর। স্যার ক্লড অ্যামরির মূল্যবান ফর্মুলা হাতানোর জন্য সুঁচ হয়ে ঢুকে পড়েছে এ বাড়িতে ঠিক তত?

বন্ধুর কথা পোয়ারোর কানে গেল বটে, কিন্তু সাড়া দিলেন না, তিনি তখন গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন।

হেস্টিংস, পোয়ারোর এই উদাসীনতায় রেগে গিয়ে বললেন–কী হল? তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না। এবার একটু চড়া গলায় আগের কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করলেন স্যার

ক্লডের ফর্মুলা ওই ডঃ কারোলি আর লুসিয়ার কাজের মেয়েটা চুরি করেছে, তাই কিনা? ওরা কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের গুপ্তচর?

-তোমার বুদ্ধির বহর দেখে হাসি পাচ্ছে। পোয়ানোর ঠোঁটে হাসির ঝিলিক।

–হাসছে যে! হেস্টিংস চড়া সুরে জানতে চাইলেন, তোমার কি ধারণা বলল।

–এখনও কিছু বলার সময় হয়নি, ভায়া। প্রশ্নের পর প্রশ্ন এসে ভিড় করেছে। আগে এগুলোর ঠিকঠাক জবাব পাই, তার পর না-হয় সিদ্ধান্তে যাওয়া যাবে। পোয়ারো বললেন, ধরো এই প্রশ্নটা লুসিয়া অ্যামরির হীরের নেকলেস চুরি হওয়া সত্ত্বেও পুলিশে খবর তিনি দিতে দিলেন না। কেন বলতে......

পোয়ারোর কথা শেষ হল না, ঘরের ভেতরে এসে পা রাখল লুসিয়া, হাতে ঝুলছে। সেই ব্যাগটা।

-বলুন, মঁসিয়ে পোয়ারো, কোনো ভনিতা না করে লুসিয়া জানতে চাইল, তার কথায় বা আচরণে ভয়ের ছাপ নেই, বেশ সপ্রতিভ বলা চলে। কী জন্য ডেকেছেন?

-হ্যাঁ, মাদাম। বলছি। একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে পোয়ারো বললেন বসুন। তারপর আমার প্রশ্ন শুনবেন।

লুসিয়া চেয়ারে বসল। পোয়ারো চাইলেন না, এই প্রশ্নোত্তর পর্বে ক্যাপ্টেন হেস্টিংস যোগ দিল। খোলা ফ্রেঞ্চউইন্ডোর দিকে হেস্টিংসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, বন্ধু, দেখেছ

বাইরের দিকে, কী সুন্দর পরিবেশ। ঘরের মধ্যে বসে না থেকে, যাও, প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করো। এমন সুযোগ কখনো ফিরে পেতে নাও পারো।

হেস্টিংস-এর ইচ্ছা ছিল না, তবু পোয়ায়োর নির্দেশ অমান্য করতে পারলেন না। তিনি একটা জানলা টপকে ঘরের বাইরে চলে এলেন, পা রাখলেন বাগানে।

অযত্নে বড় হয়ে উঠেছে ফণিমনসার ঝোপ, আরও কত নাম না জানা গাছ। ঘাসের ডগাগুলো না ছাঁটার ফলে বেশ মাথা তুলেছে। ঝোপগুলোকে এড়িয়ে হেস্টিংস লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোলেন।

হঠাৎ তাকে থামতে হল। কান পাতলেন। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে এক নারী ও পুরুষ–দু'জনের মধ্যে কথা বলাবলি করছে। ওদের কণ্ঠ চিনতে দেরি হল না তার –নিশ্চয়ই বারবারা আর ডঃ কেনেথ গ্রাহাম। চুপিসাড়ে হেস্টিংস এসে দাঁড়ালেন একটা বড় গাছের আড়ালে। হ্যাঁ যা ভেবেছেন ঠিক তাই দুজনে খুব কাছাকাছি বসে আছে একটা বেঞ্চে। ওরা কী বিষয় নিয়ে কথা বলছে? স্যার ক্লড ও তার ফর্মুলা চুরির বিষয়ও হতে পারে। শুনতে হয়।

হেস্টিংস অত্যন্ত সতর্কভাবে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে সেই বেঞ্চের কাছাকাছি চলে এলেন। কান পাতলেন

-রিচার্ড মুখেই আমায় বন্ধু বন্ধু বলে, আসলে, ডঃ গ্রাহামের কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ ঝরে পড়ছে, সে আমাকে একটা গেঁয়ো ডাক্তার ছাড়া আর কিছু মনে করে না। আর তাই সে আমাদের এই মেলামেশা বরদাস্ত করতে পারছে না।

ফুঃ, রিচার্ডের কথা ছাড়ো তো। বারবারা তুড়ি মেরে সরিয়ে দিল গ্রাহামের অভিযোগ, ও একটা মেরুদণ্ডহীন পুরুষ। মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারে চাকরি করার সময়ও দেখিনি, চাকরি ছাড়ার পরেও নয়–বাবার বিরুদ্ধে কোনোদিন রুখে দাঁড়িয়েছে? ও একটা মেনিবেড়াল। না হলে বউকে নিয়ে কবেই এখান থেকে কেটে পড়ত। কেনি, তুমি রিচার্ডকে নিয়ে মাথা ঘামিও না। আমায় দেখতো, আমি তো ওর খুড়তুতো বোন, আমি ওকে গ্রাহ্য করি!

-রিচার্ডকে আমি গ্রাহ্যের মধ্যে ধরি না। যাক, সে কথা, ডঃ গ্রাহাম বলে চললেন, শোনো বারবারা, তোমাকে যেজন্য এখানে ডেকে পাঠিয়েছি, তার প্রথম কথাটা আগে বলি। তোমার জ্যেঠুকে গত সন্ধ্যায় বিষ খাইয়ে কেউ বা কারা খুন করেছে।

–এ বাসি খবর। বারবারার চোখে মুখে বিরক্তি ওই বেঁটে লোকটা, গোয়েন্দাগিরি চালিয়ে সারা বাড়িতে হুলস্থুল ফেলে দিয়েছে। এসব কথা কি জানতে কারো বাকি আছে গো!

–খবরটা তোমাকে চমকে দেয়নি? মন নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে, তাই না?

–নিশ্চয়ই, বাড়ির কেউ মারা গেলে মন বিষণ্ণ হবেই। ব্যাস এইটুকুই, কেনি।

বারবারার চাছা ছোলা কথা শুনে ডঃ গ্রাহাম বুঝি একটু অবাক হলেন।

-কেনি, আমি ন্যাকা-ন্যাকা কথা বলতে পছন্দ করি না। জেনে রেখো, ওই বুড়োটা মরেছে, আমার হাড় জুড়িয়েছে।

বারবারা! ডঃ গ্রাহাম কঠিন গলায় বললেন, কী আবোল তাবোল বকছু!

-কেনি, আমাকে ধমকিয়ো না, হতে পারে বড় বিজ্ঞানী, কিন্তু লোকটা ছিলেন হিংসুটে আর স্বার্থপর। নীচু মনের মানুষ। তোমাকে আমার জ্যেঠুর এমন অনেক ঘটনার কথা এখানে বসেই আগে কত শুনিয়েছি। উনি কেবল নিজের গবেষণা আর টাকাকে চিনতেন। পরিবারের কারো প্রতি ভালো ব্যবহার কখনো করেননি। এমনকি নিজের ছেলের প্রতিও নিন্দনীয় ব্যবহার করেছেন। কেনি, তুমি তো জানো, বাবার কথায় রিচার্ড মিলিটারির চাকরিটা ছেড়ে দিল। কিন্তু তার চলবে কী করে? জ্যেঠু তাকে এক পয়সাও হাত খরচা হিসাবে দিতেন না। কিপটে বুঝলে হাড় কিপটে। রিচার্ডের বউটার কথা ভেবে দেখ। সুন্দরী অল্প বয়সী মেয়ে। সেও ছিল। জ্যেঠুর চোখের শুল। উঠতে-বসতে বউটাকে কম অপমান করেননি। তাই বলছি, রিচার্ড যদি সত্যিই পুরুষের মতো পুরুষ হত তাহলে বউকে নিয়ে কবেই অন্য কোথাও চলে যেত।

বারবারা বলে চলল–আহা, বেচারী, মেয়েটার মুখের দিকে তাকাতে পারতাম না। লজ্জায় অপমানে সাদা গালদুটো লাল হয়ে উঠেছে। এসব দেখে আমার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠত। জ্যেঠুর দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ যে করব, সে অধিকার আমার কোথায়, আমি নিজেই অসহায় এক আশ্রিতা।

বারবারা, আমায় বলো তো, তোমার জ্যেঠুকে যে বিষ খাইয়ে খুন করা হল, এর অন্তরালে কার হাত আছে বলে তোমার মনে হয়? ধরো টাকা কড়ি–বিষয় সম্পত্তির লোভে, মানে রিচার্ড, সে কি তার বাবার খুনী? তোমায় কথা দিচ্ছি, তুমি যেসব গোপনকথা বলবে, তা আর তৃতীয় কানে পৌঁছবে না। তোমার যাতে বিপদ না হয়, সে ব্যবস্থাও করব, কথা দিচ্ছি, এমনকি পুলিশি ঝামেলা থেকে তোমাকে বাঁচাব।

-কেনি, দয়া করে এবার থামবে, আমার আর এসব শুনতে ভালো লাগছে না। বারবারা খেঁকিয়ে উঠল। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিল দেখ, কী সুন্দর সোনালী রোদে চারদিক ভরে উঠেছে। এসো, দুজনে মিষ্টি মধুর প্রেমের গল্প করি। রিচার্ডের বাবার খুনের পর্ব বাদ দিয়ে সুন্দর একটা কবিতা শোনাতে পারো তো? তুমি কি আমার কাছ থেকে জানতে চাইছ, ছেলে তার বাবাকে খুন করেছে কিনা। সত্যি বলছি কেনি, তোমার মনোভাব আগাম জানতে পারলে কে আসত তোমার ডাকে।

–শান্ত হও, বারবারা। তোমার জ্যেঠুর মৃত্যুটা যে স্বাভাবিক নয়, তা তো তুমি স্বীকার করো। রিচার্ডকে আমি খুনী বলে সন্দেহ করি না, তবে ওর বাবার খুনের কিনারা করার জন্য পুলিশের দ্বারস্থ হতে চায় না। এর কারণ কী? ওর ভাবগতিক দেখে মনে হয়, পুলিশি তদন্ত হলে এমন কিছু গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে, যা ওকেই দোষী বলে সাব্যস্ত করবে। তবে পরিস্থিতিটা এখন এমন পর্যায়ে এসে গেছে যে, ও কেন, অন্য কেউ চাইলেও পুলিশি তদন্ত বন্ধ করতে পারবে না। কারণ এটা একটা খুনের মামলা। তোমার জ্যেঠুর পাকস্থলীতে মারাত্মক বিষ মেশানো কফি পাওয়া গেছে। রিচার্ড আমার ওপর ক্ষেপে আছে। ও মনে করে আমি ইচ্ছে করে ওর বাবার ডেথ সার্টিফিকেট দিইনি। আমি ওদের পুলিশি ঝামেলায় ফেলতে চাই। ডাক্তার হয়ে ওর ইচ্ছে মতো ডেথ সার্টিফিকেট কী ভাবে দিই বলল তো।

-বুঝলাম, চুলোয় যাক এসব, শোনো, আর দেরি করা যাবে না, বারবারা বলল, আমি জানলা দিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ছি, তুমিও বাগান থেকে বিদায় হও। পরে দেখা করব, বুঝেছ?

কথা শেষ করে বারবারা ঝোঁপের পাশ ধরে জানলার দিকে পা চালাল। অগত্যা ডঃ গ্রাহামকে উঠতে হল, বড় একটা নিশ্বাস ফেলে এগিয়ে গেলেন নিজের পথে।

এতক্ষণ ক্যাপ্টেন হেস্টিংস ঘাপটি মেরে বসে সব শুনছিলেন। বারবারা ও ডঃ কেনেথ চলে যেতেই পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন খোলা জানলার দিকে।

***

লুসিয়া মুখ টিপে বসেছিল। ক্যাপ্টেন হেস্টিংস জানলা দিয়ে ঘরের বাইরে চলে যেতে বুঝি সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল–মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি নাকি আমার কাজের মেয়েটাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান। মি. রেনরের কাছে শুনলাম।

কাজের মেয়ে নয়, আপনার সঙ্গেই আমার কথা আছে, মাদাম।

একথা শুনে লুসিয়া চমকে উঠল, পোয়ারোর চোখ তা এড়াল না।

–আমার দোষ নেবেন না, মাদাম। মিঃ রেনরের ইচ্ছে হয়েছে, তিনি বলেছেন, এক্ষেত্রে আমার কী করার আছে বলুন। বিশ্বাস করুন, আপনার কাজের মেয়ে সম্পর্কে কোনো তথ্যের প্রতি আমি আগ্রহী নই।

–তাহলে? আপনাকে তো আমি সবই বলেছি, মঁসিয়ে পোয়ারো, তাহলে আবার কেন?

পোয়ারো লক্ষ্য করলেন, লুসিয়ার মুখে-চোখে সে ভীতিভাব এখন অনুপস্থিত।

-মাদাম, আপনি কি ভুলে গেছেন, লুসিয়ার চোখে চোখ রাখলেন পোয়ারো, গত সন্ধ্যায় স্যার ক্লডের আকস্মিক মৃত্যুর পর এ বাড়ির সকলে আমাকে তক্ষুনি বিদায় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু একমাত্র আপনিই আমাকে তদন্তের কাজ চালাতে অনুরোধ করেছিলেন এমনকি আপনি যে আমার ওপর সম্পূর্ণ মাত্রায় আস্থাশীল, সে কথাও জানিয়ে ছিলেন। কী, আমি কি মিথ্যে বললাম?

-হয়তো না। লুসিয়া উদ্ধত গলায় জবাব দিল, কিন্তু তাতে কী হল?

–এখন আপনাকে আমি বলছি, আপনি আমার প্রতি সত্যিই আস্থা রাখতে পারেন।

–মঁসিয়ে পোয়ারো, ভনিতা না করে কাজের কথায় আসুন।

-মাদাম, পোয়ারোর কণ্ঠস্বর কঠিন, আপনার জীবনে কোনোকিছুর অভাব আছে কি? আপনি রূপসী যুবতী, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা–শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করেছেন। আছে সাধারণ ভদ্রতাবোধ। শুধু একটা জিনিসের অভাব আছে, সেটি হল এমন কোনো বিশ্বাসী লোক, যাকে ভরসা করতে পারেন, মনের না বলা কথা উজাড় করে তাকে শোনাতে পারেন। পোয়ারো তাকালেন লুসিয়ার দিকে আপনি বয়েসে আমার থেকে অনেক ছোট, আপনার বাপের বয়সী, মনে করলে আমাকে অনায়াসে বিশ্বাস করতে পারেন।

লুসিয়া কিছু বলতে গিয়ে বাধা পেল। পোয়ারো আবার বললেন আমার কথাগুলো ভালোভাবে চিন্তা করুন। আপনি আমার সহায়তা চেয়েছিলেন, আমি সায় দিয়ে থেকে গেলাম এখানে। আপনাকে আমি সত্যিই সাহায্য করতে চাই, বিশ্বাস করুন, মাদাম।

–আপনার কি মনে পড়ে, আজ সকালের কথা, কী বলেছিলাম? বলেছিলাম, আপনার এখানে থাকার দরকার নেই, চলে যান। লুসিয়া সহজভাবে বলে চলল, হ্যাঁ, মানছি আপনি আমায় সাহায্য করতে চান, আমিও তা আশা করি, মঁসিয়ে পোয়ারো। আপনি চলে গেলেই আমার সহায়তা হবে।

-মাদাম, ভুলে যাবেন না, এখান থেকে চলে যাওয়াটা আপনার মর্জির ওপর নির্ভর করছে না, সেটা আমার ইচ্ছের অধীন। মনে চাইলে এক্ষুনি চলে যেতে পারি। কিন্তু মাদাম, আপনি আমাকে তাড়ালেও পুলিশের তদন্ত বন্ধ করবেন কী করে? আপনি হাজার বারণ করলেও গ্রাহ্য করবেনা। তদন্তের কাজ শেষ করে তবে অন্য কথা। এটা কি আপনি ভেবে দেখেছেন? তাছাড়া যাদের হয়ে আপনি ওকালতি করছেন, তারাও নিশ্চয়ই ব্যাপারটা তলিয়ে দেখছেন না।

-কী বললেন, পুলিশ? বোঝা গেল লুসিয়া একটু ঘাবড়ে গেছে। ওদের এখানে কী দরকার?

-স্যার ক্লডের পাকস্থলী কাটাছেঁড়া করে বিষ মেশানো কফি পাওয়া গেছে, ডঃ গ্রাহামই পুলিশে খবর দিয়েছেন। অতএব সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে পুলিশের আগমন।

....ন.... ..ন... আ..... না। এ কখনো হতে পারে না। লুসিয়া ভয়ে কেঁদে ফেলল।

–পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, তাতে আপনার বারণে কিছু যায় আসে না। এবার ভেবে দেখুন, আপনি কী করবেন? সিদ্ধান্ত আপনার। তবে এখনও পর্যন্ত আপনাকে সহায়তা

করার চেষ্টা করে যাচ্ছি, অবশ্য আপনি চাইলে। পরে হয়তো পুলিশ আর আইনকে সহায়তা করতে বাধ্য হব।

বেশ, আমি রাজী। লুসিয়া সরাসরি পোয়ারোর দিকে তাকাল, বলুন, কী জানতে চান?

–আমি জানতে চাইছি, আপনি কেন সত্যি কথাটা গোপন রেখেছেন? পোয়ারো সহজভাবে জানতে চাইলেন।

কী যা-তা বলছেন, মঁসিয়ে পোয়ারো। কোন সত্যি কথা আমি চেপে রেখেছি। আপনাকে বোঝা দুষ্কর। বলুন, কী বলবেন? কথা দিচ্ছি, সব বলব!

পোয়ারো তার ঝুলি থেকে সেই চিঠিটা বের করলেন, যেটা খানিক আগে এডওয়ার্ড রেনরের কাছ থেকে পেয়েছেন কয়েকদিন আগে এই চিঠিটা স্যার ক্লডের কাছে এসেছিল। চিঠিটা লুসিয়ার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন পোয়ারো, নজরদার' শব্দটা লক্ষ্য করুন। আমি নিঃসন্দেহ, প্রেরক নিজের নাম গোপন রাখতে চায়, তাই ওই শব্দের ব্যবহার।

লুসিয়া খুব মন দিয়ে তীক্ষ্ণ নজরে চিঠিটা পড়ল। তারপর মাথা তুলে অবাক বিস্ময়ে জানতে চাইল–এসবের মানে কী?

লুসিয়া যে ভেতরে ভেতরে ভীষণ ঘাবড়ে গেছে, পোয়ারোর তা বুঝতে দেরি হল না, কিন্তু তার মুখে-চোখে প্রকাশ ঘটেছে।

পোয়ারো সহজভাবে জানতে চাইলেন–সেলমা গেতজ-এর নাম লেখা আছে, দেখেছেন নিশ্চয়ই। এই নামের সঙ্গে আপনার পরিচিতি আছে কি?

-সেলমা গেতজ। এমন নাম জীবনে শুনিনি। কে ইনি?

গেল বছর নভেম্বরে জেনোয়ার এক জেলে তার মৃত্যু হয়েছে।

–তাই?

–হয়তো সেখনেই আপনার সাথে ওঁর দেখা হয়েছিল, চিঠিটা জ্যাকেটের পকেটে রাখতে রাখতে পোয়ারো বললেন, এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ মাত্রায় নিশ্চিত।

–মঁসিয়ে পোয়ারো, লুসিয়া ভীষণ চটে গেছে, কর্কশ কণ্ঠে বলল–জেনোয়ায় কোনোদিন আমি যাই-ই নি, ওর সঙ্গে দেখা হওয়াতো দূরান্ত।

–মিথ্যে বলছেন, যদি বলেন, জেনোয়াতে আপনাকে সেলমা গেতজের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেছে, তাহলে কী বলবেন?

-বলব, তার দেখার মধ্যে ত্রুটি রয়ে গেছে।

কিন্তু মাদাম, আমাকে আপনি ঠকাতে পারবেন না, পোয়ারো জোর দিয়ে বললেন, জেনোয়াতেই আপনার স্বামী রিচার্ডের সঙ্গে আপনার প্রথম দেখা হয়েছিল। এই ধরনের খবর আমি পেয়েছি।

–কে দিয়েছে আপনাকে এ খবর? রিচার্ড নিশ্চয়ই? নাঃ, রিচার্ডের স্মরণশক্তি অত্যন্ত দুর্বল। ও কি করে ভুলে গেল আমাদের প্রথম দেখার সেই জায়গাটা। মঁসিয়ে পোয়ারো, ওটা জেনোয়া নয়, মিলান।

-তাহলে জেনোয়াতে যে মহিলার সঙ্গে আপনি ছিলেন......

–এক কথা বারবার কেন বলছেন? জেনোয়াতে আমি এবয়সে এখনও যাইনি, বুঝেছেন?

বোঝা গেল লুসিয়া খুব চটে গেছে।

হতে পারে, দুঃখিত মাদাম, আসলে ব্যাপারটা এতই গোলমেলে যে—

গোলমেলে! কোন ঘটনার কথা বলছেন?

–জানতে যখন চাইছেন তখন আর আড়াল করব না।

এরকুল পোয়ারো বেশ আয়েস করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। আমার এক বন্ধু আছেন, লন্ডনেই থাকে। প্রেস ফটোগ্রাফার। ওর বাছাই করা ভোলা ছবি বেশ নামকরা কাগজগুলোতে ছাপা হয়। ম্যাগাজিনগুলোও বাদ যায় না। ফটো ভোলার দৌলতে বেচারাকে চরকির মতো ঘুরতে হয়। নামজাদা ফ্যাশান মডেল, সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিদুষী ও সুন্দরী যুবতীদের ফটো তুলে লন্ডনের প্রেসে পাঠিয়ে দেয়। সেগুলো ছেপে বের হয় কাগজে। সমুদ্রের ধারে বালির ওপর শুয়ে কোনো রূপসী কন্যা রোদন করছে–এমন কত ছবি।

....গতবছরের কথা বলছি। নভেম্বর মাস। বন্ধু তখন জেনোয়াতে গিয়েছিলেন নিজের পেশার সুবাদে। সেখানে এক রূপসী মহিলার সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছিল। মহিলার নাম ব্যারোনেস দ্যা গিয়ার্স। কোন নামজাদা ফরাসী কূটনীতিকের রক্ষিতা। এ ব্যাপারে মহিলার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তাছাড়া ওই কূটনীতিক তার গোপন প্রেমলীলা বেশ ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করে দিয়েছিলেন, অর্থাৎ তিনি সত্যকে আড়াল করার পক্ষপাতী ছিলেন না, মাদাম, এবার বুঝতে পারছেন, সত্য একদিন যেভাবেই হোক প্রকাশিত হবে, চাপা রাখা যায় না। আপনার শুনতে কি ভালো লাগছে না?

-আপনি যে ছাই কী বলতে চাইছেন, তাই বুঝতে পারছি না।

–বেশ, একটু সময় দিন। বুঝিয়ে দিচ্ছি। কথা বলতে বলতে পকেট থেকে পোয়ারো নোটবইটা টেনে বের করলেন। পাতা ওল্টাতে থাকলেন। বললেন–কাজের কথায় আসি। ওই মহিলা অর্থাৎ ব্যারোনেস দ্য গিয়ার্স নামে যিনি নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন, তার ফটো আমি দেখেছি, অর্থাৎ আমায় বন্ধুটি দেখিয়েছিলেন। মহিলার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল একজন প্রাক যুবতী। আমি অবাক বিস্ময়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। অপরূপ সুন্দরী, কেবল আমি নয়, যে দেখবে, সে আর জীবনে ওই মুখচ্ছবি ভুলতে পারবে না।

পোয়ারো উঠে দাঁড়ালেন, নোটবইটা চালান করে দিলেন পকেটে। বললেন–সেই মুখ আবার আমি দেখতে পেলাম। কোথায় জানেন? এই বাড়িতে যেদিন সন্ধ্যায় এসে পা রাখলাম। ফটোয় দেখা মেয়েটির সাথে হুবহু একরকম। তাকে চিনতে আমার দেরি হল না।

–হুঁ, লুসিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। কী যেন চিন্তা করল। তার ঠোঁটে ফুটে উঠল কৃত্রিম হাসির ঝিলিক–আপনি আমার থেকে কী জানতে চাইছেন বুঝতে পেরেছি। ফটোর ওই মহিলা, মানে ব্যারোনেস দ্য গিয়ার্সকে আমি খুব ভালো ভাবেই চিনি। ওঁর সৌন্দর্য আমাকে পাগল করে দিত। ওর সঙ্গ ভালো লাগত। তাই প্রায়ই সময় ওর বেড়ানোর সঙ্গী হতাম। আর ওর মেয়েটার কথা বলছেন? ও তো একটা ক্যাবলা, বুদ্ধিসুদ্ধি বলে কিছু নেই। মনে হয়, যখন আমি ওই মহিলার সঙ্গে বেড়াচ্ছিলাম, তখন আপনার দেখা ফটোটা তোলা হয়েছিল। মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন।

পোয়ারো চুপ, কেবল আলতোভাবে ঘাড় নাড়লেন, লুসিয়া বুঝি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

-কিন্তু মাদাম, পোয়ারো সামান্য ঝুঁকে পড়ে চোখ ছোট করে জানতে চাইলেন, আপনি যে কখনোই জেনোয়াতে যাননি, তাহলে..

আচমকা ধরা পড়ে যাওয়ায় লুসিয়া নিজেকে গুটিয়ে নিল। পোয়ারোকে নিরীক্ষণ করতে থাকল। আর পোয়ারো? তিনি পকেট থেকে নোটবইটা আবার বের করলেন বটে, পরক্ষণে সেটা জ্যাকেটের চোরা পকেটে রেখে দিলেন।

-কই, ফটোটা দেখান তো?

লুসিয়ার প্রশ্নের জবাবে পোয়ারো বললেন তা সম্ভব নয়, কারণ আমার কাছে কোনো ফটো নেই। সত্যি বলছি, তবে কুখ্যাত গুপ্তচর সেলমা গেতজ যে গতবছর নভেম্বরে জেনোয়ার বন্দী শালায় মারা গেছে, এ তথ্য নির্ভুল। সত্যি বলেই জানবেন। আর

বাদবাকি যা বলেছি, অর্থাৎ আমার ওই ফটোগ্রাফার বন্ধু আর তার ফটো–এসব সবই আমার মনগড়া গল্প ছিল।

তার মানে আমার পেটের কথা বের করার এটা আপনার একটা মতলব, তাই না?

–হ্যাঁ, পোয়ারো সামান্য হাসলেন, মাফ করবেন, এই টোপ না ফেললে আপনার আসল পরিচয় জানতে পারতাম না।

কিন্তু এসবের সঙ্গে স্যার ক্লড অ্যামরির হত্যার কী সম্পর্ক, বলতে পারেন? লুসিয়া চাপা গলায় জানতে চাইল।

শুনেছি, পোয়ারোর কণ্ঠস্বর গম্ভীর, কিছুদিন আগে আপনার একটা দামী হীরের নেকলেস হারিয়ে গিয়েছিল, খবরটা কি ঠিক?

লুসিয়া পোয়ারোর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল–আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দেননি। বলুন মঁসিয়ে পোয়ারো, স্যার ক্লডের মৃত্যুর সাথে এর কী সম্পর্ক?

সম্পর্ক তো আছেই, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, পোয়ারো শান্ত কণ্ঠে বললেন, আপনার দামী হীরের নেকলেস, কদিন বাদে স্যার ক্লডের মূল্যবান ফর্মুলা উধাও দুটোর কোনোটাই অদামী নয়, আপনি অস্বীকার করতে পারেন?

-আপনি কী বলতে চাইছেন, মঁসিয়ে? লুসিয়ার মুখ ফ্যাকাশে। বুকে ঢিবঢিবানি শুরু হয়ে গেছে।

–না বোঝার মতো তো কিছু নেই, মাদাম। জলের মতো সোজা ব্যাপার। পোয়ারো গম্ভীর হলেন। বলুন, ডঃ কারোলি আপনার কাছে এবার কত টাকা দাবি করেছিলেন?

টাকা–কেন? কেন? লুসিয়া ছিটকে সরে যেতে যেতে কোনো রকমে বলল।

-বুঝতে পারছি, আপনি ভীষণ ঘাবড়ে গেছেন।

-কখখনো নয়। সেই থেকে আপনি আবোল-তাবোল বলে চলেছেন। বুঝতে পারছি না, ডঃ কারোলিকে টাকা দেওয়ার প্রশ্নটা আসছে কোত্থেকে?

–আপনাদের দুজনের মঙ্গলের জন্য। সর্বোপরি ডঃ কারোলিও যাতে মুখ না খোলেন, তার ব্যবস্থা হিসাবে। কুখ্যাত নারী গুপ্তচর বাহিনীর সেলমা গেতজ-এর সুন্দরী কন্যা আভিজাত অ্যামরি পরিবারের ঘরণী হয়েছে, এই ঘৃণিত খবরটা পাঁচ কান হয়ে গেলে সর্বনাশ। আপনারা দুজনেই জানেন বাড়ির কেউ ব্যাপারটা মেনে নেবেন না। তাই আপনারা একটা রফা করলেন। ডঃ কারোলি টাকার বিনিময়ে আপনাকে সুখ দিলেন। আপনি হলেন ওঁর ব্লাকমেলের শিকার। ব্যস, এই পর্যন্ত।

লুসিয়া বড় বড় চোখে পোয়ারোর দিকে তাকাল, যেন আগুন ঝরে পড়ছে। পরক্ষণে চোখ নামিয়ে নিল। দু-হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরল। মিনমিনিয়ে বলল–রিচার্ডকে এসব জানিয়েছেন নাকি?

-না, এখনও ওনাকে কিছু জানানো হয়নি।

-দোহাই আপনার, ওকে কিছু বলবেন না। লুসিয়া তখন অসহায় হয়ে পড়েছে। হাত জোড় করে আকুতি জানান, মঁসিয়ে পোয়ারো, রিচার্ডকে কিছু বলবেন না। আমার অতীত ওদের বংশগরিমাকে কালিমালিপ্ত করবে। ও আমার আসল পরিচয় জানে না। ইচ্ছে করেই বলিনি। কী করব বলুন। এছাড়া ভালো মতো বেঁচে থাকার উপায় আমার জানা ছিল না। তখন আমি আমার নিদারুণ দুর্ভাগ্যকে বহন করে চলেছি। সহায়-সম্বলহীন এক মেয়ে। মায়ের ঘৃণিত জীবন আমাকে সর্বদা কুরে কুরে খেত। বিশ্বাস করুন, সর্বদা ভাবতাম, কীভাবে এই অন্ধকার গহ্বর থেকে বেরোনো যায়। কিন্তু হায়, কোনো উপায় ছিল না। অবশেষে ঈশ্বর বুঝি সদয় হলেন। দুরারোগ্য ক্যানসারে মায়ের মৃত্যু হল। শোক হলনা, বরং হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। অন্তরাত্মা উল্লসিত হল। এই ঘটনার কিছুদিন পর রিচার্ডের সাথে আমার দেখা হল। তারপর পরিচয়, প্রেম এবং অবশেষে বিয়ে। কিন্তু আমার ঘৃণিত অতীত কাহিনী সাহস করে ওকে বলতে পারলাম না। অথচ মনের মধ্যে চলছে দোলাচল। এক গুপ্তচর নারীর রক্ত আমার ধমনীতে, একথা বলে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারতে পারলাম না। অতএব.....।

বুঝলাম, পোয়ারো গম্ভীর গলায় বললেন, আপনাকে বধুবেশে রিচার্ড নিয়ে এলেন এই বাড়িতে। দাম্পত্য জীবন বেশ সুখেই কাটছিল। হঠাৎ একদিন ধুমকেতুর মতো আবির্ভূত হলেন ডঃ কারোলি। তিনি আপনাকে চিনতে ভুল করেননি। গুপ্তচর সেলমা গেতজের সুন্দরী কন্যা স্যার ক্লড অ্যামরি পরিবারের বউ–উনি তখন আপনাকে ভয় দেখাতে শুরু করেন। টাকার দাবি করেন। আপনি যদি ওঁর দাবি না মেনে নেন, তাহলে সবকথা ফাঁস করে দেবেন। সর্বক্ষণ এই কথা বলে আপনাকে উত্যক্ত করে তুলত, তাই না?

-আপনার অনুমানই ঠিকই, কিন্তু অত টাকা আমি কোথায় পাব লুসিয়া গড়গড় করে বলে চলল, কোনো উপায় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত দামী হীরের নেকলেসটাই বিক্রি করতে হল, ওটা রিচার্ড আমায় উপহার দিয়েছিল বুঝলেন। ডঃ কারোলিকে শান্ত করলাম, কিন্তু ডঃ কারোলির ওই টাকাতে পেট ভরে নি, তার আরও চাই। গত সন্ধ্যায় উনি এ ঘরে এসে হাজির হলেন, সকলের সামনে এমন ভান করলেন, যেন উনি আমার পরিবারের বন্ধু ও শুভাকাঙ্খী। রিচার্ডের বাবা আর পিসিমা ওর মন গলানো কথাবার্তায় ভিজে গেলেন। তারা তাঁকে এই পরিবারে কদিন থেকে যাওয়ার অনুরোধ করলেন। ডঃ কারোলির তখন পোয়া বারো। তিনি তখন বড় দাও মারার জন্য ঠুকঠুক করছেন। স্যার ক্লড যে মারাত্মক শক্তিশালী পরমাণু বোমার ফর্মুলা আবিষ্কার করেছেন, এখবরটা ওঁর কানে পৌঁছে গিয়েছিল, জানি না, কে বলেছিল। উনি আমাকে সেই ফর্মুলা চুরি করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকলেন।

লুসিয়া এবার থামল। একটানা কথাগুলো বলে সে তখন হাঁফাচ্ছে।

-তারপর? তারপর কী হল? পোয়ারো লুসিয়ার কাছাকাছি বসলেন-শেষ পর্যন্ত ফর্মুলাটা ওঁর হাতে তুলে দিলেন, তাই তো?

জানি, হাজার সত্যি বললেও আপনি বিশ্বাস করবেন না। লুসিয়ার মুখ শুকনো, তবুও যা করিনি, তা মানব কেন? ফর্মুলা আমি হাতাই নি, এক বিন্দুও মিথ্যে বলছি না।

পোয়ারো সরাসরি তাকালেন লুসিয়ার দিকে, দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে সহানুভূতি। নরম লুসিয়াকে আশ্বাসবাণী শোনালেন। নরম কণ্ঠস্বরে বললেন-আবার বলছি মাদাম, হতে

পারি আমি কাঠখোট্টা এক গোয়েন্দা, কিন্তু মন বলে কিছু আমারও আছে। আমি আপনার বাবার বয়সী। আপনার মনে যথেষ্ট সাহস আছে, এত সহজে ভেঙে পড়লে চলবে, মন শক্ত করুন। আপনার প্রতিটি কথা বিশ্বাসযোগ্য। তবু আবার জানতে চাইছি, সত্যিই কি আপনি ফর্মুলা চুরি করেন নি?

-না। লুসিয়া এবার কেঁদে ফেলল, আপনাকে কী করে যে বোঝাই, ডঃ কারোলি ফর্মুলা চুরি করার কথা বলেছিলেন ঠিকই, আমিও সেটা হাতাবার জন্য তোড়জোড় করছিলাম, করা হয়ে ওঠেনি।

-তোড়জোড় করছিলেন? কীভাবে?

–ডঃ কারোলি একটা চাবি তৈরি করেছিলেন, ওটা আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, স্টাডিতে ঢুকে সিন্দুক থেকে ওটা নিয়ে আসতে।

আচ্ছা, হ্যাঁ, পোয়ারো পকেটে হাত ঢোকালেন, একটা চাবি বের করলেন, এই চাবিই তিনি এডওয়ার্ড রেনরকেও দেখিয়েছিলেন, বললেন, দেখুন, চিনতে পারেন কিনা। ভালো করে খুঁটিয়ে দেখুন।

লুসিয়া চাবিটা হাতে নিয়ে উলটে পালটে দেখল–খুব সম্ভবত। তারপর কী হল, বলি। চাবি হাতে নিয়ে ঢুকলাম গিয়ে স্টাডিতে, সিন্দুকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি কী দাঁড়াইনি, ঠিক এই সময় মূর্তিমান বিভীষিকার মতো স্যার ক্লড এসে ঢুকলেন। ওইভাবে সিন্দুকের পাশে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার মুখে ক্রুর হাসি ফুটে উঠল। ভাবতে পারবেন

না, তখন ওঁর মুখের চেহারা কী কদর্য হয়ে উঠেছিল। বিফল হয়ে ফিরে এলাম। তারপর কে কী ভাবে ওটা হাত সাফাই করল, বিশ্বাস করুন, আমার জানা নেই।

–মানছি আপনার প্রতিটি কথা সত্যি, চাবিটা স্বস্থানে রাখতে রাখতে পোয়ারো বললেন, তার মানে আপনার শ্বশুর আপনাকেও সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন। তাই স্যার ক্লড অন্ধকার ঘরে আসল চোরকে ফর্মুলা ফিরিয়ে দেবার সুযোগ দিলেন, তখন আপনি আপত্তি করলেন না, তাইতো?

এছাড়া আমি আর কী বা করতে পারতাম, বলুন। ওঁর প্রস্তাবে সায় না দিলে শুরু হত খানাতল্লাসী, আমার কাছে তখন রয়েছে ডঃ কারোলির দেওয়া চাবি আর একটা ছোট্ট কাগজের টুকরো। ওগুলোর কথা ওরা জেনে ফেলত।

–ওই কাগজের টুকরোতে কী লেখা ছিল?

–ডঃ কারোলির নিজের হাতে লেখা কয়েকটি শব্দ–যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছি, সেটা তুমি করেছ?

-থামবেন না, এগিয়ে যান।

–দুম করে ঘরের আলোগুলো নিভে গেল। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে গুপ্ত জায়গা থেকে চাবিটা ছুঁড়ে দিলাম, গিয়ে পড়ল ওইখানে। লুসিয়া আঙুল তুলে দেখাল, অর্থাৎ গত সন্ধ্যায় এডওয়ার্ড রেনর সে চেয়ারে বসেছিল, তার তলাটা।

–আর কারোলির লেখা কাগজের টুকরোটা? ওটা কী করলেন?

-ওটা আমার কাছেই ছিল, আমার জামার পকেটে লুকিয়েছিলাম। আজ সকালে পকেট থেকে বের করে এই বইটার ভেতর রেখে দিয়েছি।

টেবিলের ওপর থেকে নির্দিষ্ট বইটির পাতা উলটে কাগজটা বের করে লুসিয়া এগিয়ে দিল পোয়ারোর দিকে।

-না না, ওটা আমার লাগবে না। আপনার কাছেই থাক।

লুসিয়া কাগজের টুকরোটাকে কুচিয়ে হাতব্যাগে রেখে দিল।

–আর একটা প্রশ্ন আছে। পোয়ারো জানতে চাইলেন, আপনি কি কাল সন্ধ্যায় অন্ধকারের মধ্যে আপনার জামা ছিঁড়ছিলেন?

–জামা! আমি! না না, ওসব করার দরকার পড়েনি। লুসিয়া অবাক হল।

–ও, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই পোশাক ছেঁড়ার আওয়াজ শুনেছিলেন?

-হ্যাঁ, শুনেছিলাম। লুসিয়া একটু ভেবে জবাব দিল, আমিও অন্ধকারের মধ্যে পোশাক ছেঁড়ার আওয়াজ শুনেছিলাম। হবে হয়তো পিসিমা বা বারবারার কাজ, তবে আমি নই।

হুঁ, স্যার ক্লডের কাপে গত সন্ধ্যায় কে কফি ঢেলে দিয়েছিল, বলতে পারেন, মাদাম?

-কেন বলতে পারব না? আমি নিজেই তো ঢেলেছিলাম। লুসিয়ার সোজা জবাব।

–নিজের কাপের পাশে টেবিলে ওটা রেখেছিলেন তো?

–হ্যাঁ।

ব্ল্যাক কফি পোয়ারো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর কী করলেন? হিসকোসিন বিষটা কোন কাপে মিশিয়ে ছিলেন, মাদাম?

তীর খাওয়া পাখির মতো লুসিয়া আঁতকে উঠল, উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে তার শরীর–একথা কে বলল...

মাদাম, পোয়ারো মোলায়েম সুরে বললেন, ভুলে যাবেন না, আমি একজন। গোয়েন্দা, সব কিছু জানাই আমার কাজ। এমনকি লোকে যা দেখতে পাচ্ছে না, আমার কঠিণ দৃষ্টিতে তার ধরা পড়ে। বাদ দিন, দেরি না করে আমার প্রশ্নের জবাব দিন, কোন কাপে মিশিয়ে ছিলেন?

–আমার কাপটাতে.....লুসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

–আমার কাপে। কথাটা বুঝি পোয়ারোর বিশ্বাস হল না। জানতে চাইলেন, কিন্তু কেন, মাদাম?

আমি নিজেকে আর বাঁচিয়ে রাখতে চাইছিলাম না, তাই। ডঃ কারোলির আসল উদ্দেশ্য রিচার্ডের কাছে ছিল অজানা। ওর ধারণা, আমার সাথে ডঃ কারোলির অবৈধ প্রণয়

আছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, মঁসিয়ে পোয়ারো, ওই লোকটা আমার চক্ষুশূল, একদণ্ড ওঁকে সহ্য করতে পারতাম না। অবশেষে যখন ওঁর কথামতো ফর্মুলা চুরি করতে অসফল হলাম, তখন অসহায় বোধ করলাম। একটা ভয় আমার আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরল নিশ্চয়ই ডঃ কারোলি রিচার্ডকে সব বলে দেবে। তখন রিচার্ডের সামনে কোন মুখে দাঁড়াব। তাছাড়া ওর বাড়ির লোকেরা? ছেড়ে কথা বলবে না। তাড়িয়ে ছাড়বে।

টেবিলের ওপর তখনও গত রাতের একটা কফির কাপ পড়েছিল। খালি নয়। সেদিকে আঙুল তুলে পোয়ারো জানতে চাইলেন–এটাই আপনার কাপ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু কাপে ঠোঁট ঠেকানো হয়নি বুঝতে পারছি, কিন্তু মাদাম, নিজেকে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দেবেন বলে যে বিষ মেশালেন, সেই কফি শেষ পর্যন্ত ছুঁয়েও দেখলেন না, কেন?

সে অবসর পেলাম কোথায়? রিচার্ড এসে পাশে দাঁড়াল, লুসিয়া বলল, ও ফিসফিসিয়ে সবার অলক্ষে বলল, আমায় নিয়ে ও এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথায় চলে যাবে। এজন্য টাকার ও জোগাড় করবে। তখন মনে বাঁচার তাগিদ অনুভব করলাম, ঠিক করলাম, জীবনকে আর একটা সুযোগ দেওয়া যাক। তাই বিষ মেশানো কফি যেমন কি তেমনই পড়ে রইল।

আমার এই কথাগুলো মন দিয়ে শুনুন, আপনাকে জানিয়ে রাখি, স্যার ক্লডের মৃতদেহের পাশে যে কফির কাপটা পড়েছিল, আজ সকালে ডঃ গ্রাহাম এসে ওটা পরীক্ষার জন্য নিয়ে গেছেন।

-তাই বুঝি? লুসিয়া হকচকিয়ে গেল।

-তবে ওরা যতই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করুক না কেন, বিষের ছিটেফোঁটাও পাবে না, পাবে কেবল কফির তলানিটুকু, এ আমি হলফ করে বলতে পারি। পোয়ারো কথা আর বাড়ালেন না।

–ঠিকই ধরেছেন, লুসিয়া আনমনে জবাব দিল।

–আচ্ছা মাদাম, পোয়ারো আবার বলতে শুরু করলেন, ওরা গতকাল রাতেই কাপটা নিয়ে যেত, তাহলে কী হত? এ প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে। উত্তরটাও আমার জানা। কথা শেষ করে পোয়ারো পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন দরজার দিকে, যেখানে চারা গাছ সমেত টবটা রাখা আছে। নিঃশব্দে টবের আলগা মাটি সরিয়ে ফেললেন, বের করলেন একটা কাপ। কাপটা আঙুলের মাথায় আঁকশির মতো ঝুলিয়ে নাচাতে নাচাতে বললেন–এমনও হতে পারত, ডঃ গ্রাহাম এই কাপটা নিয়ে গেলেন, তাহলে? তাহলে কী হত, মাদাম?

–সব তথ্যই দেখছি আপনার হাতে চলে এসেছে।

লুসিয়া নিজেকে আর সংযত রাখতে পারল না, দু-হাতে মুখ ঢাকল, বোঝা গেল লজ্জাজনিত অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে তার দু-চোখ থেকে।

পোয়ারো পায়ে পায়ে আবার চলে এলেন লুসিয়ার কাছাকাছি আগেই বলেছি, ডঃ গ্রাহাম সকালে যে কফির কাপটা নিয়ে গেছেন, তা থেকে ওরা কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না। কিন্তু এই কাপটা আপনাকে জানিয়ে রাখি, এর তলানির কিছুটা আমি আগেই সরিয়ে রেখেছিলাম, যার মধ্যে পাওয়া গেছে মারাত্মক হিসকোসিন বিষ, এটাই স্যার ক্লডের কফির কাপ, যা খেয়ে ওনার মৃত্যু হয়েছে।

লুসিয়া একথা শুনে ভয়ে শিউরে উঠল–আপনি ধরে ফেলেছেন আমার কারসাজি? হা, হা, আমিই আমার শ্বশুরের মৃত্যুর জন্য দায়ী। আমিই তাকে হত্যা করেছি, হিসকোসিন বিষ আমিই কফিতে মিশিয়ে দিয়েছিলাম।

উন্মাদের মতো লুসিয়া ছুটে এল টেবিলের ওপর, সেখানে তখনও কফি ভরতি কাপটা পড়েছিল। সে সেটা তুলে নিতে নিতে বলল–এটার মধ্যে কোনো বিষ নেই। কথা শেষ করেই কফিতে চুমুক দিতে উদ্যত হল, কিন্তু তার সে প্রয়াস ব্যর্থ হল।

পোয়ারো এক লাফে এগিয়ে এসে ছোঁ মেরে তুলে নিলেন সেই কফি ভরতি কাপ। টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলেন।

কী হল মঁসিয়ে পোয়ারো, ওটা কেড়ে নিলেন কেন? লুসিয়ার চোখ আবার জলে ভরে উঠল।

-আমি নিশ্চিত, ওই কফি নির্ভেজাল নয়, বিষ আছে। পোয়ারো তাকালেন লুসিয়ার দিকে, স্নেহার্দ্র কণ্ঠে জানতে চাইলেন এই সুন্দর পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে কেন চিরদিনের জন্য চলে যেতে চাইছেন, অসময়ে?

-হা অদৃষ্ট! লুসিয়া কুশনে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

–আপনি আমায় এপর্যন্ত যা বললেন, সব বিশ্বাস করছি, তবে এখনও একটা প্রশ্নের উত্তর জানা হয়নি, পোয়ারো আন্তরিকতার সুরে বললেন, আমি জানি, আপনি নিজের

কফিতে হিসকোসিন মিশিয়ে ছিলেন। অন্য আর একটি কফির কাপেও ওই একই বিষ মেশানো হয়েছিল। এই কাজ কে করেছে, আপনি জানেন কি?

-মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি কেন আমাকে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন? কাঁদো কাঁদো গলায় লুসিয়া জানতে চাইল, অন্য কেউ নয়। আমি ওটাতেও হিসকোসিন মিশিয়ে ছিলাম। আমিই অপরাধী।

বুঝতে পারছি, আপনি একজনকে বাঁচাতে চাইছেন, কিন্তু কে সে? তার নাম কী?

এমন সময় দরজায় টোকার শব্দ।

–ওরা এসে গেছে, মানে পুলিশ। স্বাভাবিক কণ্ঠে পোয়ারো বললেন, আর কিছু জানার নেই আমার। যাওয়ার আগে একটা কথা জেনে যান, আপনাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার।

-কিন্তু আমিই তো স্যার ক্লডের খুনি, লুসিয়ার কণ্ঠস্বর কাঁপছে, তাহলে কেন আমাকে........

-আবারও বলছি, আপনাদের মানে আপনি এবং আপনার স্বামী রিচার্ডকেও রক্ষা করব, এ আমার অঙ্গীকার।

লুসিয়া অবাক হল, কোনো কথা বলল না, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চোখে কেবল তাকিয়ে রইল সামনের বেঁটে খাটো চেহারার গোয়েন্দা ভদ্রলোকের দিকে।

এইসময় দরজাটা খুলে গেল। মুখ বাড়াল বাটলার ট্রেডওয়েল। জানাল, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর জ্যাপ এসেছেন, মঁসিয়ে পোয়ারো।

.

১২.

ইতিমধ্যে খোলা ফ্রেঞ্চ উইন্ডো গলিয়ে ক্যাপ্টেন হেস্টিংস বসার ঘরে এসে প্রবেশ করেছেন।

জ্যাপের সঙ্গে এক ছোকরা কনস্টেবল, নাম জনসন। মাঝবয়সী জ্যাপের হাতুড়ি পেটা চেহারা।

তিনি জনসনকে উদ্দেশ্য করে বললেন–জনি, এনাকে তুমি চেনো। খ্যাতনামা গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারো। উনি বেলজিয়ান পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ছিলেন, সেই সময় থেকেই ওনার সঙ্গে আমার ভাব জমে উঠেছে। দুজনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রহস্যানুসন্ধানে মেতে উঠেছি। অপরাধীকেও ধরেছি একসঙ্গে। ও, সেসব দিনের কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। সেই যে, অ্যাবারক্রম্বি' জালিয়াতি কেসটা, বলুন না মঁসিয়ে পোয়ারো, আরে যে লোকটাকে আমরা দুজনে মিলে ব্রসলেসে ধরলাম, মনে পড়ছে না? তারপর ব্যারণ অ্যালটারা? কী দুর্ধর্ষ লোক! ইউরোপের প্রায় সব দেশের পুলিশ ওর পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ ধরতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত অ্যালট ওয়ার্ডে লোকটাকে পেলাম, আমরা দুজনে মিলে ওকে ধরে ফেললাম, নিশ্চয়ই মনে পড়ছে আপনার! তারপরে বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে, আপনি চাকরি থেকে অবসর নিলেন।

লন্ডনেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু হল। ফলে দেখা সাক্ষাত প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। আপনি তো এখানে এসেই স্টাইলস-এর সেই অদ্ভুত রহস্যের কিনারা করেছিলেন, তাই না? আপনার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল প্রায় দু-বছর আগে। এক ইটালিয়ান ভদ্রলোককে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রহস্যের জট ছাড়া আপনি-আমি একসঙ্গে কাজ করেছিলাম, তাইতো মঁসিয়ে পোয়ারো? তারপর আজ, এখানে। আপনাকে দেখে, বিশেষ করে আপনার সাথে কাজ করছি ভেবে মনটা ভারি খুশি-খুশি লাগছে।

ইন্সপেক্টর জ্যাপ এবার কাজের কথায় এলেন–আমি এসে শুনলাম, আপনি এক সুন্দরীর সাথে কথা বলছেন, পরে দেখলাম, সম্ভবত রিচার্ড অ্যামরির স্ত্রী ঠিক বলেছি? আসলে কি জানেন, ওইসব বিষ-টিষ খাইয়ে হত্যা করার ব্যাপারগুলো, আমার মোটেও পছন্দ হয় না। এই ধরনের মামলায়, তদন্তের কী আছে বলুন? কেবল ওই ঘোড়-বড়ি-খাড়া। কেবল মৃত ব্যক্তি কী খেয়ে ছিল, কী পান করেছিল, এসব তাকে কে দিয়েছিল, এসব মামুলি তথ্য ছাড়া উর্বর মস্তিষ্ক খাটানোর কী আছে? ডঃ গ্রাহাম জানিয়েছেন, কফিতে বিষ মেশানো হয়েছিল, যা সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট। করোনারের রিপোর্টের সঙ্গে যদি তার বক্তব্য মিলে যায়, তাহলে স্বীকার করছি, এতথ্য নির্ভরযোগ্য। কিন্তু এর বাইরেও বহু কাজ আছে।

কথা বলতে বলতে জ্যাপের সন্ধানী চোখ দুটো ঘরময় বাঁইবাঁই করে ঘুরছিল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন–এ ঘরে যা দেখার দেখে নিয়েছি। এবার জিজ্ঞাসাবাদের পালা প্রথমে রিচার্ড অ্যামরি, তারপরে ডঃ কারোলিকে ঝামা ঘষতে হবে। ওই ব্যাটা কারোলিকেই আমার কালপ্রিট মনে হচ্ছে, অবশ্য তথ্য প্রমাণাদি বিচারের পর। একটা কথা সবসময় মনে রাখতেই হবে, খোলা মন ও খোলা চোখ দিয়ে সব কিছু বিচার করব।

জ্যাপ বাইরে খাবার জন্য পা বাড়ালেন। কী খেয়ালে পেছন ফিরে পোয়ারোকে লক্ষ্য করে বললেন–কী, আপনি যাবেন না?

নিশ্চয়ই, পোয়ারো সহজ কণ্ঠে বললেন, আমি তো সর্বদা আপনাদের সাথেই আছি।

–আর ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, ইশারায় তাকে দেখিয়ে বললেন–উনি কি খাবেন না?

–জ্যাপ, ওকে ছেড়ে দাও। পোয়ারো চট করে জবাব দিলেন।–ও বেচারার বোধহয় এখানে থাকতেই ভালো লাগছে।

-হ্যাঁ, পোয়ারো ঠিকই বলেছেন, বন্ধুর মনোভাব আঁচ করতে পেরে হেস্টিংস বললেন–এখানে থাকাই আমার পক্ষে মঙ্গল।

জ্যাপ, কনস্টেবল জনসন আর পোয়ারো বসার ঘর থেকে বেরিয়ে ওপরে যাওয়ার সিঁড়ি ধরলেন।

অন্যদিকে ঠিক একই সময়ে ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে ভেতরে এল বারবারা। গোলাপি রঙের ব্লাউজ আর হাল্কা রংয়ের স্ল্যাকস তার পরণে।

-আঃ, বড়জোড় বাঁচালেন, বারবারা সরাসরি তাকাল ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর দিকে শেষ পর্যন্ত পুলিশ ঢুকল এ বাড়িতে, কী বলেন।

বারবারা ধপ করে বসে পড়ল একধারে।

-হ্যাঁ, মাদাম। হেস্টিংস জবাব দিলেন, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে তদন্তের কারণে ইন্সপেক্টর জ্যাপকে পাঠানো হয়েছে। পোয়ারোর সঙ্গে ওনার বহুদিনের পরিচয়, ওঁরা একসঙ্গে বহু রহস্যের কিনারা করেছেন। দুজনেই এখন ওপরে গেলেন, রিচার্ডকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে।

-বলুনতো, ওঁরা কি আমার সঙ্গেও কথা বলতে চাইবেন?

-খুব সম্ভব নয়। হেস্টিংস তাকে আশ্বস্ত করলেন, বললেন, আর যদি বা করে, তাতে আপনার ঘাবড়ানোর কী আছে?

-না না, ওসব নিয়ে আমার কোনো ভয়-ডর নেই। বারবারা সহজ ভঙ্গিতে বলল, আসলে কী জানেন, এক্ষেত্রে বুদ্ধিই হল আসল। তলিয়ে দেখতে হবে, এর মধ্যে আবেগের মিশেল আছে কিনা। আচ্ছা, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, আপনি কি আবেগের ধার-ধারেন না? ইচ্ছে করে না আবেগে মনকে ভাসিয়ে দিতে?

-মানে, হেস্টিংস ঢোক গিললেন, হ্যাঁ, করে বৈকি। আবেগ তলিয়ে দেখতে আমিও ভালোবাসি।

–আপনাকে মাঝে মধ্যে বুঝে উঠি না, কেমন জটিল প্রকৃতির লোক বলে মনে হয়। হঠাৎ গলার স্বর চড়িয়ে সে জানতে চাইল আগে আপনি কোথায় থাকতেন, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস?

দক্ষিণ আমেরিকায়। বলতে পারেন জীবনের তিন ভাগ সেখানেই কেটে গেছে। আমার। হেস্টিংস-এর ঠোঁটে হাসির আভাস।

–জানতাম, আপনি এই জবাবই দেবেন। দক্ষিণ আমেরিকা! কী দারুণ জায়গা, না? যেদিকে চোখ যায়, কেবল সবুজে ঢাকা মাঠ, মাঝে মধ্যে বনাঞ্চল, কখনো চোখে পড়ে উঠতি বয়সের কাউবয়দের, ঘোড়ায় চেপে চলেছে, হাতে দড়ির ল্যাসো, এ প্রান্ত ও প্রান্ত ছুটে বেড়াচ্ছে, চোখে পড়ে নদী, তার ওপর সেতু, তৈরি হয়েছে ছোট গোছের রেলপথ। কয়লার ইঞ্জিন রেললাইন ধরে ঝিকঝিক কণ্ঠে সামনে এগিয়ে চলেছে। মান্ধাতা আমলের রেল গাড়ি। তাই তো বলি, আপনাকে কেন মাঝ মাঝে সেকেলে মনে হয়। এখন বুঝতে পারছি। তবে সেকেলে হলেও আপনি যে রুচিশীল ব্যক্তি, তা স্বীকার করতেই হবে।

তার মানে? ঠিক বোধগম্য হলনা। হেস্টিংস নরম গলায় বললেন।

-বুঝতে পারলেন না, তাই না? বারবারার ঠোঁটে হাসির ঝিলিক। তার মানে আপনার আচার ব্যবহার। আপনি যেমন যেকোনো পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন, আবার প্রয়োজনে মিথ্যে কথা বলা, এই সব আর কী!

–কেন, ভদ্রতা, নম্রতা, দুঃখ, ভালোবাসা, এসব আবেগ কি আপনার মধ্যে নেই।

হেস্টিংস-এর কথাগুলি এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিল বারবারা আমার কথা ছাড়ুন, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস। এই বাড়ির লোকগুলোকে তলিয়ে দেখুন। দু-দিনও হয়নি, একটা জলজ্যান্ত লোক মারা গেল, অথচ ছিটেফোঁটা দুঃখ আছে মনে!

-কী বলছেন, মাদাম। হেস্টিংস অবাক হলেন, দুঃখ পায়নি বলছেন?

-হা আমার পোড়াকপাল, বারবারা কপাল ঠুকতে এগিয়ে এল। কফি টেবিলের ধারে একটা চেয়ারে বসল–ওই মানুষটা, মানে আমার জ্যেঠুর কথা বলছি, সারা জীবন টাকা রোজগারের পেছনে কাটিয়ে দিয়েছেন, ভুরি ভুরি টাকা জমিয়েছেন। কিন্তু হাত খুলে যে খরচ করবেন, সে মন কোথায়? হাড়কিপটে, বুঝলেন কেবল নিজের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে ছিল টনটনে জ্ঞান। যথেষ্ট বয়স হয়েছিল, অথচ লজ্জা শরমের বালাই ছিল না। জ্যেঠুর এইসব বদগুণের জন্য এই বাড়ির লোকদের কতবার সম্মান হানি হয়েছে, কী বলব।

বারবারার কথাশুনে ক্যাপ্টেন হেস্টিংস চমকে উঠলেন। তার বিস্ময়ের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেল। একফাঁকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল দুটি অস্ফুট শব্দ–কী বলছেন?

বারবারা হাত ইশারায় বাধা দিয়ে বলল–থামুন তো। সত্যি যা, তাই বলছি। অত ঢাক গুরগুর কীসের? আমি স্পষ্ট কথা বলতেই ভালোবাসি। জ্যেঠুর স্বভাব চরিত্রের বদগুণ না বলে, আমি যদি কালো পোশাক পরে শোক পালন করতাম, তাহলে আপনার নিশ্চয়ই পছন্দ হত, তাই না? ন্যাকা গলায় বলতাম–আহা-হা, আমার জেঠুর মতো ভালো মানুষ পৃথিবীতে খুব বেশি দেখা যায় না। আমাদের সবার প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন করেছেন।

-সত্যি, আপনার এসব কথা শুনে যে কেউ অবাক হবে।

-তাই বুঝি, কিন্তু আমার তো লজ্জা-সঙ্কোচ হচ্ছে না। আসলে কী জানেন ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, আমি মেয়েটাই এরকম, বারবারা বেশ ফলাও করে বলতে লাগল–সারাজীবন

নিজের কাজ গোছাবার জন্য গাদা গাদা মিথ্যে বলব, আর এক-আধবার লোকদেখানো ভালোমানুষ সাজব,–এমনটাই ছিলেন আমার জ্যেঠু। মোদ্দাকথা, ওনার দুর্ব্যবহারই ওনাকে সকলের কাছে অপছন্দের করে তুলেছিল। তাই ওনার মৃত্যু, কারো মনে শোক-তাপ সৃষ্টি করতে পারেনি। লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন, এই পরিবারের সকলের ভাবখানা এমন–যাক, আপোদ বিদেয় হয়েছে গোছের। ক্যারোলিন পিসির কথাই ধরুন না। আহা বেচারী। জ্যেঠি মারা যেতে পিসিমা এসে জ্যেঠুর সংসারের হাল ধরলেন বটে, কিন্তু শান্তিতে ছিলেন কি? পিসিমা পর্যন্ত তার ভাইকে পছন্দ করতেন না, জ্যেঠুর জন্য তার মনে জমে আছে একরাশ বিতৃষ্ণা। সব কিছু মুখ বুজে তবুও তাকে সহ্য করতে হয়েছে, কারণ অন্য কোনো আশ্রয় তার নেই।

বারবারা থামল, দম নিল, কী যেন চিন্তা করল। তারপর আবার বলতে শুরু করল আমার এক-একবার কী মনে হয় জানেন তো, পিসিমাই তার ভাইকে খুন করেছেন। গতকাল সন্ধ্যায় জ্যেঠুর হার্ট অ্যাটাকের যে ব্যাপারটা ঘটল, এখনও ভাবতে অবাক লাগে, বিশ্বাসই হয় না হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। পিসিমার ওপর দিনের পর দিন ক্লুড জ্যেঠু মানসিক অত্যাচার চালিয়ে গেছেন। পিসিমা একবারও এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াননি, নিজেকে সামলে রেখেছেন, আর মনের ভেতর তৈরি হয়েছে আক্রোশের পাহাড়। হয়তো আমাদের অগোচরে কোনো একদিন ভাই-বোনের মধ্যে এমন কিছু ঘটে গেছে, যা পিসিমার সহ্যের ঠাই ভেঙে দিয়েছে। জমে থাকা আক্রোশের চাপে পড়েই পিসিমা হয়তো তার ভাইকে বারবারা তার কথা শেষ করল না।

–আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, হলেও হতে পারে। ক্যাপ্টেন হেস্টিংস চাপা গলায় বললেন।

-তারপরে ওই ফর্মুলা চুরির ব্যাপারটাও ভেবে দেখুন। সকলের সন্দেহের আঙুল ওই ইটালিয়ান ডাক্তারের ওপর। কিন্তু আমার তাত মনে হয় না। ট্রেডওয়েলকেই আমি সন্দেহ করি।

–ট্রেডওয়েল, মানে আপনাদের বাটলারের কথা বলছেন! ক্যাপ্টেন হেস্টিংস বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন–ট্রেডওয়েলকেই আপনার সন্দেহ হয় কেন? বাড়িতে তো আপনাদের কাজের লোকের অভাব নেই, তারা কি ভালো মানুষ?

হা, ট্রেডওয়েলকেই জ্যেঠুর খুনী বলে মনে হয় আমার, কারণ সে জ্যেঠুর স্টাডির পাশে পাশেই আসেনি, তাই।

–তাহলে কেন আপনার মনে এই ধারণা হল?

ক্যাপ্টেন হেস্টিংস হালকা সুরে জানতে চাইলেন।

–জানেন ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, আমাদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অনেক মিল আছে। আপনার মতোই গোঁড়া আর সেকেলে। নিরীহ গোবেচারা গোছের লোকেরা হয় সবচেয়ে বেশি শয়তান, অথচ মুখে ভালো মানুষের মুখোশ আঁটা। অনেক গোয়েন্দা এসব ব্যাপারকে আমল দেন না। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সকলের চোখে ট্রেডওয়েল এক শান্ত ভদ্র, নিরীহ, নিরাপরাধ লোক।

–কিন্তু সেভাবে ভেবে দেখলে শুধু ট্রেডওয়েল কেন, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না, আপনার নামটাও সন্দেহভাজনদের তালিকায় থাকা উচিত বলে মনে করি। নিরীহ আর নির্দোষ যুবতীর মুখোস এঁটে বেমালুম সহজভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

-তাই বুঝি, বারবারা সামান্য হাসল, মনের ভেতর কোনো গলদ না রেখে পেট ঝেড়ে সব বলে দিলাম কিনা–সত্যি আজব এক লোক বটে আপনি!

–আজব হলাম কী ভাবে?

ক্যাপ্টেন হেস্টিংস নিজের চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন।

–হ্যাঁ, জবাব দেব, কিন্তু তার আগে, বারবারাও তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। খোলা জানলার দিকে চোখ বেঁকিয়ে বলল, উত্তর পেতে চান, তাহলে বাইরে চলুন। বদ্ধ ঘরের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসছে। আসুন, বাগানের খোলা হাওয়াতে বসে গল্প করি।

বারবারা একটা খোলা ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর দিকে এগিয়ে গেল কই, আসুন।

–কিন্তু আমি তো যেতে পারব না। হেস্টিংস সহজ সুরে বললেন–মঁসিয়ে পোয়ায়োর নিষেধ আছে, এঘর পাহারা দেবার জন্যই আমাকে বসিয়ে গেছেন।

-ওসব বাজে কথা ছাড়ুন, আসলে এঘরের মায়াতে জড়িয়ে পড়েছেন আপনি, তাই খোলা আকাশের নীচে যেতে মন চাইছে না। বেশ, গত রাতের কথাই বলি। ভাবুন ক্লড জ্যেঠুর

কথা। ওইখানে, ওই আরাম চেয়ারে উনি বসে আছেন, আমরা সকলেই এখানে উপস্থিত। অথচ আমরা কেউ টের পাইনি বিষক্রিয়ায় ওনার হৃৎস্পন্দন ধীরে ধীরে বন্ধ হতে চলেছে, বা অনেকক্ষণ আগেই ওঁর মৃত্যু ঘটেছে। শুধু এটুকু জানতে পেরেছি, জেঠুর সিন্দুক থেকে রহস্যজনকভাবে তারই তৈরি একটা ফর্মুলা চুরি হয়ে গেছে। সত্যি, অদ্ভুত এক পরিস্থিতি। ঠিক এই সময় আপনার পদধূলি পড়ল এঘরে। ঘরের চারদিকে চোখ বুলোলেন, মোহিত হলেন। রিচার্ডকে বললেন, বাঃ, কী চমৎকার ঘর মি. অ্যামরি। আর আপনার সঙ্গের ওই মাঝবয়সী বেঁটে লোকটা। মাথা জুড়ে মস্ত এক টাক, উঁহু-হুঁ, মুরগির ডিম। কত লম্বা হবে? বড়ো জোর পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। বাটকুল হলে কী হবে, লোকটার এলেম আছে, ওঁর প্রতিটি পদক্ষেপ, তাকানোর ভঙ্গিমা, কথা বলার স্টাইল সব মিলিয়ে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন পুরুষ। আমার মতো মেয়েকেও কাত করে দিয়েছিলেন, মুগ্ধ দৃষ্টিতে অপলক চোখে ওনার দিকে তাকিয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ। আর আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছিল, আপনি অত্যন্ত ভদ্র ও অমায়িক। আচ্ছা, আপনার জন্ম কবে? গেল মহাযুদ্ধের পরে কি?

-পোয়ারোকে ওপর-ওপর ওরকমই দেখতে লাগে। হাসতে হাসতে হেস্টিংস বললেন। আসলে লোকটা অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিখুঁত পরিপাটি ভাবে সবকিছু দেখতে চান। অনেক জিনিস আছে, যেগুলো আমরা ধর্তব্যের মধ্যে আনি না, পড়ে থাকলেও ঘুরে তাকাই না, সেইসব তুচ্ছ জিনিসকে উনি মহামূল্যবান বলে মনে করেন, সাজিয়ে গুছিয়ে সেগুলো তুলে রাখেন। যেমন তেমন করে সাজানো গয়নার সেট বা কারো পোশাকে একটু ধুলো–এসব পোয়ারো একেবারেই বরদাস্ত করতে পারেন না। মনে মনে এতটাই ক্ষুব্ধ হয়, যা আপনাকে বোঝানো যাবে না। এককথায় লোকটা অত্যন্ত খুঁতখুঁতে। আমি

মাঝে মাঝে ওঁকে দেখি আর ভাবি, দীর্ঘদিন ধরে ওঁর সঙ্গে মেলামেশা করছি, অথচ ওঁর মতো খুঁতখুঁতে স্বভাবের হতে পারিনি কেন?

–অর্থাৎ, আপনাদের দুজনের স্বভাবের মধ্যে বিস্তর ফারাক, বলতে পারেন একেবারে উলটো। বারবারা হেসে ফেলল।

হেস্টিংস বিরক্ত হলেন–আপনার হাসি পাচ্ছে? আর ওঁর কাজ? প্রতিটি কাজ সুশৃঙ্খলের পরিচায়ক। সম্পূর্ণ নিজের পদ্ধতিতে আসল অপরাধীকে খুঁজে বের করেন। অনেক গোয়েন্দাকে দেখেছি, অপরাধীর পদচিহ্ন কোথায় পড়েছে, কোথায় সে সিগারেটের ছাই বা চুরুট ফেলেছে, এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না, এসব নাকি রহস্য সমাধানে সাহায্য করে না, অথচ পোয়ারোর মতে, তদন্তের কাজ করে গোয়েন্দার মাথা আর তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা...........

-দারুণ! গোয়েন্দাদের দাদাঠাকুর, বারবারা হাসতে হাসতে বলল। তাইতো এমন কথা বলতে পারেন। তবু বাঁচোয়া, আপনার মতো সুরেলা মোলায়েম স্বরে বলেননি, কী চমৎকার ঘর, মি. অ্যামরি'! নিজের কৌতুকে বারবারা আর এক দফা হেসে উঠল।

-এখনও আমি বলছি, মাদাম, এ দুদিনে ঘরটার ওপর দিয়ে কম ঝড় বয়ে গেল না, তবুও আমার চোখে আগের মতোই খাসা চমৎকার হয়ে আছে।

–আমার দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা, বিচার বিবেচনার সঙ্গেও কারো মিল নেই, আমি স্বতন্ত্র কথা শেষ না করেই বারবারা টানতে টানতে হেস্টিংসকে নিয়ে এল খোলা জানলার কাছে। তারপর ফিক করে হেসে বলল–আর দেরি নয়, চলুন, বাগানে যাই। মেলা জ্ঞান শুনেছি

আপনার, চুপ করে মাথা ধরে গেছে। বাইরের খোলাবাতাস না হলে চলবে না। মাথা ঠাণ্ডা করে, তারপরে অন্য কথা। কী হল, এখনও দাঁড়িয়ে আছেন, আসুন বলছি।

বারবারার কণ্ঠে স্নিগ্ধ ধমকানির সুর।

নিজেকে বারবারার কবল থেকে মুক্ত করে অসহায়ের মতো ক্যাপ্টেন হেস্টিংস বললেন–আপনার অনুরোধ আমি মানতে পারছি না। কেন, তা বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, মঁসিয়ে পোয়ারো না ফিরে আসা পর্যন্ত আমাকে এই ঘরেই থাকতে হবে।

-আশ্চর্য, বারবারা হেস্টিংসের ঠিক পেছনে এসে দাঁড়াল। কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিসে বলল–ক্যাসাবিয়াংকার কথা জানেন তো? আহা বেচারা, আপনার অবস্থাও ঠিক তাই

...দ্য স্টুড অন দ্য বার্নিং ডেক...... হোয়েন অলবাট হি ব্যাড ক্লেড........ কিন্তু বন্ধু, আপনার এ হাল কেন, খুলে বলুন তো।

-আপনি আসলে কী করতে চাইছেন বলুন তো, কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে হেস্টিংস বললেন, মাঝে মাঝে আপনার কান্ডকারখানা দেখে তাজ্জব বনে যাই।

-বাজে কথা রাখুন, বারবারার ঠোঁটে হাসি–সত্যি বলছি, আপনার সান্নিধ্য পাবার জন্য মন আমার ছটফট করছে। পুরুষ মানুষ তো কম দেখিনি, কিন্তু আমার চোখে আপনি তাদের মতো নয়, সম্পূর্ণ আলাদা।

–আপনার মতো অদ্ভুত মার্কা মেয়ে জীবনে এই প্রথম আমি দেখলাম।

–এমন খুশির খবর আগে কেউ দেয়নি আমায়। এটা সুলক্ষণের একটা নমুনা। বারবারা আবার হেস্টিংসের হাতে হাত রাখল, ছেলেদের মুখে এমন কথা শুনলে আমার মতো মেয়েদের মনোবল বেড়ে যায়।

কথা শেষ করে বারবারা হেস্টিংসের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। একসময় তারা। দুজনেই এসে দাঁড়াল খোলা আকাশের নীচে, বাগানের মধ্যে।

পিসিমা ক্যারোলিন

১৩.

পিসিমা ক্যারোলিন লাইব্রেরি তথা বসার ঘরে এসে পা রাখলেন, হাতে তার সেলাইয়ের থলে। সোফার ধারটাই তার পছন্দ, বসার জন্য তৈরি হলেন। ঠিক এই সময় সেখানে হাজির হলেন ডঃ কারোলি, হাতে টুপি আর একটা ছোট স্যুটকেস।

ডঃ কারোলির চোখে-মুখে বিরক্তির রেখা প্রকাশ পেল, বোঝা গেল বুড়ি ক্যারোলিনই তার বিরক্তির কারণ, তিনি ভেবেছিলেন ঘরটা এখন ফঁকাই আছে, সে গুড়ে বালি।

ডঃ কারোলির উপস্থিতি টের পেয়ে আপন মনে ক্যারোলিন বলতে থাকলেন–সুঁচটা যে কোথায় ফেললাম, চারপাশ খুঁজে বেড়াচ্ছি, এখানেও ভুল করে ফেলে যেতে পারি, দেখি পাওয়া যায় কিনা। তারপর গলার স্বর বাড়িয়ে বললেন–কী হল ডঃ কারোলি, স্যুটকেস নিয়ে কোথায় চললেন? এখানে বুঝি আর থাকতে ভালো লাগছে না?

-কিছু মনে করবেন না, মাদাম, হাতে ধরা টুপি আর সুটকেস একটা চেয়ারের ওপর রাখতে রাখতে বললেন, এখানে তো দু-দিন মজায় কাটালাম, আর থাকাটা সমীচীন নয়, অনেকেরই অপছন্দ। তাছাড়া লন্ডনে আমার কিছু জরুরী কাজ পড়ে আছে, তাই মন না চাইলেও যেতে হচ্ছে।

–আপনাকে কে অনুমতি দিল? এ বাড়ির কাউকে বাইরে যাওয়ার হুকুম নেই বলেই তো জানি।

–চিন্তা করবেন না, মাদাম, অবজ্ঞার সুরে ডঃ কারোলি বললেন, ওসব সামলে নেব।

–একান্তই যখন যেতে হয়, তখন একটা গাড়ি ডেকে দিতে বলি। ক্যারোলিন এগিয়ে এলেন দেওয়ালের দিকে। সেখানেই কলিং বেলের বোতাম।

–মাদাম, ব্যস্ত হবেন না, কলিংবেলে হাত রাখতে গিয়েও নামিয়ে নিলেন ক্যারোলিন, ও কাজটা আমিই সেরে রেখেছি।

-কী আর করি, বলুন, ক্যারোলিন স্বাভাবিক কণ্ঠে বলতে লাগলেন, বাড়ির কাজের লোকগুলোকে দেখছেন তো। বুদ্ধি বলে কিছু আছে। আপনি ডাক্তার মানুষ তায় আবার এ পরিবারের মাননীয় অতিথি, কোথায় আপনার স্যুটকেসটা গাড়িতে তুলে দেবে, তা নয়। ওদেরই বা দোষ দিই কী করে? মনিব মারা গেছেন, তাঁর মৃত্যু রহস্যের কুলকিনারা করতে বাড়িতে হোমরা-চোমরা মানুষদের ভিড়। গোয়েন্দা, পুলিশ কে নেই বলুন। এসব দেখে বেচারারা মাথা ঠিক রাখতে পারে বলুন? আমার বয়স হয়েছে, তার ওপর মনমেজাজ ভালো নেই। কিন্তু আরও দুটো মেয়ে তো আছে, একজন ফিটের ব্যামো নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, আর অন্যজন ডঃ গ্রাহামের সঙ্গে যখন-তখন দেখা করার জন্য ছুটছে কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। ছিঃ ছিঃ, লজ্জায় মরে যাই আর কী!

–আমার একটা ফোন করা দরকার, আপনি যদি, আঙুল তুলে ডঃ কারোলি টেলিফোনটা দেখালেন।

-ফোন? ক্যারোলিন বিড়বিড় করে কী যেন বললেন, তারপর ঘাড় কাত করে বললেন–করুন, দরকার যখন, নিশ্চয়ই করবেন। আপনি সোয়া বারোটার ট্রেনেই যাচ্ছেন বুঝি। কিন্তু ও গাড়ি লন্ডনে পৌঁছতে যথেষ্ট সময় নেয়।

-জানি, সংক্ষেপে জবাব দিয়ে ডঃ কারোলি টেলিফোনের দিকে এগিয়ে এলেন। ডিরেক্টরির পাতা ওল্টাতে লাগলেন, ক্যারোলিনের নজর অন্যদিকে ফেরানোর প্রচেষ্টা আর কী। বললেন–বাগানের দিক থেকে চেনা-চেনা গলা পেলাম। মনে হয় আপনার ভাইঝি, মাদাম।

আমার ভাইঝি! তার মানে বারবারার কথা বলছেন, না? খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন ক্যারোলিন, চাপা গলায় বলতে শুরু করলেন, মেয়েটা ওপরেই অমন ছলবলে, অথচ বুকের ভেতর দুঃখের পাহাড়, নিঃসঙ্গ, ভাই আছে বটে একটা, নামে মাত্র। জ্যেঠু ছিল, তাও মরে গেল। ছন্নছাড়া জীবন আর কী! আর ওর মতো বয়সে আমরা মা-মাসীর আদর-যত্ন পেয়েছি। সেই সময় বীসওয়াক্স' নামে একটা ওষুধের খুব চাহিদা ছিল। ওর মধ্যে ভিটামিন এ, বি, সি, ডি–চারটে গুণই ছিল। রোজ নিয়ম করে খেতে হত।

ক্যারোলিনের শেষ কথাগুলো শুনে ডঃ কারোলি সচকিত হলেন–বীসওয়াক্স! আপনি এই কথাটাই বললেন তো?

হ্যাঁ, ওইরকমই বিশ্রী রকমের কিছু হবে। ক্যারোলিন বলে চললেন–বেরিবেরির জন্য ওই চার ভিটামিনওয়ালা ওষুধ ছিল। এদেশে ও রোগ খুব কম হয়। শুনেছি নেটিভ

দেশগুলোতে বেরিবেরি বেশি হয়। যারা ধান থেকে চাল বাছাই করে, মানে চাষা ভূষো আর কী, ওদের মধ্যে নাকি এই অসুখের প্রকোপ বেশি। অন্যদের কি হয় না? মি. রেনরের কথাই বলি। উনি তো আর চাষের কাজ করেন না, অথচ মুখখানা হলদে-সাদাটে হয়ে গিয়েছিল। ব্রেকফাস্টের পরে রোজ সকালে আমার কথামতো একটা করে বড়ি খেত। লুসিয়াকেও বলেছিলাম জানেন, আমার কথা কানে নিলে তো, মেয়েটার ভাব-গতিক বুঝি না, কেমন মনমরা গোছের। যাক গিয়ে, আমি হাঁফিয়ে মরি কেন, এখানকার ছেলেমেয়েরা কি এই বুড়ির উপদেশ মানতে চায়? জানেন ডঃ কারোলি, আমার বাবার আশি বছর বয়সেও চোখের জ্যোতি ছিল স্বাভাবিক। চশমার প্রয়োজন হয়নি তার। দিব্যি বাইবেল পড়েছেন। গোয়েন্দা গল্প, খবরের কাগজ পড়তে একটুও অসুবিধা হয়নি। বাবা কখনো রাতে জানলা খুলে শুতেন না, রাতের হাওয়া নাকি শরীরে লাগানো ভালো নয়, কিন্তু গেঁটে বাতের ব্যথা যখন বেড়ে গেল, তখন তার দেখাশোনার জন্য একজন মহিলা ছিল। ওই নার্স রাতে সব জানলা খুলে দিত। ব্যাস, ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকল, বাবাকে কাবু করে ফেলল। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু।

–হ্যালো এক্সচেঞ্জ? তখনও ক্যারোলিন বিড়বিড় করে চলেছেন। ডঃ কারোলির মন তখন টেলিফোনের দিকে–হ্যালো, হ্যালো, এক্সচেঞ্জ। মাকে ক্লিভ থ্রি। থ্রি-ওয়ান থেকে বলছি। লন্ডনে একটা কানেকশন চাই। ......হ্যাঁ, নম্বর বলছি........ সোহো ডবল এইট ফাইভ থ্রি....... হ্যাঁ, ফাইভ থ্রি........ আপনারাই ডাকবেন? ....বেশ, অপেক্ষা করছি।

ডঃ কারোলি রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। ক্রমশ তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে, উত্তেজনার তাড়নায় দাঁত দিয়ে নখ কাটতে লাগলেন, কেমন অস্থির ভাব।

খানিকক্ষণ কেটে গেল। এসে ঢুকলেন এডওয়ার্ড রেনর। ঘরের ভেতর পা দিয়ে সজাগ দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলেন। এবার ধীর পায়ে ফায়ার প্লেসের পাশে এসে দাঁড়ালেন, এখানেই রয়েছে ম্যান্টেলপিসের ওপর রাখা মাঝারি মাপের ফুলদানিটা, যার মধ্যে আগুন ধরানোর জন্য কুচানো কাগজ আর মোমের ছোট ছোট খণ্ড রাখা আছে।

ফুলদানিতে হাত দিতে গিয়েও থমকে দাঁড়াতে হল রেনরকে। দরজা বন্ধ করার শব্দ কানে এল, সচকিত হয়ে ঘাড় ফেরালেন। হা, স্টাডির দরজা ঠেলে ডঃ কারোলি ভেতরে ঢুকছেন। তাকে দেখে রেনর যথেষ্ট ঘাবড়ে গেলেন।

অবাক হয়ে জানতে চাইলেন আপনি? এখানে? কী মনে করে?

–আমার একটা ফোন কল আসার কথা, তাই.....

ডঃ কারোলির কৈফিয়ত রেনরের পছন্দ হল না, তিনি চুপসে গেলেন।

–শুনলাম পুলিশ এসেছে, কতক্ষণ?

ডঃ কারোলির প্রশ্নের উত্তরে রেনর জানালেন বেশীক্ষণ নয়, কুড়ি-পঁচিশ মিনিট হবে। ওই সবজান্তা গোয়েন্দাটার সঙ্গে পুলিশ অফিসারের খুব ভাব। আরে কী যেন নাম লোকটার জ্যাপ, বেঁটে গোয়েন্দার সঙ্গে বেশ খাতির করে কথা বলছে। চেনেন নাকি ওই পুলিশ অফিসারকে?

-কী নাম বললেন? জ্যাপ না? ডঃ কারোলি থামলেন, পরক্ষণে বললেন, চিনি মানে, একবার দেখেছি, তাও দুর থেকে।

-উনি নাকি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর, বাড়ির কাজের লোকগুলো বলাবলি করছিল, তাতেই শুনলাম। কাছে পিঠে কোথায় একটা তদন্তের কাজে এসেছিলেন। স্থানীয় থানা থেকে খবর পেয়ে এ মৃত্যুর কিনারা সন্ধানে ঢুকেছেন এখানে।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। কথা থামিয়ে রেনর ঘরের একপাশে চলে গেলেন।

ডঃ কারোলি রিসিভার তুলে নিলেন। ফিসফিসিয়ে বললেন–হ্যালো, মিওয়েল নাকি?

...হ্যাঁ, ভাই, আমি ....না না, শেষ রক্ষা হল কই, বুড়োটা যে কাল রাতেই পরলোকে যাত্রা করেছে....... না না, ডেথ সার্টিফিকেট পাওয়া যায় নি। লাশ কাটাছেঁড়া হয়েছে, শুনছি তো পাকস্থলীতে বিষমেশানো কফি পাওয়া গেছে.......কী বলছ? পুলিশ? হ্যাঁ এসেছে। ওই লোকটা। জ্যাব। একটু আগেই ঢুকেছে। ইন্সপেক্টার জ্যাপকে ভুলে গেছো নাকি?......হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টার ......না না, আমার মুখ দেখবার সুযোগ পেল কই? যাক, ছাড়ো ওসব কথা, আমি খুব শিগগিরই পৌঁছে যাচ্ছি হ্যাঁ, মোহোর ওই পুরনো ঠেক–ওখানেই আমায় পাবে। আজ রাত সাড়ে নটা নাগাদ চলে এসো, বুঝেছ, ভুল করো না। রাখছি, ঠিক আছে।

ফোনে কথা বলা শেষ করে ডঃ কারোলি হাতে টুপি আর স্যুটকেস তুলে নিলেন। খোলা ফ্রেঞ্চ উইন্ডোই এখন তার লক্ষ্য। দু-পা এগিয়েছেন কী এগোননি, এমন সময় জানলা দিয়ে ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইন্সপেক্টর জ্যাপ, পেছনে তার দোসর এরকুল পোয়ারো।

পোয়ারোর বুঝতে দেরি হল না, কারোলি পালাতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তা তো হবার নয়। তিনি একেবারে ডঃ কারোলির সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ডঃ কারোলি চটে গেলেন খেলা করছেন নাকি! পথ ছাড়ুন। সময় নেই হাতে। এক্ষুনি বেরোতে হবে।

-মাফ করবেন, পোয়ারো বললেন, এ বাড়ির কাউকেই এক পাও বাইরে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না জানেন।

–ওসব বাজে কথা রাখুন। ভালো চান তো সরে দাঁড়ান। ডঃ কারোলি প্রায় ধমকে। উঠলেন।

–আমার ভালো-মন্দ আপনি বিচার করবেন?

তখন পোয়ারোকে খ্যাপা মোষের রোগ চেপে ধরেছে। তিনি সামান্য সরে এলেন, নিজের ডান পা ঢুকিয়ে দিলেন ডঃ কারোলির দুপায়ের ফাঁকের মাঝে, তারপর দিলেন এক ল্যাং। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে কুপোকাত। ডঃ কারোলি একেবারে গিয়ে পড়লেন একটা খালি চেয়ারে।

ইতিমধ্যে কনস্টেবল জনসনও সেখানে পৌঁছে গেছে। পোয়ারো তাকে ইশারা করলেন। সে ডঃ কারোলির হাত থেকে স্যুটকেসটা কেড়ে নিল।

-ও-হো-হো, কী করছেন, মশাই? ঠিক করে বসুন, পড়ে যাবেন যে, বলতে বলতে ইন্সপেক্টার জ্যাপ এগিয়ে এলেন, বয়সের কথা ভুলে গেলে চলবে! চেয়ার থেকে ডঃ কারোলিকে টেনে তুললেন, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলন জ্যাপ, অবাকও হলেন।

-আরে, এ কাকে দেখছি? চোখ পাকিয়ে জ্যাপ বললেন–এ কাকে দেখছি, তুই টোনিও না, হা, ঠিক ধরেছি। সেই পোড়খাওয়া শয়তান। তা হতচ্ছাড়া, বাইরে কি ভাগাড়ের আকাল পড়েছে। কোন ধান্দায় এখানে এসে সেধিয়েছিস শুনি।

পোয়ারোও হতবাক। ডঃ কারোলির দিকে আঙুল তুলে জানতে চাইলেন–একে চেনেন? আপনার পুরোনো লোক বুঝি।

–তা যা বলেছেন, পুরোনো লোকই বটে, জ্যাপ মুচকি হাসলেন। এরা হল চোর আর ব্ল্যাকমেলারের দল। ইটালি থেকে ধাওয়া খেয়েছে, ঘাঁটি গেড়েছে এই শহরে। এ হল ওই দলের নাটের গুরু। চাঁদু অত্যন্ত ধড়িবাজ, ভাগ্যিস আপনি সময় মত ওকে ল্যাং মেরে কাত করে দিয়েছিলেন, তাইতো হতভাগাকে ধরা গেল, না হলে আমার হাত পিছলে বেরিয়ে পগাড় পার হত। টোনিও, তোর কপালটা মোটেই ভালো নয়, দুঃখ হচ্ছে। কয়মাস আগের কথা মনে পড়ে তোর? মিলানের আর্ট মিউজিয়াম থেকে রেমরুনের আঁকা আসল ছবিটা চুরি করেছিলিস, তোরই এক সাগরেদ ওটা বেচতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। কেসটা আমাদের হেপাজতেই এখনও পর্যন্ত রয়েছে। তোর মদতেই চুরিটা হয়েছিল, ও সেটা বলে দিয়েছে, বুঝেছিস। ট্যা-ফু না করে সঙ্গে কী কী আছে বের

কর। তারপর কনস্টেবলকে লক্ষ্য করে জ্যাপ বললেন–জনি, দাঁড়িয়ে না থেকে ওর পকেট সার্চ করো।

জনসন তার ওপরওয়ালার হুকুম তামিল করল। ডঃ কারোলির পকেটগুলি হাতড়ে বেড়াল। শেষ পর্যন্ত তার জ্যাকেটের ভেতরের পকেট থেকে বের করল একটা অটোমেটিক পিস্তল ছোট এবং নলটা থ্যাবড়া মুখো। এবার ট্রাউজারের হিপপকেট, পাওয়া গেল একটা চাকু, কয়েকটি ফলা সেটির, খুব শান বোঝা গেল। এবার স্যুটকেস ঘাঁটা হল–বিশেষ কিছুই নেই। পাওয়া গেল একটা স্টেথোস্কোপ ব্লাডপ্রেসার মনিটর, আর একটা পুঁচকে টর্চ।

–টোনিও, তোর জবাব নেই। ভণ্ড ডাক্তার সেজে টুক করে ঢুকে পড়েছিস। হাসতে হাসতে জানতে চাইলেন বলি কোন মতলবে এখানে ঢুকেছিলিস? অসুখ-বিসুখের সঙ্গে পিস্তল-চাকুর কী সম্পর্ক?

-নিজেকে রক্ষার কারণে। ডঃ কারোলি জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে তাকালেন, বুঝি পারলে গিলে খায়, আমার কাছে এমন কোনো আপত্তিকর জিনিস নেই, যা আপনাদের আমাকে আটকে রাখতে সাহায্য করবে, ইন্সপেক্টার জ্যাপ। তাছাড়া আপনার সে ক্ষমতাও নেই। তাই বলছি, আমাকে ছেড়ে দিন।

দাঁড়া, দাঁড়া, কলে-পড়া ইঁদুরের মতো ছটফট করিস না। আগে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের হাজতে যা, একটু সেবাযত্ন নিয়ে শরীরের মস্তি করে নে, তারপর দেখবি, তোকে আটকে রাখার ক্ষমতা আমার আছে কিনা। মঁসিয়ে পোয়ারো, জ্যাপ তাকালেন পোয়ারোর দিকে,

আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি এই হারামজাদাই ফর্মুলাটা সরিয়েছে, তারপর স্যার ক্লডকে খুন করেছে। ওর কাছে নিশ্চয়ই এখনও ওই ফর্মুলাটা আছে, নয়তো পালানোর জন্য এত ধানাই-পানাই করছে কেন?

পোয়ারো ভালো করে লক্ষ্য করলেন ডঃ কাবোলির ভেকধারী টোনিওকে–তাঁর এক হাত জ্যাপের বজ্রমুঠির মধ্যে, অন্য হাত সবলে ধরে আছে। রহস্যানুসন্ধানী এরকুল পোয়ারো। স্যুটকেসের ভেতরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন পোয়ারো, তারপর ঢাকনাটা বন্ধ করে দিলেন।

–আপনি নিজেকে কী মনে করেন? আমার সঙ্গে চালাকি করতে আসবেন না। ডঃ কারোলির চাপা হুঙ্কার শোনা গেল। আমি ছাড়াও ও জিনিস চুরি করার জন্য এ বাড়িতে আরও অনেক লোক আছে, সেটা ভেবে দেখেছেন?

–আপনার মুখ বুজে থাকাই মঙ্গল, পোয়ারো হুঁশিয়ারি ছিলেন।

পোয়ারোকে সমর্থন করে জ্যাপ বললেন, উনিও তোকে চুপ থাকতে বলছেন, আমিও বলছি, মুখ খুলে নিজের খারাপ ডেকে আনিস না। জনি, আমি এই শয়তানটাকে দেখছি, তুমি ওপরে যাও, সকলকে বলল, আমি এখুনি ডাকছি, ওরা যেন নীচের এঘরে চলে আসেন।

–বেশ, যাচ্ছি, ডঃ কারোলির হাতটা ছেড়ে দিয়ে কনস্টেবল ঘরের বাইরে চলে গেল। এই সুযোগে এক ঝটকায় জ্যাপের হাত ছাড়িয়ে ডঃ কারোলি খোলা জানলার দিকে ছুটে গেলেন, অবশ্য তাড়াহুড়োতে তার স্যুটকেসটা নিতে ভোলেননি। কিন্তু এবারেও তাকে

ব্যর্থ হতে হল। পোয়ারোর জুজুৎসুর প্যাঁচের পাল্লায় যে পড়েছে, সে জানে কত ধানে কত চাল। কারোলির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। একেবারে সটান মুখ থুবড়ে তিনি পড়লেন মেঝের ওপর। হাতে ধরা স্যুটকেসটা ছিটকে পড়ল খানিক দূরে।

জ্যাপ কঠিন চোখে তাকালেন কারোলির দিকে, স্যুটকেসটা তুলে নিলেন। বাজখাঁই গলায় বললেন–তোর কি এখানে বসেই মারধোর খাওয়ার সখ হয়েছে? আমার এই ছোকরা কনস্টেবলকে তো চিনিস না, তোকে কয়েকটা মোক্ষম দাওয়াই দেওয়ার জন্য ওর হাতটা নিশপিস করছে, বুঝতে পারছি, কেবল আমার হুকুমের অপেক্ষায়। তাই বলছি, শুধু-শুধু মারধোর না খেয়ে ভদ্রছেলের মতো এখানে বোস, আরাম কর।

কারোলির কাঁধ দুটো ধরে জ্যাপ জোর করে তাকে সোফার ওপর বসিয়ে দিলেন। সত্যি ডঃ কারোলি ইন্সপেক্টার জ্যাপের কথা রেখেছেন, আর উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেননি, বরং গদিতে ঠেস দিয়ে আয়েস করে বসেছেন।

তবে ভেতরে-ভেতরে সাপের মতো ফুঁসছেন, তা বোঝা গেল। মাঝে মধ্যে কঠিন দৃষ্টিতে জ্যাপ ও পোয়ারোকে দেখছেন।

কারোলি এই মুহূর্তে ম্যাপের নাগালের মধ্যেই আছেন বুঝে পোয়ারো সেখান থেকে সরে এলেন, ধীর পায়ে হেঁটে গেলেন খোলা জানলার দিকে। দাঁড়ালেন।

এসময় ক্যাপ্টেন আর বারবারা বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। এবার ওঁদের ঘরে ফেরার সময় হয়েছে। দু'জনে হাতে হাত রেখে হাসতে হাসতে হেঁটে আসছেন। ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে

অনিমিখ নয়নে পোয়ালরা এই দৃশ্য উপভোগ করলেন। ওঁরা ভেতরে এসে ঢুকলেন, পোয়ারোকে কেউ দেখতে পাননি।

পোয়ারো এসে দাঁড়ালেন বন্ধু ও সহকারী হেস্টিংস-এর গা ঘেঁষে। কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বললেন–এসব কী হচ্ছে, হেস্টিংস? আমার অবর্তমানে ঘর থেকে পালিয়ে গেলে ওই ছুকড়ির সাথে প্রেমালাপ করতে? বলিহারি বাপু! দিনে দিনে ছোট হচ্ছো দেখছি। তোমার বউয়ের কানে খবরটা না তুললেই নয় দেখছি, মজা বুঝবে তখন।

নিরুপায় হয়েই, হেস্টিংস লজ্জিত হলেন, একটুকরো হাসি দেখা গেল ঠোঁটে, তোমার কথা মতো এখানেই ছিলাম। কোত্থেকে বারবারা এল। বাগানে যাবার জন্য টানাটানি করতে লাগল, কোনও জোর আপত্তি শুনল না। বিশ্বাস করো, একটু মিথ্যে বলছি না। বুঝলে পোয়ারো, মেয়েটার মস্তিষ্ক বিকৃতি আছে, সামান্য হলেও আছে। না হলে একটানা কেউ অত বকতে পারে। এই কারণেই বোধহয় ডঃ গ্রাহাম ওকে বিয়ে করতে তালবাহানা করছেন।

ইতিমধ্যে অ্যামরি পরিবারের লোকেরা ভেতরের দরজা দিয়ে স্টাডিতে ঢুকতে শুরু করছেন। বারবারা জ্যাপের দিকে তাকাল, একটু হাসল, তারপর সোফাতে বসে পড়ল, অবশ্য ডঃ কারোলির থেকে দূরত্ব বজায় রেখেই।

হবে হয়তো। হেস্টিংসএর কথায় পোয়ারো কোনোরকমে জবাব দিলেন। তারপর বললেন–যাক, এবার কাজের কথায় আসি। এবাড়ির লোকেরা কে কোথায় কোন

অবস্থানে দাঁড়িয়ে বা বসে আছেন, তা নিখুঁত ভাবে দেখে নেওয়া তোমার দায়িত্ব। স্মৃতির মধ্যে ধরে থাকবে, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

-কী কাজে লাগবে, শুনি?

–ফের তর্ক! আস্তে অথচ ধমকের সুরে পোয়ারো বললেন। চোখে হাসির ঝিলিক খেলিয়ে বললেন–আমার কথার অবাধ্য হয়েছে তো, মনে রেখো, আজ রাতেই তোমার বউয়ের কাছে খবর পৌঁছে যাবে।

***

পোয়ারোর নির্দেশ মতো হেস্টিংস তাঁর কাজ শুরু করে দিলেন। অবশ্য পোয়ারোও সবকিছু লক্ষ্য করছেন। দেখা গেল পিসিমা ক্যারোলিনকে, তার এক হাত রিচার্ড ধরেছে, অন্য হাতটি লুসিয়া। তারা ঘরের মধ্যে চলে এলেন। একটা ছোট টুলে ক্যারোলিনকে বসিয়ে দিয়ে ওরা স্বামী-স্ত্রী এসে বসল টেবিলের ডান পাশের দুটি কাছাকাছি চেয়ারে। লুসিয়ার ওপর নজরদারি চালাতে সুবিধা হবে বলে রিচার্ড তার বউয়ের গা ঘেঁষে বসেছে, তা বুঝতে দেরি হল না স্বনামধন্য গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারো ও তার সহকারী ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর।

তখনও একজন আসতে বাকি। অবশেষে তিনি এসে ঢুকলেন। আরামকেদারায় বসলেন, যেখানে বসে স্যার ক্লড অ্যামরি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। ইনি হলেন স্যার ক্লডের সচিব এডওয়ার্ড রেনর।

রিচার্ড প্রথমে ক্যারোলিন ও বারবারাকে উদ্দেশ্য করে জ্যাপকে দেখিয়ে বলল–উনি হলেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের এক নামী ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টার জ্যাপ।

জ্যাপ তার কনস্টেবলকে ঘরের দরজা ভেতর থেকে ভালোভাবে বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দিলেন।

এপর্যন্ত ক্যারোলিন জ্যাপের নাম কেবল শুনেছেন, এখন ওই রাশভারী ইন্সপেক্টারের সাথে পরিচয় হতে ঘাবড়ে গেলেন। ভয়ে ভয়ে ভাইপোর কাছে জানতে চাইলেন–অবশেষে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে হানা দিতে হল? কেন বলতে পারিস?

–কেন? তাহলে শোনো, পিসিমা। রিচার্ড বলল, ডঃ গ্রাহামের রিপোর্টের ভিত্তিতে বাবার মৃতদেহ পোস্টমর্টেমে পাঠানো হয়। সেখানে কাটাছেঁড়া করে ওরা যে রিপোর্ট দিয়েছে, তা বলা হয়েছে, এ স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, বিষ মেশানো কফি খাইয়ে খুন করা হয়েছে।

একথা শুনে ক্যারোলিন ডুকরে চেঁচিয়ে উঠলেন।

–মি. অ্যামরি, এসব কী বলছেন? রেনর ভুরু কুঁচকে চোখ পাকিয়ে বললেন–শেষ পর্যন্ত খুন, তাও যেমন–তেমন নয়, একেবারে বিষ খাইয়ে হত্যা।

-হ্যাঁ, করোনার রিপোর্ট পরিষ্কার লেখা হয়েছে, রিচার্ড কেটে কেটে জবাব দিল বাবার পেটে বিষ মেশানো কফির নমুনা মিলেছে। হিসকোসিন, যা খাইয়ে তাকে খুন করা হয়েছে।

-কী, হিসকোসিন? রেনর চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও সংযত হলেন–আমি জানি, দেখেছিও। ব্যাস, রেনর মুখে কুলুপ আঁটলেন। কেবল বাঁকা চোখে লুসিয়াকে জরিপ করতে লাগলেন।

এবার ইন্সপেক্টার জ্যাপ এগিয়ে এসে জানতে চাইলেন, কী হল, থামলেন কেন? কী জানেন, কী দেখেছেন, বলুন, মি. রেনর।

-না-না, কিছু জানি না, কিছু দেখিও নি। রেনরকে তখন বুঝি বোবাতে পেয়েছে, অসংলগ্নভাবে জবাব দিলেন।

ঘরের সকলে চুপ, কেবল একটা উসখুসানি শুরু হয়ে গেছে বোঝা গেল। মি. রেনর কী জানেন বা কী দেখেছেন–সেটাই হল মুখ্য প্রশ্ন।

মি. রেনর, জ্যাপ আবার বলেন, আপনি যে কোনো কিছু গোপন রাখতে চাইছেন, তা স্পষ্ট। আমরা আপনার সহায়তা চাইছি। কী এখানে সেদিন ঘটেছিল, ভোলা মনে ভালোয় ভালোয় বলে ফেলুন। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করতে আমাদের বাধ্য করবেন না। যা জানেন বলে ফেলুন।

–বিশ্বাস করুন, এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নয়, রেনরের সেই হেঁয়ালি পূর্ণ, কথাবার্তা আমার বক্তব্য হল খুব স্বাভাবিকভাবে এর কিছু যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আছে বলে আমি মনে করি না।

ব্যাখ্যা! কীসের ব্যাখ্যা? জ্যাপ গম্ভীর মুখে রেনরের একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালেন মশাই, এখনও সময় আছে, মুখ টিপে থাকবেন না। আসল কথাটা সকলকে শুনিয়ে দিন। নয়তো আপনার ভোগান্তির অন্ত থাকবে না আবার বলছি, যা জেনেছেন দেখেছেন, ঘর ভর্তি লোকের সামনে প্রকাশ করুন।

জ্যাপের ধমক খেয়ে রেনর তার দিকে তাকালেন, কী বলতে গিয়ে ঠোঁট খুললেন বটে, কিন্তু পরক্ষণে তা বন্ধ হয়ে গেল। উনি যে খুব ভয় পেয়েছেন, বুঝতে কারো বাকি রইল না।

-কী হল? বোবা হয়ে গেলেন যে, বলুন। জ্যাপের গর্জনে রেনর চমকে উঠলেন।

–হ্যাঁ বলছি। রেনর ঢোক গিললেন, তারপর বললেন, দেখেছিলাম একটা ওষুধের টিউব থেকে কয়েকটা ছোট বড়ি বের করে মিসেস লুসিয়া অ্যামরি হাতের মধ্যে লুকিয়ে রাখছে। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেললেন রেনর।

-কখন ঘটেছিল? জ্যাপ জানতে চাইলেন।

–গতরাতে। ডিনার শেষ করে সবাই এঘরে বসে গল্পগুজব করছিলেন। গ্রামোফোনে একটা পুরনো রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে বারবারা নাচছিল ফক্সট্রট নাচ। বারবারাকে ঘিরে সকলে বসে আছে। বাজনার আওয়াজ আমার কানে গেল। স্টাডি থেকে বেরিয়ে এলাম। বারবারার অনুরোধে আমিও ওর সাথে নাচতে শুরু করলাম। তখনই নজর পড়ল লুসিয়া অ্যামরির ওপর। দেখি ওষুধের বাক্স থেকে একটা টিউব বার করলেন। এসময় কোনো দিকে নজর ছিল না তার। টিউব উলটে ধরলেন বাঁ হাতের চেটোতে। আমার ধারণা,

ওগুলো হিসকোসিন। এরপরেই স্যার ক্লডের ডাক পড়ল। আমি ফের স্টাডিতে এসে ঢুকলাম।

-আপনি এতসব জানেন, অথচ বলেননি, কেন? জ্যাপ পুলিশি কায়দায় জানতে চাইলেন–মঁসিয়ে পোয়ারো এখানে ছিলেন, তাকে অন্তত বলতে পারতেন।

রেনর অবশ্য পালটা কোনো কথা বললেন না। তিনি চুপ করে বসে রইলেন। লুসিয়া কিছু বলার জন্য উঠে দাঁড়াল। তা বুঝতে পেরে জ্যাপ হাত ইশারায় থামতে বললেন মিসেস অ্যামরি, আপনার পালা এখনও আসেনি। মি. রেনরের সঙ্গে কথা বলা শেষ হোক, তারপর আপনার বক্তব্য শুনব।

-আপনি যাই বলুন, অফিসার, রেনর বলতে শুরু করলেন, আসলে এই ঘটনার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। মি. রিচার্ড অ্যামরির মুখে কফির সঙ্গে হিসকোসিন পাওয়ার খবরটা শুনে মনে পড়ে গেল। অবশ্য মিসেস লুসিয়া অ্যামরির হাতের বড়িগুলো হিসকোসিন নাও হতে পারে, অন্য কোনো ওষুধ হবে হয়তো।

-বুঝলাম, এবার জ্যাপ তাকালেন লুসিয়ার দিকে। বললেন–আপনি কী বলতে চাইছিলেন, এবার বলুন, ম্যাডাম।

-আসলে, আমি ওই বাক্সের ওষুধের টিউবগুলো নেড়ে চেড়ে দেখছিলাম, এমন ওষুধ খুঁজছিলাম, যার একটা খেলে খুব ভালো ঘুম হবে, এক ঘুমেই রাত কাবার।

জ্যাপ এবার রেনরের দিকে তাকালেন–আপনি বললেন, টিউবের ভেতরের প্রায় সব বড়ি হাতে ঢেলে নিয়েছিলেন, তাইতো?

-হ্যাঁ, তেমনটাই দেখেছিলাম।

-ম্যাডাম, জ্যাপ আবার লুসিয়াকে জেরা করতে শুরু করলেন, একটা কী দুটো বড়িই ভালো ঘুমের জন্য যথেষ্ট, কিন্তু অতগুলো বড়ি কী করলেন আপনি? বলুন।

-কী করলাম, মনে পড়ছে না। লুসিয়া একটু থামল, পরক্ষণে কী বলতে গিয়ে বাধা পেল।

ততক্ষণে ওদিকে সোফা থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছেন ডঃ কারোলি। হিংস্র দৃষ্টিতে লুসিয়ার দিকে তাকালেন। ঘৃণা ভরা কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন–ইন্সপেক্টার, ব্যাপারটা দেখলেন তো? আমাকে খামোখা সন্দেহ করে শুধু-শুধু আটকে রাখলেন আপনি এখনও। বুঝতে পারছেন না, ওই কাঁচুমাচু মুখে বসে থাকা মহিলাটিই হল আসল খুনি, যে তার শ্বশুর স্যার ক্লড অ্যামরিকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছে।

কারোলির চিৎকার চেঁচামেচি বারবারার সহ্য হচ্ছিলনা। সে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তক্ষুনি ক্যাপ্টেন হেস্টিংসকে তার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াতে দেখা গেল, ভঙ্গী দেখে মনে হল, একমাত্র তিনিই পারেন এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে বারবারাকে রক্ষা করতে।

ইন্সপেক্টার জ্যাপ হাত তুলে ডঃ কারোলিকে সংযত হতে ইঙ্গিত করলেন। বললেন আপনার কথাই শেষ কথা নয়, জানবেন। তাছাড়া আপনার সাথে, চেনাজানার ব্যাপারটা

আমার কম দিনের নয়, অতএব আপনি কতটা সৎ বা অসৎ, তা জাহির না করলেও চলবে।

-আপনার মন চাইলে, ইচ্ছে মতো বলতে পারেন, আপত্তি নেই। ডঃ কারোলি গলার স্বর একটুও নামাল না। একই ভঙ্গিতে বললেন–আমি বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলছি না। আসল কথাটা জেনে নিন, ইন্সপেক্টার তাছাড়া আপনি তো জানতে চেয়েছিলেন, কোন মতলবে এ বাড়িতে ঢুকেছি? ওই মহিলা, মানে মিসেস লুসিয়া অ্যামরির ডাকেই আমি এখানে এসেছিলাম, অবশ্য তখন আমার মাথায় কোনো বদ মতলব ছিল না। উনি আমায় বললেন, ওঁনার শ্বশুর স্যার ক্লডের তৈরি করা ফর্মুলা হাত সাফাই করে আমার কাছে বেচে দেবেন। আপনি ভালো করে জানেন ইন্সপেক্টার, এসব কাজে আমি অভ্যস্ত। তাই ওঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম।

নিজের দোষ ঢাকবার জন্য বেশ গল্প কেঁদেছেন দেখছি, জ্যাপ আবার ধমকে উঠলেন। আপনি হলেন পুরোনো পাপী। আপনার গুণের কি শেষ আছে, মশাই! ইন্সপেক্টার এবার লুসিয়াকে প্রশ্ন করলেন–ওই লোকটা যা যা বলবেন, সব কি সত্যি, ম্যাডাম?

লুসিয়ার মুখ সাদা হয়ে উঠল, কে যেন বুঝি এক লহমাতে তার পায়ের রক্ত শুষে নিয়েছে। রিচার্ড তাকাল বউয়ের মুখের দিকে, সে ঘাবড়ে গেল, কী জানি বাবা, এক্ষুনি না জ্ঞান হারায়। তার ভীষণ রাগ হল। সে গলা চড়িয়ে বলল–অফিসার, এসবের মানে কী? দেখছেন, আমার স্ত্রীর শরীর ভালো নেই, নাকি বুঝেও বুঝতে চাইছেন না। এসব আমি মোটেই হতে দেব না, বলে রাখছি।

জ্যাপ চোখ রাঙিয়ে বললেন–আপনি কেন বাধা দিচ্ছেন, মি. অ্যামরি? ম্যাডামের আত্মপক্ষ সমর্থনে যদি কিছু ওনার বলার থাকে, তাহলে ওঁকেই বলতে দিন, আপনি দয়া করে থামুন।

লুসিয়া তাকাল রিচার্ডের দিকে, অবশ্য সরাসরি নয়, উঠে দাঁড়াল, কিছু বলবে বুঝি।

ঠিক এই সময় ডঃ কারোলি রাগত স্বরে বলে উঠলেন উনি আবার কী বলবেন? বলার কী আছে। দেখছেন না সব ফাঁস হয়ে যাওয়াতে কেমন মরা মাছের মতো মুখখানা হয়ে গেছে। ওই মহিলা কার রক্ত বয়ে বেড়াচ্ছে জানেন? শুনলে আপনারা চমকে উঠবেন। ওর মা সেলমা গেতজ, কুখ্যাত নারী গুপ্তচর। নিজের ঘৃণিত পরিচয় গোপন রেখে স্যার গ্লডের ছেলেকে এটা-সেটা বুঝিয়ে বিয়ে করতে বাধ্য করছে। তারপর আদর্শ গৃহবধূর ভান করে ঘর-সংসার করছে। ওইমহিলাকে বিশ্বাস নেই, যখন তখন যার তার সর্বনাশ করতে পারে, ওর সংস্পর্শে না-আসাই মঙ্গল।

-চুপকর, বদমাইস। শার্টের হাতা গুটিয়ে রিচার্ড চেয়ার ঠেলে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। কারোলিকে লক্ষ্য করে হুমকি দিল–তুই আমায় চিনিস নারে, শয়তান। এমন ঘুষি লাগাব, নাকটা আর নাকের জায়গায় থাকবে না। তোর ওই মোটা শরীরের হাড়গুলো আস্ত থাকবে না জানিস। তোর হাল বারোটা করে ছাড়ব।

জ্যাপ দু-হাত তুলে রিচার্ডকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। বললেন মি. রিচার্ড, আপনি যদি আগে ভাগে ওর হাড়গোড় গুঁড়ো করে দেন, তাহলে আমাদের ভাগ্যে কী জুটবে। মনে রাখবেন, ও একটা ক্রিমিনাল, পুলিশের খাতায় ভুরি ভুরি অভিযোগ আছে ওর

নামে। বর্তমানে কারোলি আমার হেপাজতে। কয়েকদিনের মধ্যে ওকে আদালতে হাজির করা হবে।

রিচার্ড নিজের চেয়ারে আবার বসে পড়ল। এবার জ্যাপ তাকালেন লুসিয়ার দিকে। বলেন–ম্যাডাম, আমরা এই মৃত্যুরহস্যের কিনারা করতে চাইছি। আর আপনারা যদি এভাবে ব্যাগড়া দেন, তাহলে কি কাজ এগোবে। আপনাকে বলছি ম্যাডাম, কারোলির কথা বাদ দিন, আপনার কী বক্তব্য আছে, তাই শুনতে চাইছি আমরা।

লুসিয়া নীরবে ঘুড়ে দাঁড়াল, আড়চোখে রিচার্ডের দিকে তাকাল। পরক্ষণে পোয়ারোর দিকে তাকাল, দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে অসহায়তা, পরক্ষণে কী মনে করে একটা হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে।

পোয়ারো তাকালেন লুসিয়ার দিকে। মাদাম, ঘাবড়ে যাবেন না, মনে বল আনুন। পোয়ারো তাকে সাহস জোগালেন আপনাকে গোড়াতেই বলেছি, আমি আপনার বাবার বয়সী, আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আপনার বক্তব্য পেশ করুন। যা কিছু মিথ্যে ছিল, সব প্রকাশ্যে এসে গেছে। এখন শুধু সত্যি জানার সময় এসেছে। মনে রাখবেন, হাজার চাপা দিয়েও সত্যকে ঢেকে রাখা যায় না, একদিন না একদিন তার প্রকাশ ঘটবেই। তাই বলছি, মাদাম, যা কিছু বলতে চান, বলে ফেলুন, নিজেকে হালকা করুন।

পোয়ারো তার জায়গা ছেড়ে ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন খোলা জানলার সামনে, কিন্তু কান খাড়া।

-হ্যাঁ, লুসিয়া চুপ করল, খানিকটা সময় কেটে গেল, হয়তো বা মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে নিল। পরক্ষণে শোনা গেল লুসিয়ার ধীর ও স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর–সেলমা গেতজ আমার মা, আমি তার গর্ভস্থ সন্তান। ডঃ কারোলির কথানুযায়ী এপর্যন্ত সত্যি। তারপরের যা কিছু, সেগুলো ওনার মনগড়া গল্প। উনি ইচ্ছে করে ওনার দোষটা আমার ঘাড়ে ফেলে দিতে চাইছেন। আসলে ব্যাপারটা ঠিক উলটো। ওঁকে এখানে আসার জন্য আমি পীড়াপীড়ি করিনি, স্যার ক্লডের ফর্মুলা চুরি করে বিক্রি করা কথাটাও সম্পূর্ণ মিথ্যে। ওনার মূল উদ্দেশ্য ছিল আমাকে ব্ল্যাকমেল করা। প্রচুর টাকা কামানোর ধান্দায় এই পরিবারের জাল অতিথি হয়ে ঢুকে পড়েছিলেন।

-কী বলছ, লুসিয়া? রিচার্ড আগুন চোখে স্ত্রীর দিকে তাকাল, লোকটা তোমায় ব্ল্যাকমেল করতে এসেছে?

রিচার্ড লুসিয়ার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল।

-হ্যাঁ, রিচার্ড। লুসিয়া জোরে জোরে বলতে লাগল, আজ আমি সত্যি বলতে আর ভয় পাই না। উনি সব সময় আমায় ভয় দেখাতেন–ফর্মুলা যদি ওনার হাতে তুলে না দিই, তাহলে আমার অতীত বাড়ির সকলকে বলে দেবেন। কিন্তু ফর্মুলা হাতিয়ে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি, বিশ্বাস করো তুমি। ফর্মুলা-চোর হিসাবে আমার সন্দেহ হচ্ছে ওনাকেই, কারণ যখন-তখন স্টাডিতে ঢোকার সুবিধা উনি পেতেন এখন বুঝতে পারছি, উনি কেন আমার কানে কানে শুনিয়েছেন হিসকোসিনের ক্ষমতার কথা। ওটা নাকি খুব ভালো ঘুমপাড়ানি ওষুধ। আসলে ডঃ কারোলি ধরেই নিয়েছিলেন, আমি হিসকোসিন খেয়ে মরব। ব্যাস, আর ওনাকে পায় কে! চাউর করে দেবেন ফর্মুলা চুরি করে ধরা পড়ার

ভয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছি। শয়তানিতে ওঁর জুড়ি মেলা ভার। হাড়ে হাড়ে চিনি ওঁকে, কত মেয়ের যে সর্বনাশ করেছেন, তা আর কী বলব।

লুসিয়া নিজেকে আর সামলাতে পারল না। কান্নায় ভেঙে পড়ল।

রিচার্ড তাকে নিজের কাছে টেনে নিল–শান্ত হও, ডার্লিং। তোমার এই ছোট্ট বুকের মাঝে কত চাপ ধরে রেখেছ, অথচ আমার সঙ্গে ভাগ করোনি। সব যন্ত্রণা একাই বহন করেছ।

কিন্তু ততক্ষণে লুসিয়া বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। পিসিমা ক্যারোলিন ছুটে এলেন। রিচার্ড তার সহযোগিতায় লুসিয়াকে ধরে টেবিলের ওপর শুইয়ে দিল।

পোয়ারো এবার জানলা ছেড়ে চলে এলেন ডঃ কারোলির সামনে। বেশ আয়েস করে গদিতে বসেছিলেন ডঃ কারোলি। পোয়ারো এক ঝটকায় কারোলিকে হটিয়ে দিয়ে গদিটা হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে নিলেন। সেটা হাতে নিয়ে এলেন টেবিলের কাছে। লুসিয়ার মাথার গদির ওপরে তুলে দিয়ে ফিরে গেলেন আবার আগের অবস্থানে।

ঘটনাটা এত চটজলদি ঘটে গেল যে, নিষ্ফল আক্রোশে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ছাড়া ডঃ কারোলির কিছুই করার নেই।

রিচার্ড এগিয়ে এল ইন্সপেক্টার জ্যাপের সামনে। বলল–আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।

জ্যাপের সম্মতি পেয়ে রিচার্ড তার কানের কাছে মুখ এনে অত্যন্ত নীচু স্বরে কী যেন বললেন, যা অন্য কেউ শুনতে পেল না।

-অবশ্যই, জ্যাপ বললেন, উনি আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, যান, ওনাকে নিয়ে নিজের ঘরে শুইয়ে দিন।

জ্যাপের ইঙ্গিতে কনস্টেবল দরজা খুলে দিল। ক্যারোলিন আর রিচার্ড, দুপাশে দু'জন লুসিয়াকে ধরে দোরগোড়ায় এল। ঠিক এই সময় রেনর উঠে দাঁড়ালেন। ব্যথাহত কণ্ঠে বললেন–মাফ করবেন, মি. অ্যামরি, সত্যিই আমি দুঃখিত। তারপর মিনমিনিয়ে বললেন, সত্যিই, মনে হচ্ছে–কথা শেষ না করে রেনর নেমে গেলেন।

রিচার্ড একবার ঘাড় ফিরিয়ে ঘৃণাভরে রেনরকে দেখল। তারপর নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জ্যাপকে লক্ষ্য করে রেনর বললেন–আমি কি একটু বাইরে যেতে পারি?

নিশ্চয়ই, যেতে পারেন, তবে বাড়ির বাইরে নয়, মনে রাখবেন।

জ্যাপকে ধন্যবাদ জানিয়ে এডওয়ার্ড রেনর ঘর থেকে বিদায় নিলেন।

বাইরে বেরোনোর দরজাটা হাট করে খোলা, অতএব ডঃ কারোলি সময় নষ্ট না করে টেবিল থেকে নিজের টুপি আর স্যুটকেস হাতে নিয়ে ওদিকে এগিয়ে গেলেন। পোয়ারোর দিকে নজর পড়ে গেল। তাচ্ছিলের হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। ইন্সপেক্টার জ্যাপ লক্ষ্য

করলেন সবই, দেখলেন, ডঃ কারোলি কেবল চোরের মতো বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে, অবশ্য, কারোলিকে টের পেতে দিলেন না।

ডঃ কারোলি বসার ঘর থেকে অদৃশ্য হলে জ্যাপ তার কনস্টেবল জনসনকে ডেকে জানতে চাইলেন–বাড়ির সদর দরজায় কোনো পাহারার ব্যবস্থা আছে কিনা।

জনসন জানাল–ওখানে সি আই ডি কনস্টেবল হারল্ড আছেন, স্যার। আপনি যেমনটি বলেছেন, তেমনভাবেই দাঁড়িয়ে আছে।

-তোমার মোবাইল ফোনে হারল্ডের সাথে যোগাযোগ করে ক্যারোলির চেহারার এক নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে বলল, ও যেন লোকটাকে অনুসরণ করে। লন্ডনে ট্রেন থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে ওকে যেন পাকড়াও করে ইয়ার্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হ্যাঁ, আর একটা কথা। লোকটা যেন পাকাল মাছের মতো হাত ফসকে পালিয়ে না যায়। সেদিকে সতর্ক থাকে যেন।

-স্যার, মুচকি হাসল জনসন, ওই লোকটার চেহারার সাথে হারল্ডের পরিচয় আছে। তবু বলছেন যখন, আমি বলে দিচ্ছি।

কথা শেষ করে কনস্টেবল জনসন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি জানিয়ে দিল সি আই ডি কনস্টেবল হারল্ডকে। তারপর ভেতর থেকে। দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিল।

বারবারা এতক্ষণ চুপ চাপ সব দেখছিল আর শুনছিল। ঘর ফাঁকা হতে সে উঠে দাঁড়াল। পোয়ারোর দিকে তাকাল, উপহার দিল একঝলক দুষ্ট হাসি। তারপর ক্যাপ্টেন হেস্টিংসকে পাকড়াও করল।

নাছোড়বান্দার মতো তাকে টানতে টানতে নিয়ে এল খোলা জানলার কাছে, হেস্টিংস অসহায় বোধ করলেন, পোয়ারোর দিকে তাকালেন। কিছু বলতে গেলেন বটে, কিন্তু বলা হল না। তার আগেই বারবারার আকর্ষণে তিনি তখন এসে পড়েছেন একেবারে বাগানে। পোয়ারো নীরবে সব কিছু দেখলেন, আর আপন মনে হাসতে থাকলেন।

এরপর কেটে গেল কিছুটা সময়।

রিচার্ড ঘরে এসে ঢুকল, না-ডাকতেই রিচার্ড যে আবার ফিরে এসেছে, একথা ভেবে জ্যাপ মনে মনে খুশি হলেন। পোয়ারোর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন–মাফ করবেন মি. অ্যামরি। খানিক আগে মি. রেনর কী বলেছেন শুনলেন তো। অতএব আমাদের সতর্ক হয়ে এগোতে হবে। আপনি বোধহয় কিছু বলতে চান। বলুন, স্বচ্ছন্দে বলে ফেলুন। তবে হ্যাঁ, পোয়ারোর সামনে আপনার স্বীকারোক্তি দিতে, আপত্তি থাকলে আমি শুনব না। আপনার বক্তব্যের একজন সাক্ষী চাই তো।

-বেশ, আমারও আপত্তি নেই, দুজনেই শুনুন। রিচার্ড কয়েক মুহূর্তের জন্য থামল। মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিল। তারপর বলল–সত্যিটা বলার সময় হয়েছে বুঝতে পারছি। তাই আমি নির্দ্বিধায় স্বীকার করছি যে, আমার বাবার খুনী আমি নিজে। আমিই আমার বাবা স্যার ক্লড অ্যামরিকে বিষ খাইয়ে খুন করেছি। আমিই খুনী, বিশ্বাস করুন।

–উঁহু, হল না। জ্যাপ মুচকি হাসলেন। আপনি যে মিথ্যে বলছেন, তা আপনার মুখ চোখ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। দেখুন, মি. পোয়ারোও হাসছেন। কেন অন্যের অপরাধ নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছেন কেন, মি. অ্যামরি? আপনার এই স্বীকারোক্তি আমরা গ্রাহ্য করছি না, দুঃখিত।

-কেন? রিচার্ড অবাক চোখে ওঁদের দিকে তাকাল–আমি যে মিথ্যে বলছি, তার বুঝলেন কী করে?

–আপনি কী ভেবেছেন, বলুন তো, জ্যাপের কণ্ঠস্বর কঠিন হল, আপনি যা বললেন, তা মেনে নিয়ে আপনাকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাব ভেবেছেন? মনে করছেন, এভাবেই সমস্যাটা মিটিয়ে দেবেন। কিন্তু আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, মশাই। আমি জানি, আপনাদের দাম্পত্য জীবন খুব বেশি দিন আগে শুরু হয়নি। সুন্দরী যুবতী স্ত্রী। জানি তাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। তাই বলে নিজেকে ফাঁসি কাঠে লটকে তাকে বাঁচানো। না, মশাই, এ হতে পারে না। আমি জানি, আমার কথাগুলো শুনতে আপনার ভালো লাগছে না। মনে মনে গালিগালাজও করছেন। তবুও না বলে পারছি না, একটা নোংরা খারাপ মেয়ের জন্য নিজের সুন্দর জীবনকে বলি দেবেন, মি. রিচার্ড অ্যামরি?

ইন্সপেক্টার জ্যাপ। রিচার্ড উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, সব কিছুরই একটা সীমা আছে জানবেন।

-মানছি, আর এও মানছি যে, কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারের মুখে নিজের স্ত্রীর নিন্দা শুনলে আপনার মতো স্বামীরা চটে যান। কী মাসিয়ে পোয়ারো, আমার এই বক্তব্যকে

আপনি নিশ্চয়ই সমর্থন করছেন। এখানে আমি কাজ করতে এসেছি। আসল অপরাধীকে পাকড়াও করে নিয়ে যাওয়াই আমার আসল উদ্দেশ্য। অপরাধী কে, জানতে পেরেছি। এমন কি তার নামও জানতে বাকি নেই। অতএব মি. রিচার্ড অ্যামরি, দুঃখিত, আপনাকে কোনোভাবে সাহায্য করতে পারছি না। যাই, ওদিকের খবরটা নিয়ে আসি, তারপর আসল হত্যাকারীকে ধরা যাবে।

কথা শেষ করে ইন্সপেক্টার জ্যাপ দরজায় প্রহরারত কনস্টেবলের দিকে তাকালেন। ইঙ্গিতে কী যেন নির্দেশ দিলেন। তারপর চলে গেলেন বসার ঘরের বাইরে।

রিচার্ড কাচুমাচু মুখে বসে রইল। কখন যে পোয়ারো জানলার ধার থেকে সোফায় এসে বসেছেন, খেয়াল করেনি। হঠাৎ ঘাড় ফেরাল রিচার্ড। দেখল, সিগারেট হাতে পোয়ারো বসে আছেন।

রিচার্ড এবার উঠে দাঁড়াল। ধীর পায়ে পোয়ারোর সামনে এসে দাঁড়াল, আকুতিভরা কণ্ঠে জানতে চাইল–মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি কি বলেন? ইন্সপেক্টার জ্যাপ যাকে অপরাধী বলে মনে করছেন, আপনার কি তাতে সায় আছে?

-মঁসিয়ে অ্যামরি, সত্যি করে বলুন তো, পোয়ারো সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন–আপনি আপনার স্ত্রীকে বিশ্বাস করেন না, জানি। এই সন্দেহ প্রবণতা কবে থেকে এল আপনার মনের মধ্যে।

–একদম বাজে কথা বলবেন না, মঁসিয়ে পোয়ারো। বোঝা গেল রিচার্ডের আসল জায়গায় আঘাত পড়েছে। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা পোয়ারোর দেশলাই বাক্সটা সে মুঠোর মধ্যে

চেপে ধরল উত্তেজনা দমনের চেষ্টায়। আমি আমার স্ত্রীকে বিশ্বাস করিনি। কখনো তার প্রতি আমার সন্দেহ জাগেনি।

–চিৎকার করে লাভ নেই, ঠাণ্ডা মাথায় ভাবুন, মঁসিয়ে অ্যামরি। যা সত্যি, দয়া করে তা বলে ফেলুন। আপনি যে আপনার স্ত্রীকে সন্দেহের চোখে দেখেন, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই, মঁসিয়ে অ্যামরি। আমি এখানে আসার আগে থেকেই সেটা শুরু হয়েছিল বুঝতে পেরেছি। কারণ এ বাড়ি থেকে আমাকে তাড়াবার জন্য আপনি মরিয়া হয়ে উঠতেন না। বলুন, আমি বেঠিক কিছু বলেছি? আমি এরকুল পোয়ারো, যার চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।

পোয়ারো রিচার্ডের দিকে সরাসরি তাকালেন, স্মিত হাসলেন। দেখা গেল দশাসই চেহারার রিচার্ড বাটকুল পোয়ারোর সামনে দয়া ভিক্ষা করার ভঙ্গিতে অসহায় মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

ফের সেই কথা। তবে আপনাকে জানিয়ে রাখি, আপনিও পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাবেন না। লুসিয়ার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, সেই একই অভিযোগে অভিযুক্ত করে পুলিশ আপনাকে আদালতে তুলতে পারে। কেন বলছি, শুনুন। আপনার বাবা বেঁচে থাকাকালীন আপনার প্রচুর টাকার দরকার হয়ে পড়েছিল, সেই টাকা জোগাড় করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। স্যার ক্লডের কফির কাপ আপনিই একবার হাতে নিয়েছিলেন, মনে পড়ে? মারাত্মক জীবন নাশক ওষুধগুলো নিয়ে আপনি নাড়াচাড়া করেছিলেন, ব্যাপারটা কারো দৃষ্টি এড়ায়নি। তবে হ্যাঁ, আপনার কাঁধে সব অভিযোগ চাপানোর জন্য একজনকে রেহাই দেওয়া যেতে পারে।

-ইন্সপেক্টার জ্যাপ এ ব্যাপারে আপনাকে সমর্থন করবেন না জানি।

-কী বললেন? জ্যাপ? পোয়ারো সামান্য হেসে বললেন, উনি অবিবেচক নন, এটা যেমন ঠিক, তেমনই উনি যে সেই মহিলা নন, যিনি নিজের স্বামীকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন এটাও তেমন বেঠিক।

পোয়ারোর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে রিচার্ড বোকার মতো তাকিয়ে রইল। পোয়ারো তা লক্ষ্য করে বললেন–আপনাকে বোঝানোর মধ্যে আমার খামতি রয়ে গেছে বুঝতে পারছি। এজন্য আমাকে একটা পুরোনো ঘটনার সাহায্য নিতে হচ্ছে। আশা করি, তখন আপনার মাথায় সবই ঢুকবে। এর সঙ্গে সাধারণ মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট সম্পর্ক আছে, বলে দিলাম।

পোয়ারো থামলেন। সিগারেটে ঘন ঘন টান দিলেন, ধোঁয়ার রিং করে বাতাসে ছেড়ে দিলেন। তারপ ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন–আমি সে রাতে এখানে এসে পৌঁছবার পর, আমায় দেখে আপনার পরিবারের সকলে খুব অস্বস্তিতে পড়েছিলেন। স্যার ক্লডের অস্বাভাবিক মৃত্যু ও ফর্মুলা চুরির ব্যাপারে আমি তদন্ত করি সেটাতে এ বাড়ির সকলের আপত্তি ছিল, এমনকি আপনিও। সেরাতেই আমাকে লন্ডনে ফিরে যাবার জন্য আপনি আমায় অনুরোধ করেছিলন, আশা করি ভুলে যাননি। কিন্তু আপনার স্ত্রী বাদ সাধলেন। তিনি একা আমার সঙ্গে কথা বললেন। তার প্রবল ইচ্ছের কথা জানালেন। তার আসল অপরাধীকে খুঁজে বের করার জন্য আমাকে একান্ত অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন। এবার প্রশ্ন হল, মাদাম লুসিয়া যদি সত্যিই অপরাধ করে থাকেন, তাহলে কেন আমাকে তদন্তের

কাজ চালিয়ে যেতে বলবেন, বলুন? ভেবে দেখেছেন কী? আপনি তো একজন সামরিক ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষিত মানুষ–তলিয়ে দেখুন, জবাব মিলে যাবে।

রিচার্ড খানিকক্ষণ কী যেন ভাবল, তারপর প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল–তাহলে আপনি বলতে চান.....

রিচার্ডকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে পোয়ারো বললেন–হ্যাঁ, আমি বলতে চাইছি, আর সময় নষ্ট করবেন না, মঁসিয়ে অ্যামরি। কাল ভোরে আপনি আপনার স্ত্রীর কাছে মাফ চাইবেন। আপনি আপনার আচরণের জন্য কতটা অনুতপ্ত তা তাকে বুঝিয়ে বলবেন। আপনি যে অহেতুক তাকে অপরাধী ভেবে অন্যায় করেছেন, তাও তার কাছে খুলে বলবেন।

-মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি তো আপনার উদ্দেশ্য কী, বুঝতে পারছি না।

–অত নাই-বা বুঝলেন। মঁসিয়ে, আমার ওপর ভরসা রাখুন। আমি আপনাদের শুভাকাঙ্খী। অতএব আপনাদের দুজনকে বাঁচানোর দায়িত্ব আমার। আমি এরকুল পোয়ারো বলছি। অতএব যেমনটি বলছি, তেমনটি করুন।

-বেশ, আপনার পরামর্শ মেনে নিলাম, কিন্তু আপনি কি অমার স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারবেন? রিচার্ডের অস্থির চিত্ত তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে।

-আপনাকে আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, মঁসিয়ে অ্যামরি। পোয়ারোর গলায় কঠিন সুর, তবে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা যে কত কঠিন কাজ, তা আগে বোধগম্য হয়নি। কিন্তু

সময় ক্রমশ সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে, যা কিছু করার এর মধ্যেই শেষ করতে হবে। কিন্তু তার আগে আমি যা বলব, তা পালন করতে হবে। বলুন, মঁসিয়ে পোয়ারো, শপথ নিন, যা বলব, তাই করবেন, কোনো প্রশ্ন করা চলবে না, কোনো ওজোর-আপত্তি শুনব না, ঠিক আছে?

-বেশ, শপথ নিলাম।

পোয়ারো বুঝলেন, রিচার্ড অনিচ্ছার সঙ্গেই কথাটা বলছে

এবার শুনুন, সিগারেটের শেষ অংশটা ফেলে দিয়ে পোয়ারো বললেন, মন দিয়ে শুনুন। কাজটা আপনারা করে ফেলতে পারবেন, আমি জানি। জ্যাপের কথার সুর শুনে বুঝতে পেরেছি, উনি সহজে আপনাদের ছেড়ে দেবেন না, নাচিয়ে ছাড়বেন। আজকালের মধ্যেই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দারা এখানে এসে পড়বে। কেবল ওপর-ওপর তল্লাসী চালিয়ে ওরা ক্ষান্ত হবেন না, সারা বাড়ি তোলপাড় করে ছাড়বেন। ওদের শ্যেন দৃষ্টির হাত থেকে ঘুপচি-ঘাপচিও বাদ যাবে না। আসলে কী জানেন, পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে আমিও তো একসময় চাকরি করেছি, অভিজ্ঞতা কম হয়নি। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, ওদের দৌরাত্মে আপনাদের তিষ্ঠোনো দায় হয়ে দাঁড়াবে। তাই বলছি, এখান থেকে আপনারা অন্য কোথাও চলে যান কয়েক দিনের জন্য, এ আমার অনুরোধ।

–কিন্তু এ বাড়ির দায়িত্ব কার ওপর দিয়ে যাব? পুলিশের ওপর?

রিচার্ডের প্রশ্নের জবাবে পোয়ারো বললেন আপনারা কি এই অঞ্চল ছেড়ে অনেক দুরে কোথাও চলে যাবেন? এখানকারই কোনো হোটেলে ঘর ভাড়া নেবেন। সেখানেই

কয়েকদিন থাকবেন। ফলে পুলিশ এবং বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হবে না। কোনো জিজ্ঞাসাবাদ থাকলে সহজেই যোগাযোগ করা সম্ভব হবে।

-স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দারা কবে আসবে? এ সম্পর্কে আপনার কি কোনো ধারণা আছে?

-যে কোনো দিন, যেকোনো সময়। আগামীকাল দিনের বেলাতেই যদি ওদের আগমন ঘটে, সেটা অপ্রত্যাশিত হবে না।

ব্যাপারটা কি সকলে সহজভাবে মেনে নেবে?

–আপনি নিশ্চয়ই তাই ভাবছেন। না, কেউ এটাকে বিশ্রী ব্যাপার ভেবে মাথা ঘামাবে না। বরং আপনি এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাবেন। বাড়ির লোকেদের চোখের সন্দেহপূর্ণ চাউনি, চাপাগলায় সমালোচনা, সারা বাড়িময় ফিসফিসানি আর গুজগুজানি, আপনাকে জ্বালিয়ে মারবে। তখন তুচ্ছ কারণেও অনর্থ বেঁধে যাবে। তার চেয়ে, আমার পরামর্শ মেনে নিন, বাড়ির বাইরে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসুন।

–তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু ইন্সপেক্টর জ্যাপ, উনি কি সহজে। আমাদের ছেড়ে দেবেন? রিচার্ডের গলায় অবিশ্বাসের সুর। তাছাড়া বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেও কতখানি লাভ হবে, বুঝতে পারছি না।

–হুঁ, আমিও বুঝতে পারছি, অত সহজে ব্যাপারটা আপনার মাথায় ঢুকবে না। পোয়ারো বুঝি আত্মতৃপ্তি লাভ করলেন। বললেন, আপনি এক কাজ করুন, আপনার যা দেখার বা

বোঝার, সব আমার ওপর সম্পূর্ণ ভাবে ছেড়ে দিন, আমি এরকুলো পোয়ারো, আমি সে দায়িত্ব নিলাম। আপনি কেবল, আমার কথা মতো কাজ শুরু করে দিন।

পোয়ারো উঠে দাঁড়ালেন রিচার্ডের কাঁধে হাত রাখলেন–যান, আর দেরি নয়, নিজের ঘরে গিয়ে গোছগাছ সেরে নিন। মনে মনে ভাববেন, কিছু দিনের জন্য বাইরে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন। রিচার্ডের কাঁধে ছোট্ট চাপড় মেরে পোয়ারো আবার বললেন জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার কাজটা নিজে পেরে না উঠলে, রেনর তো আছেন, তাকে লাগিয়ে দেবেন। যান, যান, সময় অযথা নষ্ট না করে ঝাঁপিয়ে পড়ুন কাজে। আসুন, আপনাকে দরজা পর্যন্ত এগিয় দিই।

রিচার্ডকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে পোয়ারো তাকে, দরজার সামনে নিয়ে এলেন। রিচার্ড বুঝি মূক হয়ে গেছে, কেবল তার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দুটি চোখ একবার পোয়ারোকে দেখল, তারপর ঘুরে গেল ওপরে যাবার সিঁড়িপথের দিকে।

-বাপরে বাপ! কী ঠ্যাটা! ইংরেজ জাতটাই এমন। পোয়ারো মনে মনে আক্ষেপ করলেন। এবার এগিয়ে এলেন খোলা জানলার কাছে। বাইরের দিকে দৃষ্টি মেলে দিলেন, কাউকে দেখতে পেলেন না, দেখা সম্ভবও নয়। ঝোপঝাড় লক্ষ্য করে পোয়ারো জোর গলায় হাঁক দিলেন মাদমোয়াজেল বারবারা, আপনি কোথায়? আমার বন্ধুটিকে কোথায় সরালেন? কম তো সময় নিলেন না, এবার সামনে আসুন, আপনার শ্রীমুখ দর্শন করি।

–ওফ, বুড়োটা গলা ফাটিয়ে কেমন চিল্লাচ্ছে দেখ। একটা বড় ঝোঁপের তলা থেকে বারবারা বেরিয়ে এল। খেঁকিয়ে জানতে চাইল, কী হল? অত হাঁকডাক কেন শুনি?

আপনার বন্ধুকে নিয়ে আমি পালিয়ে গেছি? একটু গল্প করছি, সেটাও অসহ্য লাগছে। আপনাদের যা জবাবদিহির পালা চলল, মাথা গরম হয়ে উঠেছিল। তাই খোলামেলাতে এসে দুজনে বসেছি, গল্প করছি। এতে আপনার আপত্তি কীসের?

–আমায় ভুল বুঝবেন না মাদাম, পোয়ারো মনে মনে একচোট হেসে নিলেন, বললেন, দুঃখিত। বাধ্য হয়ে এভাবে আপনাকে বিরক্ত করছি। গল্প করবেন বলে যাকে টানতে টানতে বাগানে নিয়ে গেলেন, তিনি যে আমার সহকারী, তা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি। আমাকে সাহায্য করার জন্যই ক্যাপ্টেন হেস্টিংসকে আমি সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এসেছি। এবার দয়া করে অল্পক্ষণের জন্য তাকে ছেড়ে দিন, মাদমোয়াজেল, বড্ড উপকার হয়, কথা দিচ্ছি, কাজ সেরেই ও ফিরে যাবে আপনার কাছে।

-ও, মতলবটা বুঝলাম। তা আমার বন্ধুটিকে কেড়ে না-নিলে আপনার মন ভরছেনা, তাই না? নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল বারবারা।

-ভুল বললেন, কেড়ে নিচ্ছিনা। কয়েকটা দরকারী কথা আছে। তারপরেই ওঁকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।

–বেশ, আপনি যেমনটি চাইছেন মঁসিয়ে পোয়ারো। কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বড় বড় পা ফেলে বারবারা ঝোঁপের কাছে ফিরে এল। ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর দিকে তাকিয়ে দুষ্টু হাসি হেসে উঠল। বলল যাও বন্ধু, তোমার তলব পড়েছে। উনি কথা দিয়েছেন, আবার তোমাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন।

–অসংখ্য ধন্যবাদ, মাদমোয়াজেল। ঝোঁপের আড়াল থেকে বেরিয়ে হেস্টিংস জানলার দিকে তাকালেন। পোয়ারোকে হাত ইশারা করলেন। একটু বাদেই খোলা জানলা ডিঙিয়ে তিনি পোয়ারোর সামনে এসে দাঁড়ালেন লাজুক মুখে।

আবার, চাপাগলায় ধমকে উঠলেন পোয়ারো, তোমায় একটা কাজের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, ভাবলাম এই অবসরে মাথাটা অন্য ব্যাপারে লাগাব। কিন্তু তুমি দেখছি, সে দায়িত্ব পালন না করে রিচার্ড অ্যামরির খুড়তুতো বোনের সঙ্গে বাগানে গল্প করতে বসে গেছো?

সত্যি বলছি বন্ধু, তোমার এই পরিবর্তন দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।

-বাঃ, বেশ তো বকাঝকা করছ, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস পাল্টা জবাব দিলেন, মেয়েটা যখন টানতে টানতে আমায় নিয়ে গেল, তুমি তো সামনেই ছিলে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে, অথচ মানা করলে না। পেছন থেকে টেনেও তো ধরতে পারতে। করোনি। আসলে তুমিও বেশ মজা পাচ্ছিলে।

থাক থাক, আর আমায় বুঝিয়ে কাজ নেই। পোয়ারো এবার গলার স্বর নামিয়ে বললেন তোমাকে কেন আমি গাল দিচ্ছি জানো। তোমার-আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কারোলি নাকি এঘরে ঢুকেছিল। শুধু তাই নয়, রেনরও। ওরা টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে কীসব কথাবার্তা বলছিল। জ্যাপের মুখে কারোলির আসল পরিচয় শুনেছ নিশ্চয়ই। ভাবছি, আমাদের দেখতে না পেয়ে কারোলি কোনো প্রমাণ নষ্ট করে দিয়েছে কিনা কে জানে।

-মাফ করো, বন্ধু। হেস্টিংস আন্তরিকতার সুরে বললেন–এদিকের কথা কী করে যে ভুলে গেলাম, জানি না। বিশ্বাস করো, অতশত মাথায় আসেনি।

যদি কারোলি কোনো ক্ষতি না করে থাকেন, তাহলে জানবে আমার কপালের জোরেই হয়েছে। কিন্তু ভায়া, আর তো বসে থাকার সময় নেই। ভেতর ভেতরে একটা তাগিদ বোধ করছি। বুদ্ধি খাঁটিয়ে আমাদের পা বাড়াতে হবে, বুঝেছ হেস্টিংস।

বন্ধুর গাল টিপে পোয়ারো সোহাগ দেখালেন।

-বেশ, চলো, আমি তৈরি, কাজ শুরু করা যাক।

দাঁড়াও, এক্ষুনি নয়। সাবধানী কণ্ঠে পোয়ারো বললেন আমি যে কাজের কথা বলছি, তার সাথে এতদিন যেসব রহস্য সমাধান করেছি, তার সঙ্গে কোনো মিল নেই। বলা যেতে পারে এই রহস্য গোড়া থেকেই দুর্বোধ্য, তাই অত্যন্ত খারাপ।

পোয়ারো চোখ মেলে ছিলেন খোলা জানলা দিয়ে বাগানের দিকে। দেখো, সন্ধ্যা ও রাতের সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে সময়, অন্ধকার চারপাশ। ঠিক গত সন্ধ্যের মতো। আঁধারের কালো কালিমালিপ্ত এই বাড়ি আর তখনই

পোয়ারো চুপ করলেন, সামান্য সময় নিলেন। পরক্ষণে বলতে শুরু করলেন–হ্যাঁ, এই জমাট বাঁধা অন্ধকারই আমাদের আলোর দেশে পৌঁছোতে সাহায্য করবে। হ্যাঁ, হেস্টিংস, এই পথ ধরেই আমরা সফলতার শীর্ষে পৌঁছোতে পারব।

-কী সব হেঁয়ালি করছ বলল তো, হেস্টিংস বললেন, যা বলতে চাইছ বুঝিয়ে বলল, বাপু!

–পোয়ারোর কণ্ঠস্বর হঠাৎ গম্ভীর হল–আচ্ছা বলতে পারো স্যার ক্লড অ্যামরির মৃত্যু হল কীভাবে?

এ কি নতুন কথা। স্যার ক্লড কেন মারা গেলেন, তা কারো অজানা নেই। ওঁর শরীর কাটাছেঁড়া করে পোস্টমর্টের রিপোর্টে বলা হয়েছে মারাত্মক বিষ মেশানো কফিতে ওঁর মৃত্যু হয়েছে, মানে কেউ বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল।

তাতে কারো সন্দেহ নেই, পোয়ারোর বুঝি ধৈর্য্য ধরছে না। কিন্তু বলতে পারো, এর কারণ কী? কেন বিষ খাইয়ে খুন করা হল?

সম্ভবত, কথা শেষ না করে মুখ বুঝলেন হেস্টিংস, পোয়ারোর দিকে তাকালেন, ফর্মুলা চোরের মনে কোনো সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল, এমনটিও হতে পারে–হেস্টিংস আবার নীরব হলেন।

সহকারীর ব্যাখ্যা শুনে পোয়ারো বুঝি খুশি হলেন, তার ঘাড় নাড়া দেখেই হেস্টিংসের বুঝতে দেরি হল না।

-কিন্তু হেস্টিংস, পোয়ারো প্রশ্ন করলেন, যদি তোমার ধারণার উল্টোটা হয়ে থাকে, মানে ফর্মুলা চোরের মনে কোনো সন্দেহ দেখা দেয়নি। এবার তুমি কী বলবে?

–সত্যি কথা বলছি, ভায়া, ক্লান্ত স্বরে হেস্টিংস বললেন, আমার বুদ্ধি-সুদ্ধি সব গোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

পোয়ারো এগিয়ে এলেন, গলা খাঁকানি দিলেন। তারপর বললেন–আচ্ছা বেশ, মগজ খাটাতে হবে না। যা বলছি, শোনো। গত সন্ধ্যায় যেসব ঘটনা ঘটেছিল, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। আমি একের পর এক বলে যাচ্ছি, ভুল হলে ধরিয়ে দিও, কেমন!

ক্যাপ্টেন হেস্টিংস কোনো সাড়া না দিয়ে চেয়ারের ওপর ক্লান্ত শরীরটাকে বসিয়ে দিলেন।

পোয়ারো শুরু করলেন–মারা যাবার খানিক আগে স্যার ক্লড অ্যামরি তার স্টাডি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, বসেছিলেন এই আর্মচেয়ারে, ঘরের একমাত্র আরামকেদারাটিতে নিজে বসলেন। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল নীরবতার মধ্যে, বোঝা গেল পোয়ারো এখন স্মৃতির সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন–হ্যাঁ, শেষবারের মতো এবং এই চেয়ারে বসেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন, তাও ঠিক। তার কয়েক মিনিট পরে পরিবারের সদস্যরা ডিনার সেরে এই ঘরে এসে হাজির হয়েছিলেন, এমনকি ডঃ কারোলিও। স্যার ক্লডের অচেতন দেহটা উনিই প্রথম পরীক্ষা করেছিলেন এবং বলেছিলেন উনি মারা গেছেন, হার্ট অ্যাটাকই এর কারণ। এ ব্যাপারে ডঃ কারোলি নিশ্চিত। এর পরে আসেন অ্যামরি পরিবারের চিকিৎসক। দ্বিতীয়বার স্যার ক্লডকে পরীক্ষা করে ডঃ গ্রাহাম জানিয়ে ছিলেন, ওনার হার্ট অত্যন্ত ভালো ছিল। তাঁর কথায়, হার্টফেল নয়, অন্য কোনো কারণ। সেটা কী? উনি খুঁজে না পাওয়ায় ডেথ সার্টিফিকেট দিতে রাজি হননি। তিনিই করোনারের কাছে আবেদন করে স্যার ক্লডের মৃতদেহ পোস্টমর্টেমে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।

মর্গে ডাক্তাররা মৃতদেহের পেট চেরাই করে কফির নমুনা সংগ্রহ করেন। তা ল্যাবোরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়, দেখা যায় ওই কফির সঙ্গে হিসকোসিন হাইড্রোব্রোমাইড নামক মারাত্মক বিষ মিশে আছে। অর্থাৎ স্যার ক্লডকে কফির সঙ্গে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে এমনটিই উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাটি একটি খুনের মামলায় পরিণত হল। সম্ভবত স্যার ক্লড অ্যামরির শবদেহ সৎকারের কাজটি দু-একদিনের মধ্যে হয়ে যাবে। তারপরেই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে গোয়েন্দারা আসবেন। এবাড়ির প্রতিটি কোণ খুঁজে বেড়াবেন। খানাতল্লাশি চালিয়ে স্যার ক্লডের ব্যক্তিগত কাগজপত্র, ডায়েরি যেখানে যা পাবেন সব নিজেদের জিম্মায় নিয়ে নেবেন। এমনকি তার শেষ উইলটিও বাজেয়াপ্ত হবে। সমস্ত কাগজপত্রের প্রত্যেকটা তারা শ্যেন দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবেন। অবশেষে তাঁরা একটি সিদ্ধান্তে আসবেন। পোয়ারো আড়চোখে তাকালেন সহকারীর দিকে বলো তো, সেটা কী? আন্দাজ করো।

হেস্টিংস চুপ। পোয়ারো আবার বলতে শুরু করলেন–সিদ্ধান্ত হল এই যে, স্যার ক্লড যে ফর্মুলা তৈরি করেছেন বলে চারদিকে চাউর হয়ে গেছে, কোনো এক রাষ্ট্রের টাকার গোলাম হয়ে ডঃ কারোলির মতো জঘন্য অপরাধী যা চুরি করতে এখানে এসে জুটেছিলেন, সেই মহামূল্যবান ফর্মুলার নোটগুলো এখনও অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই রয়েছে অর্থাৎ পুরোপুরি কাজ শেষ হয়নি। এই সম্ভাবনাকে ধরে নিয়ে একটা প্রশ্ন জোরালো ভাবে দেখা দেবে, তা হল স্যার ক্লড ফর্মুলা তৈরির কাজ আদৌ শেষ করতে পেরেছিলেন কিনা! চোরের মস্ত এক সুবিধা হবে। সেটা কী?

পোয়ারো থামলেন, ঝেকে আক্রান্ত, আপনমনে বলে চললেন–সেটা হল নিরাপত্তা। ফর্মুলা চোর নিজেকে নিরাপদ ভাববে। সন্দেহভরা চোখ তার দিকে আর তাকাবে না। সে এবার

নিশ্চিন্তে তার বাকি কাজটুকু গুছিয়ে নেবে। অসম্পূর্ণ হলেও স্যার ক্লডের স্টাডির সিন্দুক থেকে ফর্মুলা চুরি করে সেটা জুতসই জায়গায় লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করবে। যে জায়গার দিকে কেউ কোনোদিন ফিরে তাকায় না, খোঁজার প্রশ্নই ওঠে না। এবার চোর বামাল সমেত পালাবার জন্য সুযোগ খুঁজবে। সকলের চোখে ধুলো দিয়ে চো চো দৌড়, সোজা গিয়ে হাজির হবে তাদের কাছে, যাদের কাছ থেকে সে টাকা খেয়েছে। এইভাবে এই মূল্যবান ফর্মুলা চলে যাবে অন্য এক হাতে। তার গ্যাড়াকলের কলটা যে এভাবে নড়বড়ে হয়ে যাবে, বাছাধন তা কল্পনাও করতে পারিনি।

পোয়ারো পিঠ টান করলেন, মনের ভেতর জড়ো করা ভাবনাগুলোকে ঝালিয়ে নেবার জন্য তৈরি হলেন। বেশ জোরালো গলায় বললেন–এপর্যন্ত যা যা ঘটেছে তার পুনরাবৃত্তি করছি, মন দিয়ে শোনো। সেদিন ওই সময় ঘটনাক্রমে স্যার ক্লড তাঁর স্টাডিতে ঢুকেছিলেন। সিন্দুকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তার মনে কেমন খটকা হল। তিনি সিন্দুক খুললেন। দেখলেন কয়েকদিন আগে পুরে রাখা ফর্মুলা সমেত খামটা নেই। তার মানে কে হাতিয়ে নিয়েছে। স্যার ক্লডের ধারণা, যে ফর্মুলা চুরি করেছে, সে এই বাড়ি ছেড়ে এখনও বেরোতে পারেনি, তিনি সকলকে শুনিয়ে কথাও বলেছিলেন যে, এই ঘরটা হল ইঁদুর ধরা ফাঁদ, ফর্মুলা চোর অন্যন্যদের সঙ্গে সেই ফাঁদেই আটকে আছে। এসব কথা অবশ্য তাঁর মুখ থেকে আমি শুনিনি। জেনেছি বাড়ির সদস্যদের কাছ থেকে। সত্যি ভায়া এই বসার ঘরটা ইঁদুর ধরার একটা ফাঁদ, মোক্ষম তুলনা। এমনকি তার খুনি সেই ফর্মুলা চোর এমন কিছু জানতো, যা স্যার ক্লডের কল্পনার বাইরে ছিল। ফর্মুলা চোর পুরুষ অথবা মহিলা, যে কেউ হতে পারে। এবার তার একটাই কাজ–ফর্মুলাটাকে সকলের চোখের আড়ালে লুকিয়ে রাখা। কিন্তু তা সম্ভব কী ভাবে? সার ক্লড যখন বললেন, সমস্ত আলো নিভিয়ে বসার ঘরকে অন্ধকার করে দেওয়া হবে, চোর যেন

ফর্মুলাটা ফিরিয়ে দেয়। ফর্মুলা চোর ঠিক করল, এই সুযোগটাই গ্রহণ করবে। আঁধারের মধ্যে এমন কোনো জায়গায় ওটা লুকিয়ে রাখবে যা কেউ খুঁজে পাবে না।

পোয়ারো তাকালেন তার সহকারীর দিকে হেস্টিংস, মিস ক্যারোলিন যেমন চোখ বুজে জবাব দিয়েছিলেন, তুমিও তেমনই চোখ বোজো। আমিও বন্ধ করলাম আমার চোখ। ঠিক আছে? এবার কী দেখছ? কিছু না, তাই তো, কেবল চাপ-চাপ অন্ধকার ছাড়া কিছুই নয়। গতরাতের মতো এই মুহূর্তেও নিভে গেছে ঘরের প্রতিটি আলো। আমাদের চোখ বন্ধ, কিন্তু কান খোলা। মিস ক্যারোলিন আমার প্রশ্নের জবাবে যেসব অওয়াজের বর্ণনা দিয়েছিলেন, মনে আছে নিশ্চয়ই, সেগুলো ফের তুমি আমায় শোনাও, কোনোটা বাদ যেন না পড়ে।

ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর দুটি চোখের পাতা একটির সঙ্গে আর একটি লেপটে আছে। তিনি তখন গভীরভাবে চিন্তা করছেন। তারপর কেটে কেটে জবাব দিলেন–হাঁফানোর আওয়াজ শোনা গেল, কেউ বুঝি হাঁফাচ্ছে।

-বাঃ, দারুণ বলেছ। এরপর? দ্বিতীয় শব্দটা কীসের ছিল?

হেস্টিংস আবার চুপ। পরক্ষণে মাথা নেড়ে বললেন হা, চেয়ার উল্টে পড়ার শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে একটা ধাতব আওয়াজ। মেঝেতে ছোট জিনিসটা ছিটকে পড়েছে বুঝি। আওয়াজটা মেঝেতে চাবি পড়ার আওয়াজের মতোই।

ঠিকই বলেছ, ওটা চাবিরই আওয়াজ ছিল। মিস ক্যারোলিন আর কোন শব্দের কথা বলেছিলেন, বলো।

-এরপর একটা আর্তনাদ শোনা গেল, পরে জানতে পেরেছি, ওটা লুসিয়ার আর্তনাদ, শ্বশুর স্যার ক্লডকে কী যেন বলতে চেয়েছিল। তারপর টোকার আওয়াজ, দরজার বাইরে থেকে। দুঃখিত! প্রথম দিকে মিস ক্যারোলিন ঘরের ভেতর কাপড় ছেঁড়ার আওয়াজ পেয়েছিলেন, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, বুঝি রেশমি কাপড় কেউ ছিঁড়ছে, অবিকল তেমনই আওয়াজ।

হেসিটংস-এর বলা শেষ, তিনি চোখ খুললেন।

পোয়ারো খুশি– হ্যাঁ, নির্ভুলভাবেই বলেছ, কথা শেষ করে তিনি পায়ে পায়ে ডেস্কের গা ঘেঁষে ফায়ারপ্লেসের একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালেন। বিড়বিড়িয়ে বললেন–ওই যে কয়েক মিনিটের আঁধার স্যার ক্লড মারা যাবার আগে তৈরি করেছিলেন, আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি হেস্টিংস, ওই ছোট্ট সময়টুকুর মধ্যেই ফর্মুলা চুরি রহস্যের সমাধানের পথ লুকিয়ে আছে। তবু ঘরের ভেতর আর যাঁরা ছিলেন তারা কিছুই শুনতে পাননি।

হেস্টিংস ঘুরে তাকালেন পোয়ারোর দিকে। দেখলেন, আগুন ধরানোর সুবিধার জন্য কাগজের কুচি আর মোমের খণ্ড খুঁজে রাখা যে বড় ফুলদানিটা ম্যান্টলপিসের ওপর দাঁড় করানো ছিল, সেটা কাত হয়ে একপাশে পড়ে আছে দেখে পোয়ারো যত্নে সেটাকে আগের জায়গায় দাঁড় করিয়েছিলেন।

–ওহ্, তোমার স্বভাব একটুও পাল্টাল না, বন্ধু। হেসিটংস-এর গলায় ভর্ৎসনার সুর।– থাকনা ওটা যেখানে খুশি পড়ে, সামান্য একটা জিনিস, তা নিয়েও মাথা ঘামানোর কী আছে যে বুঝি না। শুধু

হেস্টিংসের কথাগুলো থেমে গেল, পোয়ারোর অস্বাভাবিক তীব্র চাউনি তাকে ভীত করল।

-সামান্য, তাই না? পোয়ারো তাকালেন ফুলদানিটার দিকে, পলকহীন দৃষ্টি, বলে চললেন–আমার খুব ভালোভাবেই মনে আছে, এখানে একটা আওয়াজ হচ্ছিল, প্রায় এক ঘণ্টা আগে, শুনে মনে হয়েছিল, এই ফুলদানির ভেতরের দোমড়ানো কাগজের কুচিগুলো কেউ যেন মুচড়ে সোজা করছে। তাতে ওদের যা হাল হয়েছে তা দেখে মনে হচ্ছে ওগুলো ধরে ধরে দুমড়ে মুচড়ে আবার আগের মতো টান টান করে দিই। পোয়ারোর কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা গেল, তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।–আচ্ছা, বলোত, এ কাজটা করার ইচ্ছা আমার হল কেন?

-কেন আবার! কাগজগুলো দুমড়ে মুচড়ে আছে, তাই। হেস্টিংস কণ্ঠে সামান্য বিরক্তি ফুটিয়ে বললেন, তোমার যা পিটপিটানি স্বভাব, সব কিছু ঝকঝকে তকতকে না দেখলে চোখে ভালো লাগে না–এটা তারই একটা ছোট্ট উদাহরণ। রেশমি কাপড় ঘেঁড়ার আওয়াজ, না? উল্লাসে ফেটে পড়লেন পোয়ারো। ওটা আসলে কাগজ কুচানোর আওয়াজ। অন্ধকার ঘরে সে রাতে কাগজ ছেঁড়া হয়েছিল, রেশমি কাপড় নয়, অবশ্য দুটো আওয়াজ হুবহু একরকম। কাগজ কুচিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিনি ম্যান্টলপিস থেকে ফুলদানিটা তুলে নিলেন হেস্টিংস, আবার বলছি, সে রাতে অন্ধকারের মধ্যে মিস ক্যারোলিন অ্যামরি কাগজ ছেঁড়ার আওয়াজই শুনেছিলেন, কাপড় নয়।

পোয়ারো ধীরে ধীরে ম্যান্টলপিসের কাছ থেকে সরে এলেন।

হেস্টিংস আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না, চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে এসে দাঁড়ালেন পোয়ারোর সামনে কী ব্যাপার? তুমি হঠাৎ সামনে–কী ব্যাপার? তুমি হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়ে পড়লে কেন? ওই ফুলদানির মধ্যে কী রহস্য লুকিয়ে আছে?

পোয়ারো নীরবে ফুলদানিটা হাতে নিয়ে সোফার কাছে চলে এলেন, ফুলদানি উপুড় করে দিলেন। যত কাগজের কুচি ছিল, সব টেনে সোফার ওপর ছড়িয়ে দিলেন। এবার প্রত্যেকটা কাগজের টুকরো টান টান করলেন। তারপর তার মধ্যে থেকে বেছে বেছে তুলে হেস্টিংস-এর হাতে দিতে দিতে বললেন–ধরো, এই নাও আর একটা, হ্যাঁ এই যে আর একটা.....

হেস্টিংস অবাক হয়ে মেলে ধরা কাগজগুলোর দিকে নজর দিলেন, সংক্ষেপে কিছু লেখা সাংকেতিক ভাষা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন। উচ্চারণ করলেন–সি-১৯, এন-২৩, এইচ-২........... এগুলো কী?

এখনও বুঝলে না? পোয়ারো জোর গলায় বলে উঠলেন–এগুলো স্যার ক্লডের হারিয়ে যাওয়া ফর্মুলার কাগজের টুকরো।

সাবাস পোয়ারো, খুশির দাপটে হেস্টিংস প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন।

–আরে কী করছ! সামলে, দেওয়ালেরও যে কান আছে, ভুলে গেলে? যাক, শেষ পর্যন্ত হদিস মিলল, খানিকটা হাল্কা হলাম এবার কেবল......... হেস্টিংস, দাঁড়িয়ে না থেকে কাগজগুলোকে চটপট যেমন দোমড়ানো মোচড়ানো ছিল, তেমনটি করে ফেলল। তাড়াতাড়ি ফুলদানির মধ্যে ভরে আগের জায়গায় রেখে এসো।

পোয়ারোর নির্দেশ মতো হেস্টিংস কাজ শুরু করলেন।

-আঃ হেস্টিংস, কী হচ্ছে? অত ঢিলেঢালা হলে চলবে না। হাত চালাও, হাত চালাও। আসলে তোমার মনটা যে এখন এদিকে নেই, বুঝতে পারছি, ফিক করে হেসে ঘাড় ঘুরিয়ে বাগানের বাইরেটা দেখিয়ে দিলেন কিছুই অজানা নেই, বন্ধু।

এবার বন্ধুর সাথে পোয়ারোও হাত লাগালেন। দুজনে মিলে ঝটপট সমস্ত কুচানো কাগজ ফুলদানির মধ্যে ভরে ফেললেন। সেটাকে এবার ম্যান্টেলপিসের ওপর রাখলেন, অবশ্য দাঁড় করিয়ে নয়, কাত করে, যেমনটি ছিল আর কী!

হলো একটা বড়ো কাজ! পোয়ারো হাঁফ ছাড়লেন, এবার বলো তো, ওখানে কী রেখে এলাম?

–কী আবার, কুচানো কাগজ আর মোমের টুকরো। তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন হেস্টিংস।

উঁহু, হলো না, পোয়ারো সামান্য হাসলেন, খানিকটা পনির, বুঝলে, পনির রেখে এলাম।

–মানে!

–হ্যাঁ, বন্ধু, কেবল পনির।

-কী সব অবোল-তাবোল বকছ, হেস্টিংস অবাক হলেন, তোমার মাথা বিগড়ে গেল নাকি?

পোয়ারো এসব ব্যঙ্গ বিদ্রুপে কান না দিয়ে নিজের মনে বলে চললেন, পনির আমরা খাই, এছাড়া গৃহস্থের আর কোন কাজে লাগে, জানো? একটু থামলেন, ইঁদুর ধরার কাজে। ইঁদুর ধরার ফলে সামান্য পৰির রেখে দিলেই হল, লোভে লোভে ইঁদুর এসে ঢুকবে ওই কলে, তখনই কলে টান, ব্যাল বন্ধ, বেরোবার পথ নেই। আমিও তেমনই ফাঁদ পেতেছি, অবশ্য পনির নয়, খাদ্য ওই কাগজ কুচানো। এবার আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না ইঁদুর বাবাজী আসছে ততক্ষণ চুপ করে থাকতে হবে।

কিন্তু ইঁদুর কখন আসবে, তা জানো?

-জানি বৈকি, পনিররূপী ওই কাগজছেঁড়া খেতে তাকে আসতেই হবে, পোয়ারো বললেন, তাকে আসার জন্য খবর পাঠিয়েছি, সবুর করতে হবে না তোমায়। ওই এল বুঝি!

ঠিক এসময় বসার ঘরের দরজা বাইরে থেকে খুলে গেল। ভেতরে পা রাখল এডওয়ার্ড রেনর।

-আশ্চর্য, আপনারা এখানে বসে আছেন মঁসিয়ে পোয়ারো। দিব্যি গল্পগুজব করছেন, আর ইন্সপেক্টার জ্যাপ আপনাদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন। উনি ওপরে আছেন, আমাকে পাঠালেন। চলুন, এক্ষুনি ডাকছেন।

এডওয়ার্ড রেনর চিৎকার করে কথাগুলো বলল।

.

১৪.

-ইস, কী বিশ্রী ব্যাপার বলুন তো, পোয়ারো মোলায়েম সুরে বলতে থাকলেন, ইন্সপেক্টার জ্যাপ আমাদের জন্য সারা বাড়ি তোলপাড় করছেন, আর আমরা কিনা...... চলুন, যাচ্ছি।

ওঁরা তিনজনে দরজার কাছে এলেন। হঠাৎ পোয়ারো ঘাড় ঘুরিয়ে রেনরের কাছে জানতে চাইলেন–ডঃ কারোলির সঙ্গে আজ সকালে কি আপনার দেখা হয়েছে?

নিশ্চয়ই, দেখা হয়েছে, রেনর খুশি মনে জবাব দিলেন–এখানেই ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। উনি টেলিফোন করতে এ ঘরে এসেছিলেন।

–আচ্ছা মি. রেনর, ডঃ কারোলি কি তখন টেলিফোনে কথা বলছিলেন, মানে আমি বলতে চাইছি, ওনাকে ফোন করতে আপনি দেখেছেন কিনা?

-না, মঁসিয়ে পোয়ারো, কী যেন রেনর ভাবলেন, ওনাকে স্যার ক্লডের স্টাডিতে ঢুকতে দেখেছিলাম। আমাকে এঘরে আসতে দেখে উনি বেরিয়ে এসেছিলেন।

কথা বলতে বলতে রেনর ফায়ারপ্লেসের ধারে এসে দাঁড়ালেন।

পোয়ারো প্রশ্ন করলেন–আপনি ওই সময় এঘরের কোন অবস্থানে ছিলেন?

–আমি? এখানে, যেখানে এখন দেখছেন, সেখানেই আমার অবস্থান ছিল।

–টেলিফোনে ডঃ কারোলির কোনো কথা শুনতে পেয়েছিলেন কি?

–না, ঘাড় নাড়লেন রেনর। উনি যে আমার সামনে কথা বলতে চান না, সেটা বুঝেই আমি সরে এসে এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

-বুঝলাম। কী মনে করে পোয়ারো পকেট থেকে তার ছোট্ট নোট বই আর পেন্সিল বের করলেন। খসখস করে কী সব লিখলেন। উপস্থিত দু'জনের দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিলেন। পাতাটা ছিঁড়ে ভাঁজ করে হেস্টিংস-এর হাতে দিলেন, বললেন হেস্টিংস, তুমি এটা নিয়ে ইন্সপেক্টার জ্যাপের হাতে দাও। তাকে বলল, আমি না যাওয়া পর্যন্ত যেন ঠাণ্ডা হয়ে থাকেন। খানিক বাদেই আমি যাচ্ছি।

পোয়ারোর নির্দেশ মাথায় করে ভাঁজ করা কাগজটা হাতে নিয়ে ক্যাপ্টেন হেস্টিংস ঘর থেকে বিদায় নিলেন।

রেনর কৌতূহল আর চেপে রাখতে না পেরে জানতে চাইলেন–কাগজে কী লিখলেন, মঁসিয়ে পোয়ারো, বলবেন কি?

-কেন নয়? নিশ্চয়ই বলব। স্বস্থানে নোটবই আর পেন্সিল ঢুকিয়ে দিতে দিতে পোয়ারো বললেন ওতে লিখেছি, জ্যাপ, খানিক বাদেই হয়তো স্যার ক্লডের হত্যাকারীর নাম জানতে পারব।

পোয়ারো থামলেন, রেনরের আপাদমস্তক কঠিন দৃষ্টিতে জরিপ করলেন, বোঝা গেল রেনর তার ব্যক্তিত্বের কাছে চুপসে গেছেন।

পোয়ারো রসিয়ে রসিয়ে বললেন– হ্যাঁ, মঁসিয়ে রেনর, মনে হচ্ছে এতদিনে সেই খুশির নাম আমি জানতে পেরেছি। অবশ্য এর জন্য বাহবা দিতে হয় কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনাকে। জানেন, লর্ড এডগোঁয়ারের খুনের ঘটনাটাও আচমকাই মনে পড়ে গেল, যা স্যার ক্লডের মৃত্যুর রহস্য সমাধানে আমায় সাহায্য করেছে। লর্ড এডগোঁয়ারকে খুন করে লোকটা পাকাল মাছের মতো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। আসলে অপরাধী কাজে ছিল অলস, কিন্তু মাথাটা ছিল ধূর্তামিতে ভরা। এই আমি, আমি এরকুল পোয়ারো প্রায় ওর কাছে হারতে বসেছিলাম, শেষ পর্যন্ত জিত আমারই হল। মঁসিয়ে রেনর, আপনি কি জানেন, যাকে আমরা সহজ সরল নিরীহ গোবেচারা বলে মনে করি, সেই ধরনের অপরাধীর সংখ্যা বেশি। অপরাধ করে ভালো মানুষের মতো চুপচাপ এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। সেদিক থেকে বলতে পারি, সার ক্লডের আসল খুনি বলে আমার সন্দেহ, সেও বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান। তবে নিজের ওপর অত্যন্ত আত্মবিশ্বাস। এর তাড়নায় সর্বদা অস্থির থাকে। কী করব, কী করব, এমন একটা ভাব। হাতের কাছে কাজ না পেলে, লিলিফুলের ছবি আঁকতে বসে যায়।

পোয়ারো থামলেন। তিনি কৌতুক ও আনন্দ বোধ করলেন, কিন্তু প্রকাশ করলেন না, কেবল তা ধরা পড়ল তার বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখে।

-মঁসিয়ে পোয়ারো, রেনর সামান্য এগিয়ে এলেন, ফিসফিসিয়ে বললেন, আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না। তাহলে কী মিসেস লুসিয়া অ্যামরি তার শ্বশুরকে খুন করেন নি?

-একদমই নয়, পোয়ারো হাত তুলে তাকে আশ্বস্ত করে বললেন–আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, তাছাড়া ইন্সপেক্টার জ্যাপকে ওই কাগজে লিখে জানিয়েছি, মিসেস লুসিয়া স্যার ক্লডের খুশি নন। ভদ্রমহিলার অতীত আমার অজানা নয়। বহু দুঃখ কষ্ট সয়েছেন। তাই অকারণে সন্দেহের বশে ওঁকে হয়রানি করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি না।

-তাহলে কাকে আপনি আসল খুনী বলছেন? কে সে? ভেবেচিন্তে রেনর নিজেই বললেন–হ্যাঁ, আমি হলফ করে বলতে পারি, ওই ইটালিয়ান ডঃ কারোলিই খুনী। কী, ঠিক বলেছি?

পোয়ারো তার উৎসাহের গোড়ায় জল দিয়ে বললেন–দুঃখিত মঁসিয়ে রেনর–আমি একজন গোয়েন্দা, পেশাগত স্বার্থে কিছু কিছু নীতি কঠোর ভাবে পালন করতে হয়। তাই বলছি, ধৈর্য ধরুন, শেষ মুহূর্তে দেখুন না কী হয়। এ ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন করা আমি পছন্দ করছি না।

তারপরেই বিষয়ান্তরে চলে গেলেন। পকেট থেকে সাদা রুমাল বের করলেন কপালের ঘাম মুছলেন আর আপনমনে বলে উঠলেন–কী বিশ্রী গরমরে বাবা, অসহ্য!

সত্যিই গরমটা আজ বেশিই পড়েছে। রেনর ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন–দাঁড়ান, একটু হুইস্কির ব্যবস্থা করি। সঙ্গে সোডা। শরীর ঠাণ্ডা হবে। সবকিছু হাতের সামনেই আছে। কথাটা অবশ্য আমার আগেই বলা উচিত, কী করে ভুল করলাম, লজ্জা করছে। যাক, আমি আসছি।

–আপনার মতো দরাজ মনের মানুষরাই তো খাওয়াতে চান। যান, আমার আপত্তি নেই।

-বেশি সময় নেব না, এই এলাম বলে।

রেনর দ্রুত পায়ে স্টাডিতে অদৃশ্য হলে পোয়ারো দুলকি চালে পায়ে পায়ে চলে এলেন খোলা জানালার সামনে। বাইরের দিকে তাকালেন, কী যেন চিন্তা করলেন, কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। আবার ধীরপায়ে চলে এলেন সোফার পাশে, গদিগুলো ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপরেই ম্যান্টলপিসের সামনে এসে পড়লেন, এক পাশে সাজিয়ে রাখা হয়েছে দুটো অ্যান্টিক। তিনি হাতে তুলে নিলেন, বেশ দামি, খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

এমন সময় রেনর দুই গ্লাস হুইস্কি ট্রে-তে সাজিয়ে স্টাডির দরজায় এসে দাঁড়ালেন। দেখতে পেলেন পোয়ারো কী যেন মন দিয়ে পরীক্ষা করছেন। তিনি পোয়ারোর কাছাকাছি এলেন, অবশ্য তফাত বজায় রেখে।

–এটা বেশ দামি, তাই না? পোয়ারো ঘর সাজাবার একটা জগ হাতে তুলে নিলেন, খুব সেকেলে বলে মনে হচ্ছে।

–আপনার তাই মনে হচ্ছে? রেনর জবাব দিলেন আসলে কী জানেন, এসব প্রাচীন জিনিস সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। আসুন, আমরা পান করি।

রেনর হাতে ধরা ট্রে-টা ছোট টেবিলে রাখতে রাখতে বললেন।

–অশেষ ধন্যবাদ, মঁসিয়ে রেনর। পোয়ারো চেয়ারে গা ছেড়ে দিলেন, টেবিল থেকে একটা গ্লাস তুলে নিলেন।

–আপনার শুভেচ্ছা কামনা করি, মঁসিয়ে পোয়ারো। রেনর অন্য গ্লাসটা হাতে নিলেন, কয়েক চুমুকে সবটা শেষ হয়ে গেল।

–আমার তরফ থেকে আপনাকে জানাই শুভেচ্ছা, বন্ধু, ওয়াইনের গ্লাসে হালকা চুমুক দিলেন, বললেন–হ্যাঁ, তখন যেন আপনি কী জানতে চাইছিলেন? আমি কাকে খুনি হিসাবে সন্দেহ করছি, তার কথা, তাই না? হঠাৎই আমার অন্তদৃষ্টি খুলে গেল জানেন, আমি উপলব্ধি করলাম যে

এই পর্যন্ত বলে কথা থামিয়ে দিয়ে পোয়ারো মাথাটা সামান্য ঝাঁকুনি দিলেন, ঘাড় তুলে কী যেন শোনার চেষ্টা করলেন, পরক্ষণে ঠোঁটে আঙুল চেপে ধরলেন। বোঝাতে চাইলেন, ঘরের বাইরে কেউ পাত পেতেছে, অতএব চুপ।

পোয়ারো এবার নিঃশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। পা বাড়ালেন। রেনর উঠতে গিয়ে বাধা পেলেন। পোয়ারো তাকে ওইখানে বসে থাকতে বললেন হাত নেড়ে। তারপর টু শব্দটি না করে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। কাউকে কিছু টের পেতে না দিয়ে দরজার হাতল ধরে হ্যাঁচকা টান মারলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলেন–কিন্তু, কে কোথায়? সব ফাঁকা।

পোয়ারো বিড়বিড় করলেন ভোজবাজি আর কী!

হতাশার চাউনি মেলে এদিক ওদিক তাকালেন। তিনি আবার যথারীতি ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজার পাল্লা ভেজিয়ে দিলেন।

চেয়ারে বসতে বসতে বললেন–সত্যি বলছি, কার যেন হাঁফের অওয়াজ কানে এল, বিশ্বাস করুন, দরজার বাইরেই সে দাঁড়িয়েছিল। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। দেখছি, আমার নিজেরই শোনার ভুল। তবে আমরা, গোয়েন্দারা, এই ধরনের ভুল শোনার ঘটনাকেই একটা বড় ঘটনা হিসাবে গণ্য করি।

–পোয়ারো কথা শেষ করে গ্লাসে আবার চুমুক দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্লাস ফাঁকা।

-আঃ, কী আরাম সত্যি স্বস্তি হল।

–মাফ করবেন মঁসিয়ে রেনর, স্বস্তি হল বললেন কেন বলুন তো?

–না না, তেমন কিছু নয়, বাইরে সন্দেহজনক কাউকে খুঁজে পেলেন না, ফলে মন থেকে দুশ্চিন্তার একটা পাথর সরে গেল, তাই স্বস্তি হল আর কী।

–সত্যি বলতে দোষ কী, বলুন মঁসিয়ে রেনর। হুইস্কি শূন্য গ্লাসটা টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে পোয়ারো বললেন আপনারা মানে ইংরেজরা হুইস্কিই বেশি পছন্দ করেন, বলা হয় এই আপনাদের জাতীয় পানীয়। কিন্তু আমি? চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বেশ কতগুলো বছর আগে, সেই থেকে লন্ডনেই বসবাস, অথচ-এখনও পর্যন্ত হুইস্কিকে আমার বন্ধু বলে জানতে পারলাম কই? এর কারণ আমার জানা নেই। তার ওপর আপনার বানানো এই তরল পানীয় একেবারে তেতো বিষ বুঝতে পারছি না হুইস্কিটা তেতো লাগল কেন?

-তেতো! রেনর বিস্ময় ভরা কণ্ঠে জানতে চাইলেন, আপনি কি আমার সঙ্গে মজা করছেন। তারপর তাকিয়ে রইলেন পোয়ারোর দিকে, প্রখর সে দৃষ্টি। বললেন–কিন্তু আমিও তো একই ড্রিংস নিলাম। আমার ছিটেফোঁটাও তেতো লাগল না। ছাড়ুন ওসব, কাজের কথায় আসুন, তখন কী যেন বলতে বলতে থেমে গেলেন, মনে পড়ছে?

-বলেছিলাম বুঝি। পোয়ারো অবাক হয়ে জানতে চাইলেন–ব্যাপারটা মনে পড়ছে না, মঁসিয়ে রেনর। সত্যি, এই সামান্য সময়ের মধ্যে বুঝি আসল কথাটাই ভুলে গেলেন। মনে হচ্ছে, কোনো এক সময় একটা রহস্য সমাধান করতে কীভাবে তদন্ত করেছিলাম, সেই গল্পই বোধহয় আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম। অপরাধীর বিরুদ্ধে একটা প্রমাণ পেলেই হল। তারপর সব প্রমাণ গুলি একটা অন্যটার হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি এসে দাঁড়ায়। এভাবেই রহস্য সমাধানের পথ হয় প্রশস্ত। এরপরে যা হাতে আসে, তা আগের প্রমাণের চেয়ে তুচ্ছ, নগণ্য। অন্যদের সঙ্গে খাপ খায় না। ফলে বড় বড় প্রমাণ সাজিয়ে গুছিয়ে যে শেকল তৈরি করা হল, তা গেল কেটে। তাই বলে আমরা কি তদন্তের কাজ থামিয়ে দেব? আবার নতুন করে শুরু হয় অনুসন্ধানের কাজ, খানা-তল্লাসি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা। যে প্রমাণ নগণ্য বলে সরিয়ে রাখা হয়, তার মাধ্যমেই মস্ত এক অপরাধমূলক রহস্যের দ্বার খোলার চাবিকাঠি পেয়ে যাই। অদ্ভুত ভঙ্গিতে পোয়ারো মুচকি হাসলেন, নিজের টাক মাথায় টোকা মেরে বললেন–এটা বড় ভয়ঙ্কর আর অতুলনীয়।

–হুঁ, তেমনটিই দেখছি পোয়ারোর কথার গভীরতা বুঝতে না পারায় রেনর বোকার মতো তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

–আমার মুখের দিকে ওভাবে তাকিয়ে কী দেখছেন, মঁসিয়ে রেনর। আচমকা ডান হাতের তর্জনী দিয়ে রেনরের গালে একটা খোঁচা মারলেন পোয়ারো। রেনর দ্রুত হাতে মুখ ঢাকলেন, চেয়ার থেকে পড়ে যেতে যেতে রক্ষা পেলেন।

যে গোয়েন্দা ছোট খাট ঘটনাকে উড়িয়ে দেন, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন, ওইসব নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করেন না, তাদের বরাত অত্যন্ত বাজে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমি ওই দলভুক্ত নই। প্রমাণ যত নগণ্য হোক না কেন, রহস্য সমাধানে তারও একটা ভূমিকা আছে মানতেই হবে। ফলে ছোট বড়োর মধ্যে শুরু হয় দ্বন্দ্ব। সবকিছুর মধ্যেই সামান্য হলেও সত্য লুকোনো আছে, গোয়েন্দাকে তা খুঁজে বের করতে হয়।

পোয়ারো চুপ করলেন, নিজের ঝাঁ-চকচকে টাকে হাত বুলোলেন। তারপর বললেন হ্যাঁ, কী নিয়ে যেন আপনার সঙ্গে কথা বলছিলাম বলুন তো, তুচ্ছ প্রমাণ, তাই না? আমিও আপনাকে এক গুরুত্বহীন তুচ্ছ প্রমাণের কথাই বলছি, তা হল ধুলোময়লা!

-ধুলোময়লা! ব্যাস, আর কিছু নয়? রেনর না বুঝে সামান্য হাসলেন।

–হ্যাঁ, মশাই, তাই। পোয়ারো সামান্য হাসলেন আমার বন্ধু ও সহকারী ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর কথা বলছি। অত্যন্ত করিত্বর্মা মানুষ। সব ব্যাপারে আমাকে মনে করিয়ে দেওয়াই ওঁর কাজ। ওঁর কথাতেই আমি উপলব্ধি করলাম, হ্যাঁ, সত্যিই তো, আমি একজন গোয়েন্দা, এ বাড়ির চাকর নই। কথাটা বন্ধুবর কোন উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, জানি না, তবে আমার উপকারে লেগেছে।

আপাতদৃষ্টিতে বাড়ির কাজের লোক, সে চাকর বা ঝি, যাই হোক না কেন, তার কাজ কী? বাড়ির সমস্ত ঘর সাফ করা। ঘরের যেখানে আলো পৌঁছোয় না, ধুলোময়লা ঘাপটি মেরে পড়ে আছে, সেগুলো ঝাঁটা দিয়ে ঝেটিয়ে পরিষ্কার করে। মঁসিয়ে রেনর, মানছি আমি আপনার থেকে বয়সে বড়ো, কিন্তু শিক্ষা? তাও যথেষ্ট আছে। আপনার সাধারণ জ্ঞানও কিছু কম আছে বলে মনে করি না। আপনিই বলুন, গোয়েন্দাও কি চাকরের মতো কাজ করছেন না?

পোয়ারোর বকবকানি শুনে রেনরের জ্বরু দুটো কুঁচকে গেল, মুখে একরাশ বিরক্তি, অবশ্য তা প্রকাশ্যে নয়। কোনোরকমে মাঝে মাঝে বলছেন, হ্যাঁ, তাই তো, মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার বক্তব্যকে আমি সমর্থন করি।

রেনর বুঝি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারছেন না। তিনি পোয়ারোর কাছাকাছি হবার জন্য নিজের চেয়ারটা টেনে নিয়ে এলেন। ক্ষিপ্ত কণ্ঠস্বরে বললেন আপনি সেই থেকে কীসব বকে চলেছেন বলুন তো! অর্থহীন কিছু সংলাপ। আপনি কি এসব ছাইপাশ শোনাতেই চেয়েছিলেন? এক গ্লাস হুইস্কি পেটে পড়তে না পড়তেই হাবিজাবি বকতে শুরু করে দিলেন?

নেশা আমার একটুও হয়নি, মঁসিয়ে রেনর। পোয়ারো পিঠ টান করে বসলেন–এখনও পর্যন্ত যা কিছু আপনাকে বলেছি, সুস্থ মস্তিষ্কেই বলেছি। হ্যাঁ, আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল ধুলো ময়লা। শুরু করেছি বটে শেষ করা হয়নি। আপনি কিন্তু আমার চোখে ধুলো দিতে পারেননি, অবশ্য ধুলো থাকলে তো দেবেন। পোয়ারোর মাথাটা সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ল–কী, বুঝতে পেরেছেন? অবশ্য মগজে যদি ঘিলু থাকে।

-না, রেনরের বিরক্তির মাত্রা তখন ধীরে ধীরে বাড়ছে। ভনিতা না করে স্পষ্ট করে বলুন, দয়া করে।

বেশ, তাই বলছি। পোয়ারো হাত তুলে রেনরকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললেন ধুলোময়লা মাদমোয়াজেল বারবারার কথা। শব্দটা আমার মনে দারুণ ভাবে রেখাপাত করে। ওষুধের টিনের বাক্সের ঢাকনায় কোনো ময়লা নেই, অথচ বাক্সটা যার ওপর রাখা হয়েছে, মানে শেল্টা ধুলোতে ঢাকা। বুঝতে আমার দেরি হল না যে ......পোয়ারো চুপ করলেন।

–কী হল, থেমে গেলেন কেন? শেষ করুন।

–বুঝতে দেরি হল না যে, কয়েকদিন আগে ওই ওষুধের বাক্সটা কেউ নীচে নামিয়ে ছিল। ওই সময় স্যার ক্লডের খুনি প্রয়োজন মতো বিষ সরিয়ে রেখেছিল, ফলে ওনাকে খুন করার সময় তাকে আর ওই বাক্সের আশে-পাশে যেতে হয়নি। আর খুনী এই কাজটা করেছিল, সকলের অগোচরে। মঁসিয়ে রেনর, আপনি আপত্তি করলে কী হবে, আমি নিশ্চিত, আপনিই আগে থেকে হিসকোসিন গোপন কোনো জায়গায় সরিয়ে রেখেছিলেন। মঁসিয়ে রিচার্ড কফির কাপ নিয়ে স্টাডিতে ঢুকেছিলেন, এটা ঠিক, কিন্তু আপনি ওই কাপে আগেই বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলেন, তারপরে বারবারার সঙ্গে নাচতে চলে যান। আমি ভেবেছিলাম, আপনার এই কুকর্মটি কারো চোখে ধরা পড়েনি, ভুল ধারণা। মাদাম লুসিয়া স্পষ্ট দেখেছিলেন।

-ওঃ ভগবান! রেনর ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ বটে, কিন্তু ঠোঁটে সামান্য হাসি টেনে বললেন– স্যার ক্লডের হত্যাকারী হিসাবে আপনি শেষ পর্যন্ত আমাকেই দোষী সাব্যস্ত করছেন, মঁসিয়ে পোয়ারো। সত্যিই, হুইস্কির নেশা আপনাকে পেয়ে বসেছে দেখছি।

–বেশ, আপনার কথাই সই, কিন্তু আপনি! আপনি তো দিব্যি সুস্থ মাথায় কথা বলছেন। তাহলে আপনি বলুন, আপনার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সত্যি, না মিথ্যে?

-না না, একেবারেই মিথ্যে নয়। রেনর রাগে ফেটে পড়লেন। গলা চড়িয়ে বললেন–এ অভিযোগ আমি মেনে নিচ্ছি। এর জন্য মাথা হেঁট? কখনো না। বরং আমি গর্বিত। সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কত স্বচ্ছ ও সুন্দরভাবে কাজ করতে পেরেছি বলে। শেষ মুহূর্তে, মানে মারা যাবার আগে স্যার ক্লড কী মনে করে সিন্দুকটা খুলে দেখলেন, খাম নেই। যখন তখন সিন্দুক খোলা ওঁর অভ্যাস ছিল না। অথচ সে রাতে..... জানি না। কেন।

-কিন্তু... কিন্তু, পোয়ারো জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন–এসব আমাকে শোনাচ্ছেন কেন?

কেন নয়? আপনি আমার পরম সুহৃদ, সহানুভূতিশীল নির্ভেজাল ভদ্রলোক, রেনরের ঠোঁটে কৃতিত্বের হাসি বিশ্বাস করুন, মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার মতো মানুষদের সাথে মন খুলে কথা বলতে ইচ্ছে করে। এ হল এক ব্যর্থতাকে সাফল্যে পরিণত করার প্রয়াস মাত্র, অবশেষে সফলতা পেয়েছি। এর জন্য আমি আনন্দিত ও গর্বিত। ভেবে দেখুন, জিনিসটা লুকিয়ে রাখতে হবে, কিন্তু ভাবনা চিন্তা করার মতো সময় নেই। পলকের মধ্যে জায়গাটা বের করলাম, মাথায় কতখানি বুদ্ধি থাকলে তবেই এমনটি সম্ভব বলুন। যাই

বলুন না কেন মঁসিয়ে পোয়ারো, নিজেকেই নিজে বাহবা দিচ্ছি। যাক, ওসব কথা, এবার ওই খোয়া যাওয়া ফর্মুলাটার হদিস আপনাকে দিতে হবে, তাই তো।

কিন্তু পোয়ারো তখন আর স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখতে পারছেন না, মাথা সোজা রেখে বসার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন কই। ঝিমিয়ে পড়ছেন, কথাগুলো মুখের ভেতরেই রয়ে যাচ্ছে, কিছু কিছু বেরোচ্ছে, কিন্তু স্পষ্ট নয়।

তাও কোনোরকমে বললেন –মঁসিয়ে রেনর, কী হল বলুন তো? বুঝতে পারছি না।

কী যে করি, তাও মাথায় আসছে না।

আপনার কিছু করার নেই, মঁসিয়ে রেনর, সত্যি বলছি। রেনরের ঠোঁটে শেয়ালের ধূর্ত হাসি খেলে গেল। গোড়াতেই আপনি একটা ছোট ভুল করেছিলেন। আমার বুদ্ধিকে আমল না দেওয়ার ভুল। এ পর্যন্ত আমার বুদ্ধিকে সর্বদা নস্যাৎ করে দিয়েছেন আপনি। সকলের সন্দেহের নজর গিয়ে পড়ল ওই ছাঁচড়া ইটালিয়ানটার ওপর–যার চাল নেই, চুলো নেই। পেটের ধান্দায় যে একে-ওকে ব্ল্যাকমেল করে বেড়ায়। ওই জোচ্চোরটাই যে এ বাড়িতে ঢুকেছিল ফর্মুলা চুরি করতে, আর ওই স্যার ক্লডকে খুন করেছে এ ভাবনা আপনার মতো বুদ্ধিমান লোকের মাথায় কী করে এল, ভেবে হাসি পাচ্ছে। দূর, দূর, আপনাকে এসব কথা বললে কী হবে, কানে তো কিছুই যাচ্ছে না। মশাই, আমি বড়ো গাছে নৌকা বাঁধতে ভালোবাসি। ছোট্ট একটুকরো কাগজ, অথচ কত মূল্যবান। নেবার জন্য খদ্দেরটা বসে আছে। পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার পাউন্ড অনায়াসে পকেটে আসবে। অত অর্থ! কী করব বলুন তো? ধারণা করতে পারেন?

–ধারণা...... আমি ....না, পারছি না।

–না পারাটাই স্বাভাবিক। কারণ সকলের দেখার চোখ এক নয়। প্রবল আত্মবিশ্বাসের সুরে রেনর বললেন।

-আপনি যতই আমার তারিফ করুন না কেন, আপনাকে আমি কিন্তু ছাড়ছি না, শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে পোয়ারো ধীরে ধীরে বললেন–সবার সামনে আপনার ভালো মানুষের মুখোশটা খুলে দেব, আমি এরকুল পোয়ারো বলছি।

পোয়ারোর মুখ দিয়ে আর কথা বেরোল না, তিনি শরীরটাকে এলিয়ে দিলেন চেয়ারের গায়ে।

–এসব করার সময় আর আপনি পাবেন না মঁসিয়ে পোয়ারো। করুণা ও অবজ্ঞা মিশ্রিত হাসিতে মুখ ভরিয়ে এডওয়ার্ড রেনর বলে চললেন–তার আগে হুইস্কি কেন তেতো লাগল, সে ইতিহাস শুনে যাবেন না? আপনার অত বড়ো মাথাটা কেন যে এর কারণটা আবিষ্কার করতে পারল না, বুঝতে পারছি না। যাক সে কথা। মারা যাবার আগে স্যার ক্লডও কফি খেয়ে বড় তেতো লাগছে বলেছিলেন, এখবর আপনার অজানা নয়, মঁসিয়ে পোয়ারো আপনি ঠিকই ধরেছেন, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এবাড়িতে আপনি ঢোকার অনেক আগেই সরিয়ে রেখেছিলাম হিসকোসিনের বেশ কয়েকটা শিশি। স্যার ক্লডকে কফিতে যতটুকু ঢেলেছিলাম, মনে হয় আপনার বেলায় তার পরিমাণ বেশি পড়ে গেছে। তাই ফলটাও তাড়াতাড়ি দিচ্ছে। ভালোই হল, আমি তারিয়ে তারিয়ে দেখছি, আপনি কেমন ধীরে ধীরে নির্জীব হয়ে যাচ্ছেন। তবে যন্ত্রণা নেই বলুন, কেমন ঘুমের রাজ্যে

চলে যাচ্ছেন। না, কোনো স্বপ্ন পর্যন্ত দেখতে পাবেন না। সব দুঃস্বপ্ন হয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে আপনার মৃত্যুর সাথে।

-মঁসিয়ে রেনর, থামুন, আপনিই তা হলে....... হেস....টিং...স.....হে-স....

এরকুল পোয়ারো আর কিছু বলতে পারলেন না, দু চোখ বুজে ঢলে পড়লেন।

-ও মশাই, এত তাড়াতাড়ি চোখ বুজলে তো চলবে না। রেনর এগিয়ে এসে পোয়ারোকে ঠেলা দিলেন-নিন, নিন, চোখ খুলুন, জোর করে চোখের পাতা টেনে থাকুন। মরার আগে সেই গুপ্ত জায়গাটার খবর জেনে নি, যেখানে ফর্মুলাটা লুকোনো ছিল।

রেনর আবার তাকালেন পোয়ারোর দিকে, তারপর ফায়ার প্লেসের কাছে চলে এলেন, ম্যান্টেলপিসে রাখা ফুলদানিটা তুলে নিলেন। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে কাগজের টুকরোগুলো বের করলেন। তাড়াতাড়ি সেগুলো জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন। তাকালেন পোয়ারোর দিকে। বললেন–কাজ শেষ, চলি মি. এরকুল পোয়ারো।

খোলা ফ্রেঞ্চ উইন্ডো লক্ষ্য করে এডওয়ার্ড রেনর এগিয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য জানলা গলিয়ে পগার পার হবেন।

কিন্তু তা আর সম্ভব হল না।

–এ কী! কোথায় চললেন? খামটা নিয়ে যান, যার মধ্যে ফর্মুলাটা ছিল।

পোয়ারোর স্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে রেনর চমকে উঠে ঘাড় ফেরালেন। ঠিক এই সময় বাগান থেকে জানলা টপকে ভেতরে এসে ঢুকলেন ইন্সপেক্টর জ্যাপ, সঙ্গে তার কনস্টেবল জনসন।

রেনর ক্ষণিকের জন্য ঘাবড়ে গেলেও পরক্ষণে পালাবার জন্য জানলার দিকে ছুটে গেলেন। জানলা দিয়ে লাফ দেবার আগেই কনস্টেবল তাকে জাপটে ধরল, হেঁচড়ে হেঁচড়ে নিয়ে এল ঘরের মাঝখানে।

-ধন্যবাদ, জ্যাপ, ঠিক সময়ে তুমি এসে পড়েছ। পোয়ারো গলা খাঁকারি দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। শরীরটাকে এপাশ-ওপাশ করে সহজ করলেন–আর সামান্যতম দেরি হলে ওই মহাগুরু জানলা টপকে বাগান পেরিয়ে নাগালের বাইরে চলে যেত। সত্যি, মোক্ষম সময়ে তুমি এসেছ।

জানলার বাইরের বারান্দায় দাঁড়ালে ঘরের সব কথাবার্তা শোনা যায়, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস-এর কাছে তোমার পাঠানো চিরকুটটা পেয়ে আমি জনসনকে নিয়ে ওখানেই অপেক্ষা করছিলাম, আর তোমাদের কথা চালাচালি শুনছিলাম, একেবারে স্পষ্ট। আগে ওর পকেটটা দেখি, কী আছে?

জ্যাপ হাত ঢুকিয়ে দিলেন রেনরের জ্যাকেটের পকেটে। বেরিয়ে এল কতগুলো টুকরো কাগজ। সেগুলো কফি টেবিলের ওপর রাখলেন। তার আর এক পকেট থেকে পাওয়া গেল হিসকোসিনের লেবেল আঁটা টিউব। বললেন–এটা দেখুন, মঁসিয়ে পোয়ারো, একটা বড়িও নেই।

এইসময় জানলা দিয়ে ভেতরে এসে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, তার হাতে সোড়া মেশানো হুইস্কির গ্লাস। তিনি সরাসরি তাকালেন রেনরের দিকে। তারপর গ্লাসটা এগিয়ে দিলেন পোয়ায়োর হাতে।

-মঁসিয়ে রেনর, মদের গ্লাসটা অন্য টেবিলে রেখে পোয়ারো বললেন, আপনি যে নাটক শুরু করেছিলেন, তাতে আমায় কুশীলব বানাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দুঃখিত, আমার নাটকে আপনি একক অভিনয় করে হাত তালি কুড়িয়ে নিলেন। জ্যাপকে আমি চিরকুটটা লিখে হেস্টিংস এর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এবার ভীষণ গরম লাগছে বলে ভণিতা করে আপনাকে খেলতে নামিয়ে দিলাম। আসলে আপনার গ্যাড়াকলটা আমার বুঝতে বাকি ছিল না। তাই টোপ ফেলতে হল। হেস্টিংস জনালার বাইরে দাঁড়িয়েছিল। ও এক গ্লাস হুইস্কি ওপর থেকে নিয়ে এসেছিল। আপনার চোখকে ধুলো দিয়ে আপনার আনা ট্রে থেকে গ্লাস তুলে হেস্টিংস-এর সঙ্গে পালটাপালটি করে নিলাম। ব্যাস নাটক জমে উঠল, অবশেষে যবনিকা পড়ে গেল।

-যে বিষ কফির সাথে মিশিয়ে উনি নিজের মনিব স্যার ক্লডকে হত্যা করেছেন, সেই একই বিষ আপনার হুইস্কিতে মিশিয়ে দিয়েছিলেন, আপনাকে খুন করার জন্য। ওই হুইস্কির গ্লাস ফরেনসিকে পাঠালেই সব জানা যাবে। জ্যাপ বলে চললেন–ফাঁসির দড়ি গলায় ওঁকে পড়তেই হবে। এমন কোনো জাঁদরেল উকিল নেই, যে ওঁকে বাঁচাতে পারে।

রেনর এতক্ষণ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। এবার চোখ তুললেন, তাকালেন জ্যাপের দিকে। তারপর দৃষ্টি ঘুরে এল পোয়ারোর কাছে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কেটে কেটে বললেন– জানেন, জবরদস্ত পরিকল্পনা করেছিলাম, ধাপে ধাপে বেশ এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু

আপনাকে এ বাড়িতে দেখে সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। এক অজানা ভয় আমায় জাপটে ধরল। ভেবেছিলাম, ওই ফর্মুলাটা হাতিয়ে নিয়ে বেচে দেব। নিদেনপক্ষে ষাট হাজার পাউন্ড তো পেতাম। তারপরে সুন্দর একটা জীবন, তখন আমাকে আর পায় কে? কিন্তু আপনি আসাতে সব মাঠে মারা গেল। এক ফুৎকারে মিলিয়ে গেল আমার সোনালী স্বপ্নগুলো। এখন বুঝতে পারছি, বৃথাই আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করছি। দোষ হল আমার মনের ভেতরের প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের, যা আমার জীবনটাকে ছারখার করে দিতে চলেছে।

রেনর একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন–আপনি এখানে হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার উচিত ছিল, তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে যাওয়া। তবে আমার মনিব হতে পারেন এক যশস্বী বিজ্ঞানী, কিন্তু আমার চোখে তিনি ছিলেন এক অশ্রদ্ধার পাত্র। ছোট থেকে পয়সা কামাতে শিখেছেন বটে, কিন্তু যেমন কৃপণ তেমনি দেমাকি। বাড়ির কেউ তাকে পছন্দ করতেন না। স্নেহ-ভালোবাসা-শ্রদ্ধা বিনা উনি কীভাবে এতগুলো বছর বেঁচেছিলেন, তা ভেবে অবাক হয়ে যাই। তবে এখনও আমার আফশোশ হচ্ছে, ওই নীচ মনের মানুষটাকে শেষ করে তখনই ফর্মুলা নিয়ে পালিয়ে কেন গেলাম না।

-মঁসিয়ে রেনর, পোয়ারো বললেন, আমি যখন ঝিমিয়ে পড়ার ভান করেছিলাম, আপনি তখন জাঁক করে কী বলেছিলেন মনে আছে? আপনি নাকি দারুণ বুদ্ধিমান, গোড়াতেই আমার তা বোঝা উচিত ছিল এবং অবজ্ঞা ভরে উড়িয়ে দেওয়া উচিত হয়নি। তবে যাবার আগে জেনে নিন, ও ভুল আমি করিনি। আপনি যে অত্যন্ত ধূর্ত, তা আমি, এরকুল পোয়ারো আগেই টের পেয়েছিলাম। আপনার মতো উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিমান এক বিজ্ঞান সাধকের এই দুঃখজনক পরিস্থিতি দেখে সত্যিই খারাপ লাগছে।

এবার ইন্সপেক্টর জ্যাপ এগিয়ে এলেন–এডওয়ার্ড রেনর, তার হাতে হাত কড়া পরাতে পরাতে বললেন–সুপরিকল্পিতভাবে ও সুস্থ মাথায় স্যার ক্লড অ্যামরিকে হত্যা করা এবং তাঁর ফর্মুলা চুরি করার অভিযোগে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল। আপনি একটা কথা জানবেন, এখন থেকে আপনি যা কিছু বলবেন, মামলা শুরু হলে সেগুলো সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসাবে পুলিশ আপনার বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে পারে।

ইন্সপেক্টর জ্যাপ এবার তাঁর কনস্টেবলকে ইঙ্গিত করলেন, এডওয়ার্ড রেনরকে সেখান থেকে নিয়ে যেতে। বললেন জনি, ওই হুইস্কি ভর্তি গ্লাসটা নিয়ে খেতে ভুলো না, ওটাতে বিষ মেশানো আছে, খেয়াল রেখো।

কনস্টেবল জনসন রেনরকে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ঠিক এই সময় দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালেন ক্যারোলিন অ্যামরি। রেনরের হাতে হাতকড়া দেখে তিনি আঁতকে উঠলেন। কনস্টেবল তাকে পাশ কাটিয়ে রেনরকে নিয়ে চলে গেল।

বড়ো বড়ো চোখ করে ক্যারোলিন পোয়ারোর কাছে জানতে চাইলেন–মঁসিয়ে পোয়ারো, এসব কী দেখছি? আমার ভাই স্যার ক্লডের খুনি কি ওই এডওয়ার্ড রেনর?

মাদাম, নিজের চোখেই দেখলেন, পোয়ারো জবাব দিলেন, রেনর ফর্মুলা চুরি করে আপনার ভাইকে বিষ মেশানো কফি খাইয়ে মেরেছে। পালাতেই যা বাকি ছিল। কিন্তু বিধি বাম, তাই বামাল সমেত ধরা পড়ে গেলেন।

-ওঃ ভগবান! এসব কী শুনছি। ক্যারোলিনের আর্তকণ্ঠ শোনা গেল, হতবিহ্বল তার দৃষ্টি। –লোকটার পেটে পেটে এত শয়তানি ছিল, বিশ্বাস করতে পারছি না। আমরা ওকে আমাদের পরিবারের একজন করে নিয়েছিলাম। সময়ে-অসময়ে ওর পাশে থেকেছি। শরীর খারাপ হলে ওষুধ দিয়েছি। এই তো ক'দিন আগে, আমি নিজে ওকে বীসওয়াক্স ওষুধ খাইয়েছি। এত কিছু করে পাল্টা আমরা কী পেলাম। ক্যারোলিন ডুকরে কেঁদে উঠলেন। পোয়ারোর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছলেন। এইসময় দরজার পাল্লা দুপাশে ধরে রিচার্ড এসে দাঁড়াল। ক্যারোলিন কোনোদিকে না তাকিয়ে রিচার্ডকে সরিয়ে ছিটকে চলে গেলেন বাইরে।

ঠিক এই সময় বাগান থেকে জানলা দিয়ে লাফিয়ে বারবারা ঘরে এসে ঢুকল। সেও শুনল রেনরের গ্রেপ্তারের কাহিনী। প্রথমটায় মানতে সেও পারছিল না। তারপর আপন মনে বলল–আশ্চর্য! রেনর এই কাজ করতে পারে ভাবাই যায় না। ওনার ব্যবহার দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে, আপনিই বলুন মঁসিয়ে পোয়ারো। এখন আমার পরিষ্কার মনে পড়ছে, হাতের কাজ শেষ না করে ওই রেনরই আমাকে ফক্সট্রট নাচে সঙ্গ দেবে বলে স্টাডি থেকে বেরিয়ে এসেছিল, এর খানিক বাদেই জ্যেঠুর মৃত্যু হয়।

–শুধু কী তাই, ইন্সপেক্টার জ্যাপ বারবারাকে লক্ষ্য করে বললেন–লোকটার কুকীর্তির শেষ নেই। যে বিষ খাইয়ে আপনার জ্যেঠুকে খুন করেছে, সেই একই বিষ দিয়ে মঁসিয়ে পোয়ালরার জীবন খতম করতে চেয়েছিল।

তাই নাকি! কী সর্বনাশ কান্ড ঘটে যেত বলুন তো! বারবারা এবার ক্যাপ্টেন হেস্টিংসকে দেখিয়ে কৈফিয়তের সুরে জানতে চাইল কেন উনি, বাগান থেকে বেশ কিছুক্ষণ আগেই চলে এসেছিলেন, কোথায় গিয়েছিলেন?

মঁসিয়ে পোয়ারোর লেখা চিরকুট পেয়ে আমি, জনসন আর ক্যাপ্টেন হেস্টিংস জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম, কখন নাটকের যবনিকা টানা হবে। রেনর যে বিষ মেশানো হুইস্কি মঁসিয়ে পোয়ারোকে দিয়েছিল, সেটা ক্যাপ্টেন হেস্টিংস বদলে দিয়েছেন তা রেনর টের পায়নি। মঁসিয়ে পোয়ারো এমন অভিনয় শুরু করলেন যে, সত্যি সত্যি ওই হুইস্কি খেয়ে তার প্রাণবায়ু এখুনি বেরিয়ে যাবে। রেনর ভাবল, লোকটা তো মরেই যাবে, আমি যদি সত্যি কথাটা বলে দিই, কে আর জানতে পারছে। বেশ জোরালো কণ্ঠস্বরে নিতে অপরাধের কথা স্বীকার করল। স্যার ক্লডকে খুন আর ফর্মুলা চুরি রেনরের এই স্বীকারোক্তি আমরা সকলে স্পষ্টভাবে শুনতে পেলাম। তারপরেই বামাল সমেত অপরাধীকে আমরা ধরে ফেলি। রেনরের দুর্ভাগ্য, আত্মবিশ্বাস যে তার সাথে এমন ছলনা করবে, তা কল্পনাও করতে পারেনি।

মাদমোয়াজেল, ইন্সপেক্টার জ্যাপের দিকে হাত তুলে দেখালেন। পোয়ারো বললেন–এই জটিল রহস্য সমাধানের কৃতিত্বের দাবীদার একমাত্র ইনি, আমার পুরোনো ও খুব ভালো বন্ধু, গোয়েন্দা ইন্সপেক্টার জ্যাপ, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের এক জাঁদরেল অফিসার হিসাবে যিনি পরিচিত।

-মঁসিয়ে পোয়ারো সামান্য হাসলেন, নিরহঙ্কার ভাবটা দেখছি আপনি সযত্নে এখনও পালন করে চলেছেন। সত্যি আপনি একজন খাঁটি ভদ্রলোক।

এসময় কনস্টেবল জনসন ঘরে এসে ঢুকল। সে বিষমেশানো হুইস্কিসহ গ্লাসটা একটা পলি প্যাকে ভরে নিল।

জ্যাপ লক্ষ্য করলেন, ক্যাপ্টেন হেস্টিংস মুগ্ধ চোখে বারবারাকে দেখছেন। তিনি বললেন অসংখ্য ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন হেস্টিংস, আপনার সযত্নে রক্ষিত জিনিসটি আমি নিয়ে গেলাম। মঁসিয়ে পোয়ারোকে খুন করার প্রচেষ্টা মামলায় এটি সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসাবে লাগবে। চলো হে জনি।

বিদায় অভিবাদন জানিয়ে ইন্সপেক্টর জ্যাপ বসার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

***

এবার বারবারা মুখ খুলল। পোয়ারোর দিকে তাকাল, সামান্য হাসল, লজ্জা ঝরে পড়ল। জানতে চাইল–এবার আসল কথাটা বলুন তো, খুনিকে কে ধরল, আপনি নিশ্চয়ই, ঠিক বলেছি মঁসিয়ে পোয়ারো?

ভুল করছেন আপনি। পোয়ারো ঠোঁটে হাসি বুলিয়ে বন্ধুর সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন–এ রহস্য উন্মোচনের অন্তরালে সবার আগে আছেন ইনি, আমার বন্ধু ও সহকারী ক্যাপ্টেন হেস্টিংস। এমন একটা কথা বলেছিলেন, কোন খেয়ালে বলেছিলেন জানি না, যা ওঁর অজান্তেই আমাকে এগিয়ে নিয়ে গেল সাফল্যের দিকে। দেখুন তাকিয়ে ওর দিকে, বেচারা বন্ধুটি আমার, নিজের কৃতিত্ব জাহির করে বলতে হবে তো, তাই কেমন ছটফট করছে দেখুন।

....মাদমোয়াজেল, আপনাদের বাগানটা সত্যি সুন্দর। যান, ওকে নিয়ে বেড়িয়ে আসুন। কোনো গাছের নীচে বসুন। ওর মুখে শুনবেন খুনিকে ধরার রোমাঞ্চকর কাহিনী, যা শুনে আপনার গায়ে কাঁটা দেবে।

পোয়ারো কথা শেষ করে বারবারা ও হেস্টিংসকে নিয়ে চলে এলেন খোলা জানলার কাছে।

-ও আমার প্রাণের সখা, বিলম্ব কেন, নাটকীয় ভঙ্গিতে সুর করে বলতে বলতে বারবারা হেস্টিংস-এর হাত ধরে জানলা টপকে বাগানের দিকে চলে গেল।

পোয়ারো এখন বসার ঘরে একা। রিচার্ড এসে ঢুকল সে ঘরে। পরক্ষণেই লুসিয়া হাজির। স্বামীকে দেখে আকুল স্বরে তাকে ডাকল–রিচার্ড!

রিচার্ড ঘাড় ফেরাল। স্ত্রীকে দেখে অবাক হল। বলল–লুসিয়া!

-হ্যাঁ, আমি লুসিয়া আর কোনো কথা বলতে পারল না। কী এক ভয় এসে বুঝি তার কণ্ঠ চেপে ধরেছে। হতাশ হয়ে সে ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

লুসিয়া, তুমি। রিচার্ড দ্রুত লুসিয়ার সামনে এসে দাঁড়াল।

লুসিয়া উঠে দাঁড়াল, চোখে জল। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা। রিচার্ডের চোখ থেকে ঝরছে অনুতাপের হাহাকার। কেউ কোনো কথা বলছে না, অনিমিখ তাকিয়ে আছে পরস্পরের দিকে।

হঠাৎ পোয়ারোর দিকে দৃষ্টি পড়ল লুসিয়া। সে অসহায়ের মতো কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল, যেন বাবার কাছে মেয়ে এসেছে সান্ত্বনা লাভের আশায়। লুসিয়ার দুটি হাত বাড়িয়ে দিল–মঁসিয়ে পোয়ারো, ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাকে আর ছোট করব না।

পোয়ারো পরম স্নেহে লুসিয়ার হাত দুটি নিজের মুঠোতে ধরে বললেন–মাদাম, আপনি এবার নিশ্চিন্ত হলেন।

নিশ্চিন্ত হলাম কী করে? আমার শ্বশুরের খুনি ধরা পড়েছে বটে, তাই বলে আমার দুঃখের অবসান কি হল?

কথা বলতে বলতে লুসিয়া তার স্বামীর দিকে তাকাল, অবশ্য সরাসরি নয়।

-হুঁ, বুঝতে পারছি। আপনি এখনও আপনার পারিবারিক সুখ শান্তি, যা আপনার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে, তা ফিরে পাননি, আপনার চোখ-মুখই তার প্রমাণ দিচ্ছে।

-আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আপনি সত্যিই আমার বাবার বয়সি মানুষ তাই তো আমার মনের অশান্তির কথা কেমন পড়ে ফেললেন। বলুন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি কি আমার হারানো সুখ-শান্তি আর কোনো দিন ফিরে পাব না?

জীবনে ঝড় ওঠে, সমস্ত কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়, তারপর একসময় থেমে যায়। তখন নতুন জীবন। আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে পোয়ারো বললেন, পরিবারে আবার শান্তি সুখ, সবকিছু ফিরে আসে।

-মাদাম, ভরসা হারাবেন না, আপনাকে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, আমাকে ভরসা করে ঠকবেন না। হঠাৎ পোয়ারোর মুখ আনন্দে উদ্ভাস হয়ে উঠল, মনে হল লুসিয়ার দাম্পত্য শান্তির হদিস তিনি পেয়েছেন। লুসিয়াকে নিয়ে কফি টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন, এখানেই পড়ে আছে ফর্মুলার টুকরো কাগজগুলো, একটু আগে যেগুলো জ্যাপ বের করেছিলেন রেনরের জ্যাকেটের পকেট থেকে।

হাতের ইশারায় রিচার্ডকে কাছে ডাকলেন। রিচার্ড এলে আঙুল দিয়ে ভাঁজ করা কাগজের টুকরোগুলোকে দেখিয়ে বললেন–এই হল আপনার বাবা স্যার ক্লডের চুরি যাওয়া ফর্মুলা। তবে তিনি যে কাজটা শেষ করে যেতে পারেননি, তা নিশ্চিত জানি। অসম্পূর্ণ হলেও এগুলো যে উদ্ধার করতে পেরেছি, তা ভেবেই গর্ব হচ্ছে। মঁসিয়ে রিচার্ড আর মাদাম লুসিয়া, আপনারা দুজনেই জেনে রাখুন, সামান্য প্রচেষ্টায় এগুলো আবার আগের মতো ছেড়ে দেওয়া যায়, তখন হুবহু আগের মতোই দেখাবে।

ভগবান! এই সেই সর্বনেশে ফর্মুলা, মঁসিয়ে পোয়ারো, রিচার্ড বলতে থাকল, এগুলোর কথা আমি একটুও মনে রাখিনি। আমার বাবা আর তার হতভাগ্য সেক্রেটারির কাছে হয়তো এই কাগজের দাম অনেক অনেক টাকা, কিন্তু একটুও বাড়িয়ে বলছি না, এর দাম আমার কাছে এক কানাকড়িও নয়। ধ্বংসাত্মক বোমার সাথেই ওই কাগজের তুলনা করা যেতে পারে। আমাদের পরিবারকে তছনছ করে দিয়েছে, বাবাকে খুন করেছে, সংসারের সুখ শান্তি কেড়ে নিয়েছে, এমনকি আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে চিড় ধরিয়েছে। এমন এক ফর্মুলা আমার কাছে কী দাম পাবে বলুন?

–দাম পাবে না?

তাহলে এটা নিয়ে কী করবে তুমি? লুসিয়া নিস্পৃহ কণ্ঠে জানতে চাইল।

–জানি না। রিচার্ড পাল্টা প্রশ্ন করল, এবার তোমার জবাবটা শুনি।

–যা করব, তার বিরুদ্ধে যাবে না তো? লুসিয়া জানতে চাইল।

–একদমই নয়। কাগজের ভাঁজ করা টুকরোগুলো রিচার্ড হাতের মধ্যে তুলে নিল। লুসিয়াকে দিয়ে বলল–ধরো, যা খুশি করো, আমি কিছু বলব না।

-ধন্যবাদ রিচার্ড, গলার স্বর নীচুতে নামিয়ে লুসিয়া বললো, দেখো, আবার বলছি, আমি আমার মতো এগুলোর ব্যবস্থা করছি, পরে এই নিয়ে কোনো ঝামেলা করো না, বলে রাখছি।

লুসিয়া ফায়ারপ্লেসের সামনে এসে দাঁড়াল। ম্যান্টেলপিস থেকে দেশলাই তুলে নিল। কাঠি জ্বেলে কাগজে আগুন লাগাল। একটা একটা করে ছুঁড়ে দিল ফায়ারপ্লেসের মধ্যে। রিচার্ড নির্বাক হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে, বাবার সাধনার ফল কীভাবে একটু একটু করে আগুনে জ্বলে পুড়ে মরছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফর্মুলা লেখা ভাঁজ করা কাগজগুলোর গতি সুসম্পন্ন হল। পড়ে রইল কেবল ছাই।

–আপোদ বিদেয় হল, বাঁচা গেল। আপনমনে বিড়বিড় করতে করতে লুসিয়া দেশলাইটা জায়গা মতো রেখে দিল। নামী বিজ্ঞানী হয়েছেন, কোথায় মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করবেন, তা না করে মানুষকে ধ্বংস করার কথা ভেবে চলেছেন। রাতদিন মুখ গুঁজে

পড়ে আছেন ওই মারাত্মক বোমা তৈরিতে। কারণ হাজার হাজার পাউন্ড পকেটে আসবে, অর্থের বিছানায় শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোবেন, সেই স্বপ্নেই বিভোর। সত্যি বলছি, মঁসিয়ে পোয়ারো, ওই ফর্মুলা বিক্রির অর্থের প্রতি আমাদের লোভ নেই, আমরা চাই না বড়ো লোক হতে।

-সাবাস মাদাম, সাবাস। নিজের চোখে যা দেখলাম, তা প্রশংসার যোগ্য। হাজার হাজার পাউন্ড লোভের বশবর্তী না হয়ে আপনি কেমন স্বচ্ছন্দে ওই মারাত্মক বোমার ফর্মুলা পুড়িয়ে ছাই করে দিলেন, আশ্চর্য।

–কিন্তু আমার বিবাহিত জীবন, আমার পরিবার, অশান্তির আগুনে সব এভাবেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দুঃখে ভারাক্রান্ত লুসিয়ার মন। ধরা গলায় বলুন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি কি আবার সেই সুখ শান্তি ফিরে পাব?

নিশ্চয়ই পাবেন, পোয়ারো ধমকের সুরে বললেন, এই আমি, এরকুলো পোয়ারো, আপনার বাবার বয়সি একজন ভদ্রলোক, এখনও কি আমার প্রতি আপনার অবিশ্বাস জমে আছে। যেসব ঘৃণ্য চক্রান্তে আপনি জড়িয়ে পড়েছিলেন, কীভাবে তা থেকে মুক্তি পেলেন, /৩৯ তলিয়ে দেখুন। আবার বলছি মাদাম, এই এরকুল পোয়ারোর ওপর আর একটু আস্থা রাখুন, জীবনের সুখ শান্তি সব ফিরে পাবেন, আমি আপনাকে একাজে সাহায্য করব, প্রতিশ্রুতি দিলাম। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে সেই ফিনিক্স পাখির গল্পের কথা, ছেলেবেলায় পড়েছিলাম, আগুনে পুড়ে পাখিটা ছাই হয়ে গেল বটে, পরক্ষণে ফিরে পেল নতুন দুটো ডানা, মনের খুশিতে ডানা মেলে সে আবার আকাশে উড়ে গেল। আপনি হলেন সেই ফিনিক্স পাখি, যে রাশি রাশি দুঃখ, নিন্দা, কলঙ্ক আর সন্দেহের

আগুনে পুড়ে ছাই হবার পরেও নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে নতুন ভাবে বেঁচে উঠেছে। আপনাদের বিবাহিত জীবনে সামান্য চিড় ধরেছে মাত্র। এর মূলে আছে ভুল বোঝাবুঝি আর অবিশ্বাস। আপনারা নিজেরাই নিজেদের দুঃখের জীবনকে নতুন সূর্যের আলোতে ভরিয়ে তুলতে পারেন, সেখানে থাকবে না কোনো অবিশ্বাস, থাকবে না সন্দেহের বাতাবরণ, থাকবে শুধু নতুন ভাবে সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকার মন্ত্রমালা।

কিন্তু আমি আমার আসল পরিচয় না দিয়ে আমার স্বামীকে ঠকিয়েছি। এই অপরাধবোধ সব সময় আমায় কুরে কুরে খাচ্ছে। এর থেকে মুক্তি পাব কী করে?

লুসিয়া তুমি একাই কি অপরাধ করেছ? রিচার্ডের গলা বুজে এল, আমিও তোমাকে সন্দেহ করেছিলাম, আমার বাবার ফর্মুলা তুমিই চুরি করেছ ভেবেছিলাম।

-মাদাম লুসিয়ার কানের কাছে পোয়ারো মুখ নামিয়ে নিয়ে এলেন। চাপাস্বরে বললেন– স্যার ক্লডও আপনাকে ফর্মুলা-চোর হিসাবে সন্দেহ করেছিলেন, এখবর আমার জানা। অবশ্য স্যার ক্লডকে দোষ দিই না। উনি কেন, ওঁর জায়গায় যে কেউ থাকলে এমনটিই হত। উনি খুন হবার তিন-চারদিন আগে একটা চিঠি পেয়েছিলেন, নামহীন স্বাক্ষরহীন চিঠি। আপনার সম্পর্কে স্যার ক্লডকে হুঁশিয়ারি করে চিঠিটা লেখা। আজ বুঝতে পারছি, চিঠিটা কে লিখেছিল। ডঃ কারোলি নিজে অথবা ওর কোনো চ্যালার কাজ। ওই চিঠিই স্যার ক্লডের মনে আপনার সম্পর্কে সন্দেহের বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনার স্বামী রিচার্ডের কথা ভাবুন তো। পুলিশের জেরার মুখে যাতে আপনাকে না পড়তে হয়, তাই আগে ভাগে তিনি নিজেই ইন্সপেক্টার জ্যাপের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি স্যার ক্লডের খুনী। উনি কেন একাজ করেছিলেন জানেন?

ভালোবাসার বশবর্তী হয়ে। উনি কখনোই চাননি, সন্দেহের বশে পুলিশ আপনাকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাক।

রিচার্ড! অস্ফুটে বলে উঠল লুসিয়া, তাকাল স্বামীর দিকে, সে চাউনিতে ঝড়ে পড়ছে কৃতজ্ঞতা মেশানো ভালোবাসা।

এবার আপনাকে বলি, মঁসিয়ে রিচার্ড, পোয়ারো কঠিন কণ্ঠে বললেন–আপনি কি জানেন, আপনার স্ত্রী আপনাকে বাঁচানোর জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। উনি বারেবারে আমায় জানিয়েছিলেন, স্যার ক্লডকে উনিই খুন করেছেন। নিজের জীবনের তোয়াক্কা না করে এমন কাজ স্ত্রী করতে পারেন, তার ভালোবাসা মেকি তো হতে পারে না।

–লুসিয়া, আবেগে রিচার্ডের দুটি চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। সে ধীর পায়ে স্ত্রীর কাছে এগিয়ে এল, চোখে রাখল চোখ। দু'জনের ঠোঁটেই হাসির ইশারা।

-বাবার বয়সি এক প্রৌঢ়ের সামনে কোনো ইংরেজ নারী-পুরুষ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায় না। জানি, এটা তাদের রীতি বিরুদ্ধ। অনেক দিন তো হল এদেশে বাস করছি, আপনাদের আদব কায়দা আমার জানা হয়ে গেছে। তাই বলছি মঁসিয়ে ও মাদাম অ্যামরি, আমি চলে যাচ্ছি, আপনারা প্রাণভরে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরুন, চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিন পরস্পরকে।

–মঁসিয়ে পোয়ারো, এগিয়ে এসে লুসিয়া কৃতজ্ঞতা ভরে পোয়ারোর হাত দুটি চেপে ধরল– আপনাকে আমি কোনোদিন ভুলব না।

–আপনিও আমার স্মৃতিপটে বেঁচে থাকবেন চিরকাল। পোয়ারো সামান্য ঝুঁকে পড়লেন, লুসিয়ার হাতে স্নেহের চুম্বন এঁকে দিলেন।

রিচার্ড এবার এগিয়ে এল। লজ্জিত কণ্ঠস্বরে বলল–মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনাকে ভুল বুঝে অনেক বিশ্রী ব্যবহার করেছি, বুঝতে পেরে এখন নিজেই মরমে মরে যাচ্ছি। তবে আমি চিৎকার করে বলতে পারি, আপনার কারণেই আমি জীবন ফিরে পেয়েছি, যে সুস্থ দাম্পত্য জীবন হারিয়ে গিয়েছিল, তা মুঠোবন্দি করতে পেরেছি, আপনার মতো সজ্জন লোককে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই না। রিচার্ড আর কথা বলতে পারল না, ছলছলে চোখে সে তাকিয়ে রইল।

–প্রচণ্ড এক সঙ্কটের মুহূর্তে আপনাদের পাশে যে দাঁড়াতে পেরেছি, আপনাদের যে আবার বিবাহিত জীবনের সুখসাগরে ভাসিয়ে দিতে পেরেছি.... আবেগে পোয়ারোর কণ্ঠ রুদ্ধ হল। জ্যাকেটের আস্তিনে চোখের জল মুছে নিলেন। এখান থেকে আমি আজ যা নিয়ে যাচ্ছি, এর থেকে বড়ো পাওনা আর কিছু হতে পারে না, মঁসিয়ে অ্যামরি। বিদায়বেলায় চোখের জল মুছে, আসুন, আমরা হেসে উঠি।

হাসি থামিয়ে পোয়ারো বললেন, বদ্ধ ঘরে আর বন্দি থাকবেন না। জানলা তো খোলাই আছে। বাইরে খোলা আকাশ, আর সবুজের হাতছানি। দুজনে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়ান, মন হালকা হবে।

লুসিয়া আর রিচার্ড কথা না বাড়িয়ে পোয়ারোর নির্দেশ মেনে ফ্রেঞ্চ উইন্ডো গলিয়ে বাগানে গিয়ে পড়ল।

পেছন থেকে পোয়ারো হাঁক দিলেন–লুসিয়া আর রিচার্ড, আপনাদের দাম্পত্য জীবন সুখময় হয়ে উঠুক, সেই কামনা করি। বাপের বয়সি লোকেরাই এমন আশীর্বাদ করতে পারেন। আর হ্যাঁ, মাদাম, কোনো এক গাছের নীচে আপনার ননদ বারবারাকে পাবেন, সঙ্গে আমার একান্ত অনুগত সহকারী ও বন্ধু ক্যাপ্টেন হেস্টিংসও আছেন। আমার সামনে বারবারাকে দেখলাম, টানতে টানতে হেস্টিংসকে নিয়ে গেলেন বাগানে। ছেলেমানুষ, আপত্তি, করতে পারিনি। কিন্তু এবার যে আমার বন্ধুটিকে ছাড়তে হবে। দয়া করে মাদমোয়াজেল বারবারাকে বুঝিয়ে বলুন, নয়তো লন্ডনে ফেরার ট্রেন ধরতে পারব না। বন্ধুটিকে আমার হাতে ফিরিয়ে দিলে আমি বাধিত থাকব।

নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন পোয়ারো। জানলা ছেড়ে ধীরে ধীরে চলে এলেন ঘরের মাঝখানে। আনমনে হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়ালেন ফায়ারপ্লেসের কাছে। ম্যান্টেলপিসে রাখা ফুলদানিটার গায়ে হাতের পরশ দিলেন। আপনমনে উচ্চারণ করলেন–যাক, শেষ পর্যন্ত সব কিছু ভালোয় ভালোয় মিটল। বিক্ষিপ্তভাবে যেখানে যা কিছু ছড়িয়ে ছিল, সেগুলো আবার শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুচারুভাবে স্ব স্ব জায়গা ফিরে পেল।

আত্মতৃপ্তিতে মন তার পরিপূর্ণ। পৌরুষদৃপ্ত পদক্ষেপে চলে গেলেন ঘরের বাইরে।